মাসিক মাসাণ

শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৬

উৎসব-আয়োজনে প্রিয়-পরিজনের সান্নিধ্য মনে আনে অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণ। এই পরিবেশে নারী কল্যাণী রসানন্দময়ী। তার অনাবিল সৌন্দর্য এই রসানন্দের পরিপূরক। আর সেই সৌন্দর্যকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে সুদীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ চিকুররাজি। তাই নারীর প্রসাধনকলায় কেশবিন্যাস একটি অপরিহার্য। চিরপ্রিয় 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়। গুণে পরিমাণে সর্বত্র সমাদৃত

হিমকল্যাণ

নহিলে করিবাং নয় তাল নিশাহী মূলম ফু কাপ দেখিয়া লইবেন।

কেশরঞ্জন বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর আয়ুর্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ কলিকাতা

UPCO NR·28

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মূল্য—১

দি

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

৩নং

আসানসোল (দামোদর)

সকলের দৃষ্টিই আজ ভারতের অন্যতম সুবৃহৎ কাপড়ের কলের এই বিরাট নূতন কারখানাটির উপর নিবদ্ধ। কারখানাটিকে আধুনিক ও সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মক্ষমতাবিশিষ্ট যে সব কলকব্জায় সুসজ্জিত করা হইতেছে, তাহাতে ঢাকেশ্বরীর তৃতীয় ইউনিট নিঃসন্দেহে পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাপড়ের কল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

• • • •

কারখানার বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ ও কলকব্জা স্থাপনের কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কারখানাটি চালু করা সম্ভব হইবে।

রেজিষ্টার্ড অফিস—

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অর্থনীতি ও ধর্মনীতি —অধ্যাপক বীরেন ভট্টাচার্য্য, এম-এ	
২। আষাঢ়ের গৃহ সমস্যা —শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল	
৩। মধ্যবিত্তের বিপদ —কালীচরণ ঘোষ	
৪। জীবন বীমা ও জীবন ধারা —শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
৫। যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প-পরিস্থিতি —অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ	
৬। টাল্লিং ও টাকার মূল্য হ্রাস	
৭। ভারতের অন্নার সম্পদ —শ্রীরেবেন্দ্রনাথ দাস, এম-এস-সি	
৮। মধ্যবিত্তের সমস্যা —গোপাল ভৌমিক	
৯। কবির উক্তির গোড়ার কথা —শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	

ফোন ৩৫৩৪—১০২৯ গ্রাম—ইউনো ব্যাঙ্কার্স

ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিমিটেড

(সিডিউল্ড)

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হেড অফিস—পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা।

শাখা সমূহ

উত্তর কলিকাতা ঃ—৬২, মৌরীবাড়ী লেন,
দক্ষিণ কলিকাতা ঃ—১৩৮।১, রসা রোড,
খড়্গপুর, কার্শিয়াং এবং খুলনা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ আর, এস, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০। অর্থনৈতিক সঙ্কট —প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ	
১১। পাট ও পাট-শিল্পের সমস্যা —শ্রীকমলাকান্ত দত্ত	
১২। বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে ? শ্রীহেরম্বনাথ রায়	
১৩। এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন-নীতি —অতুল দত্ত	
১৪। বন্যারোধ ও বন্যা-নিবারণী টীকা—বি-সি-জি —শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস-সি	৭৫
ভারত সরকারের বাণিজ্যনীতি —শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	
১৬। গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্কিং —সুরেশ দত্ত	৫৭
১৭। ভারতীয় কারুশিল্প শ্রীসুধাররঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ	
১৮। উদ্বাস্তু সমস্যা —অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়	৬০
আর্থিক সঙ্কট ও কৃষি —অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৪
২০। কুটীর শিল্পে গুড় —শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, এম-আর-ই-এস্	৬৮
২১। জীবন বীমার গোড়ার কথা —শ্রীকামিনীকুমার রায়, এম্-এ	৬৯
২২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য পরিস্থিতি —অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ	
শিল্প মেলা —শ্রীসুধেন্দুমোহন গোস্বামী, এম-এ	৭৫

সভ্যতার বিকাশ ও প্রকাশের অবলম্বন

কাগজ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, বোর্ড, কালি ইত্যাদির

পরিবেশক :

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানী

৫৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

টেলিগ্রাম—পেপার ডিপো ফোন—বড়বাজার ৬৪৮

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

১২শ বর্ষ | কলিকাতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, ৯ই আশ্বিন, ১৩৪৬ | শারদীয়া সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অর্থনীতি ও স্বার্থনীতি

অধ্যাপক ধীরেন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

মানুষের আর্থিক জীবন মোটামুটিভাবে তাহার স্বার্থান্বেষণের কাহিনী। অর্থ বলিতে স্বার্থকেই বুঝায়, পরার্থে প্রাণধারণের কথা নীতি-শাস্ত্রসম্মত হইলেও অর্থনীতি তাহাকে বড় বেশী আমল দিতে চায় না। মানুষ স্বভাবতঃই কামনা করে স্বল্পতম আয়াসে প্রভূততম পরিতৃপ্তি। ইহাই তাহার স্বার্থান্বেষী মনোভাবের রূপ। অর্থনীতিশাস্ত্র মানুষের এই মনোভাবকে প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া, একটা চিন্তা-প্রণালী গড়িয়া তোলে, সেই চিন্তাপ্রণালীতে স্থানে স্থানে যতই বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, তাহার মূল কথা মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থ-সন্ধান। যোগান এবং চাহিদা—অর্থনীতি-শাস্ত্রের প্রধান [illegible] ধারণা, সকল প্রকার অর্থনৈতিক মতবাদের এই দুইটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু ইহাদের আড়ালে মানুষের স্বার্থনীতি নিরন্তর সক্রিয় রহিয়াছে বলিয়াই অর্থনৈতিক চিন্তা-প্রণালীতে ইহাদের এত মূল্য। যোগানের দিকে একটি স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন বিক্রেতা এবং চাহিদার দিকে আর একটি স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রেতা না থাকিলে সমস্ত আলোচনাটা শুধুমাত্র বাক্যবিন্যাসে পরিণত হইত। বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে স্বার্থের যে টানাটানি অনবরত চলিতেছে বলিয়াই অর্থনীতি-শাস্ত্র মূলে তাহার আলোচনার প্রেরণা পাইতেছে। পরার্থে মানুষ কোনো ত্যাগ করে না এমন নয়, কিন্তু সে সকল ত্যাগের মধ্যে সাধারণতঃ কোনো পর্যায় বা প্রণালী আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু যেহেতু স্বার্থ জিনিষটা মানুষের মজ্জাগত, সেইহেতু মানুষের স্বার্থান্বেষণকে লইয়া একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনা গড়িয়া উঠিতে পারে। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের অবিরত স্বার্থ-সন্ধানের ফলে সমাজে যে আর্থিক যোগাযোগের সৃষ্টি হয় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত অর্থনৈতিক আলোচনার জন্ম। মানুষের স্বার্থ-বোধ ও স্বার্থ-সন্ধানই সকল আর্থিক আলোচনার মধ্যে একটা ঐক্যসূত্রের কাজ করিতেছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক Economic man বা আর্থিক মানুষের কল্পনা করিতেন। দিবারাত্র স্বার্থের অনুসরণ করিয়া চলা ছাড়া আর তাহার কোনো কার্য্য ছিল না। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হয় এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া একাধিক মনীষী এই কল্পনাকে বিদ্রূপ ও বীভৎস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। মানুষ যে জীবনের সকল রস ও রসের সন্ধান ছাড়িয়া দিয়া কেবল উর্দ্ধশ্বাসে স্বার্থের পিছনে ছুটিয়া চলে তাহা নয়। কোনো বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সম্পর্কে বলা চলে না যে, স্বার্থান্বেষণ ছাড়া আর কোনো দিকেই তাহার লক্ষ্য নাই। মানুষের জীবনে নানা বিচিত্র উপাদান একত্র হইয়াছে, বহুবিধ বিচিত্র রসের সন্ধানে মানুষ ঘুরিয়া মরিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবনে স্বার্থান্বেষণের উপাদানকে একেবারে অস্বীকার করাও চলে না। স্বার্থ বলিতে এখানে শুধু যে ব্যক্তির স্বার্থ তাহা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে পারিবারিক উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জ্জন দিতে দেখা যায়। স্বার্থ বলিতে শুধু এইটুকুই বুঝি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের নিকট হইতে নিজের উপভোগ যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে আদায় করিয়া লইতে চায় এবং তাহার পরিবর্ত্তে যত অল্প প্রতিদান দিয়া বাঁচিতে পারে সেদিকেই তাহার দৃষ্টি থাকে। এই অর্থ স্বার্থের অনুসন্ধান মানুষের এক বিশেষ চরিত্র-লক্ষণ এবং ইহাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করিলে কোনো বিজ্ঞানসম্মত আর্থিক আলোচনার সূত্রপাত হইতে পারে না।

কিন্তু যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সেই হেতু তাহার স্বার্থান্বেষণ প্রতি পদে সমাজের রীতিনীতির দ্বারা সংকুচিত ও শীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র নিরঙ্কুশ স্বার্থসন্ধান ব্যক্তির পক্ষে জীবনসংগ্রামের সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে উহাই অনেক সময়ে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তি যে পক্ষকে আপনার স্বার্থের পক্ষে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করেন, অন্যের

স্বার্থের সহিত এমনভাবে তাহার ঠোকাঠুকি সুরু হয় যাহা সমাজ-জীবনের পক্ষে অমঙ্গলকর। এইখান হইতেই অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব সুরু হয়। অর্থনীতি মানুষের স্বার্থ-সন্ধানকে লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেও বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অগ্রগতির মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করে। স্বার্থনীতি সামাজিক সংযোগের কথা বিচার করে না—তাহার গতি নির্দ্ধারিত হয় শুধু তাহার নিজের প্রেরণার বেগে, সমাজ-জীবনের অন্যান্য যোগাযোগের মধ্যেও সে 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হইয়া উঠিতে চায়। সে সর্ব্বাপেক্ষা কম দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাইতে চায় বলিয়াই সমাজের জীবনে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়।

এই যে অবস্থাগত, নিয়মগত স্বার্থ-সন্ধান—ইহা সমাজের বিভিন্নদিকের ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অনেক সময়েই প্রথম বেসরাম্ হইয়া উঠিতে চায়। এই বেগ অনেকটা বন্যার বেগের মত। যখন বন্যা আসে তাহার প্রাবনে নদীর দুই কূল ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু বন্যার জল খাবার মাটির বুকে সৃষ্টির নূতন উপাদানও রাখিয়া যায়। মানুষের স্বার্থবোধকেও তেমনি একান্তভাবে ভাঙ্গনের শক্তি মনে করিলে ভুল করা হইবে, উহার মধ্যে নূতন সৃষ্টির শক্তিও নিহিত থাকে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গিয়াছে মানুষের স্বার্থবুদ্ধির জোয়ার বারবার সামাজিক বিধি-নিষেধ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহারই ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন সৃষ্টির সাড়া জাগিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্পবুদ্ধির পিছনে রহিয়াছে একদল বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষীর বিপুল আয়াস। তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সেই স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় তাহারা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছে। নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন ও ব্যবহার করিয়াছে এবং সমগ্রভাবে সমাজের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রেরণা যোগাইয়াছে। সেইজন্য এই যুগের অর্থনৈতিক মতবাদে, দার্শনিক চিন্তাধারায়, শিল্পে ও সাহিত্যে সর্ব্বত্রই ব্যক্তি-স্বার্থের জয়গান। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি যে সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না, শুধু ব্যক্তিকে তাহার স্বার্থের পথে নিরাবাধায় চলিতে দিলেই সমাজের চরম উন্নতি হইতে পারে, এই মতবাদ ক্রমশঃ চিন্তাশীল লেখক-গোষ্ঠীর মধ্য হইতে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে সত্য খানিকটা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী আছে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বার্থবুদ্ধির প্রতি অন্ধ আস্থাস। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে প্রবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে, সাধারণ বিধিনিষেধের শৃঙ্খলার মধ্যে যাহার পূর্ণ বিকাশ এতদিন সম্ভব হয় নাই, হঠাৎ সেই স্বার্থবুদ্ধির গায়ে বাহিরের বাতাস আসিয়া লাগে, সে চমকিয়া উঠিয়া নূতন সাম্রাজ্য গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবেই সমাজের অগ্রগতি সুরু হয়। বলিতে গেলে ইহাই গত কয়েক শতাব্দীর বিপুল সৃষ্টিপ্রয়াসের ইতিবৃত্ত।

এই ভাবে সৃষ্টি সুরু হইল বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির বেদনাও কম কম ছিল না। সাধারণ মজুর, অসহায় নারী ও শিশু, শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে কি দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে সে কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। যে কয় যুগে যুগে সামাজিক সংহিতির সম্মুখে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সন্ধানকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রশ্ন উঠিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সেই প্রশ্ন মানুষের মনে দেখা দিল। স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় শিল্পপতি শ্রমিক দলের উপর যে অত্যাচার চালাইয়া থাকেন, বণিক ক্রেতার স্বার্থকে যে ভাবে উপেক্ষা করেন, শ্রমিক সংঘের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে যে সকল দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, উহাকে সৃষ্টির আনুষঙ্গিক হিসাবে উপেক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত তীব্র হইয়া উঠিয়া যাহাতে সমাজদেহের মর্ম্মমূলে আঘাত করিতে না পারে, তাহার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কোনো একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। ইহার ফলে লিপিবদ্ধ হইল, কারখানা নিয়ন্ত্রণের আইন, মজুরী নিয়ন্ত্রণের আইন, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের আইন—অবাধ স্বার্থ-সন্ধান আর অবাধ রহিল না। গত দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ-সন্ধানের যে বন্যা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া মানুষের সৃষ্ট জগৎকে নানা দিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, এখন সেই বিপুল জলপ্রবাহের মুখে বাঁধ নির্ম্মাণের কথা লোকে মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। একদিন যাহারা বন্যার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই দেখিলেন বন্যার বুকে শুধু সৃষ্টির উপাদানেই থাকে না, বন্যার জল যখন নামিয়া যায় তখন মাটির পুঞ্জে বীভৎস কাটলেরও সৃষ্টি হয়—মানুষের বিপদ তাহাতে বাড়ে বই কমে না। এই উপলব্ধি হইতেই কেইন্‌স্ (Keynes) এর নূতন অর্থনীতির উদ্ভব হইল। সমাজের দাবী লইয়া অর্থনীতিকে স্বার্থনীতির হাত চাপিয়া ধরিতে হইল। কবি যাহাকে স্বার্থ-সন্ধানের ফলেই সমাজের চরম শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহার জন্য সামাজিক প্রয়াসের কোনো প্রয়োজন হইবে না—এই মতবাদকে আবার নানা দিক দিয়া নূতন করিয়া পরীক্ষা করা হইতে লাগিল। বন্যার মুখে বাঁধ বাঁধিবার আগে যে সমস্যা বহুবিধ পরিকল্পনা লইয়া হাজির হইলেন, অর্থনীতি সামাজিক কল্যাণের আশার সাথরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লইল, স্বার্থনীতি দূরে দাঁড়াইয়া অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু বাঁধ বাঁধিবার সর্ব্বোত্তম প্রণালী বলিয়া দিবে কে? স্বার্থ-সন্ধানের এই এলোমেলো বন্যার মুখে বাঁধ দিতে হইলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে যে ব্যবহার করিতে হইবে এ বিষয়ে কাহারও বেশী দ্বিমত দেখা গেল না। কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক কি ভাবে, কোন দিক দিয়া ব্যক্তিস্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ করিবে সে বিষয়ে মতভেদ রহিল যথেষ্ট। কেহ কেহ অবশ্য রাষ্ট্রের মত শক্তিমান্ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অন্যান্য সঙ্ঘের হাতেই এই ভার তুলিয়া দিতে বেশী উৎসুক ছিলেন—তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এই জাতীয় সঙ্ঘগুলিই বেশী উপযোগী—কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল বিভিন্ন সঙ্ঘের উপরে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন ইহারাও অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক কোল্ (Cole) এই দলের লোক। ইহা ছাড়া আর এক দল লোক শুধু মানুষের স্বার্থবুদ্ধির জোরেই বিশ্বা রাষ্ট্রা ক্যাপিটালিষ্ট-এর মতো স্বার্থবুদ্ধির পক্ষকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন, বাঁধ দিবার প্রয়োজনই ইহারা স্বীকার করিলেন না। ইহাদের মতবাদ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে পারি নাই। সুতরাং দেখা গেল এ যুগের প্রায় সকল মানুষই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, ব্যক্তিস্বার্থের সংকোচনের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করেন। আধুনিক যুগে অর্থনীতি ও স্বার্থনীতির দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র মানুষের

বাথগেটের
ক্যাষ্টর
অয়েল

প্রায় দেড়শত বৎসর
ধরে শ্রেষ্ঠতম কেশতৈল
হিসেবে স্বীকৃত হয়ে
আসছে

বাথগেট য়্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা : বোম্বাই : দিল্লী : লণ্ডন

বস্তুটি একটি বড় আবরণ তুলিয়া ধরিয়া আছে। এ যুগে অর্থনীতির সূত্রগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া অর্থনীতি এবং পরিবারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে—আধুনিক অর্থনীতি প্রায় সর্বথা রাষ্ট্রীয় নীতির যৌক্তিক প্রয়োগ মাত্র।

এখানে দুইটি মূল প্রশ্ন উঠে। এই প্রশ্ন দুইটির মুখীবাসের উপর মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ধরা যাক, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংকোচনের জন্য ব্যবহার করা হইল—কিন্তু তাহাতে সামাজিক স্বার্থ সিদ্ধ হইল কিরূপে? আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনাধিকার থাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। তাহারা যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে চাপিয়া রাখিয়া নিজেদের শ্রেণীগত কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? নিশ্চয়তা অবশ্য কিছু নাই, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইহার সহজসাধ্য প্রতিকার রহিয়াছে। যে শাসকগোষ্ঠী সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দাও, নূতন এক দল শাসক রাষ্ট্রের হাল ধরিয়া বসুক, দেখিবে সকল দফারফা সমাধান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না হইয়াছে তাহার বিচার করিবে কে? যে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর এই ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহারা কি সামাজিক কল্যাণের শ্রেষ্ঠ বিচারক? নির্বাচনের সময়ে তাহারা যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধান করিবে না এবং সেই বিচার অনুসারে অপরাপর শাসন-ভার পূর্ণ করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়। বিশেষ করিয়া বর্তমান কালের শ্রেণীবৈষম্য-পীড়িত সমাজে নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে শ্রেণী-স্বার্থকে অখণ্ড সামাজিক স্বার্থ বলিয়া মনে করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এই বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার ফলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন শুধু তাঁহারাই যাঁহাদের উদরান্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে স্বার্থান্বেষণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা কল্পনাতেই পর্যবসিত হয় এবং সেই কল্পনাকেও আবার কেবল খাপছাড়া বলিয়া মনে হইতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি বোধ হয় আরও মৌলিক এবং বর্তমানকালের বিভক্ত জগতে ইহার গুরুত্ব সমধিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সন্ধানের উপর বাধানিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই যাঁহার সন্দেহ, তাঁহাকে এড়াইতে দিয়া গল্পীর প্রয়াসকে আমরা বিমুখ করিয়া না তুলি ইহাই এই প্রশ্নকারীদের আশঙ্কা। অবাধ স্বার্থ-সন্ধানের ক্ষমতাটির দিকটি ইহাদের নজর এড়ায় নাই, কিন্তু এই ক্ষমতাটিকে গল্পীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করাই ইহাদের বিশেষত্ব। নদীতে হঠাৎ যখন জোয়ার আসে, তখন কেহ কেহ অজ্ঞতাবশে নদীর গর্ভে তলাইয়া যায়, তাই বলিয়া বাঁধ তুলিয়া জোয়ারকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে যায় না। গল্পীর আবেগকে বাঁধ বাঁধিয়া ঠেকাইতে গেলে হয় বাঁধ ভাঙিয়া যায়, নয়তো পৃথিবী রুক্ষ, শস্যশ্যামলহীন হইয়া উঠে। সুতরাং স্বার্থ-সন্ধানের বন্যাকে সবেগে প্রবাহিত হইতে দাও, যাহারা ভুলে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া তোল, তাহাদেরও কাণে স্বার্থের বন্যা জমিতে থাক, উহারা জাগিয়া উঠিলে বন্যাকে জয় করিবার আর কিছু থাকিবে না। তবু যদি ইহার জন্য হতভাগ্য দুর্ঘটনা ঘটে, বন্যার জলে তাহারা ভাসিয়াই যাইবে—তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে চাও করিতে পার, কিন্তু উহাদের খাতিরে পৃথিবীকে রুক্ষ করিয়া তুলিতে যাইও না। বরঞ্চ স্বার্থনীতির জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোল, সকলে তন্দ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া যাক, এই অতন্দ্র স্বার্থান্বেষণই হইবে নূতন যুগের অর্থনীতি।

এই ভাবে অর্থনীতি ও স্বার্থনীতির বিরোধ এ যুগে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মীমাংসার ভার সাধারণ মানুষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া পরার্থে জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে এক কল্পিত 'রামরাজ্যের' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। ইহা কঠিন, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে এক অখণ্ড সামাজিক স্বার্থের কল্পনা করা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সেই সামাজিক স্বার্থ বিধানের জন্য ব্যবহার করা—ইহাকেও এক রকমের কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ যে পরিমাণে ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থের বিলোপ দাবী করে, বর্তমান জগতে তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। সুতরাং যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সবল করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্যের পথে যাত্রা করে। এ পথ দুর্গম, এ পথে শুধু প্রবলের রাজত্ব, দুর্বল বা নিঃস্বের স্থান এ পথে নাই। তবু ইহাই যদি সৃষ্টি ও সভ্যতার অগ্রগতির একমাত্র পথ হয়, তবে আপনি বা আমি ইহার চক্রতলে পিষ্ট হইলেও এই প্রাণহীন রথ সে কথা শুনিবে কেন?

আমাদের গৃহসমস্যা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

গল্পটা কোথাও পড়িয়াছিলাম অথবা শুনিয়াছিলাম। একজন লোক কোন বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে পৌঁছদারী আদালতে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ধমকাইয়া বলেন, "আর যাবাই হউক, লোকটা বাড়ীওয়ালা নহে।" উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বলা বাহুল্য বাড়ীর মালিক, না ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন, এই গল্প হইতে তাহা কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। গল্পটা হয়ত নিছক গল্পই। কিন্তু এই গল্পটা সহজভঙ্গিতে গৃহাভাবের একটা উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। আমরা যখন গৃহাভাবের কথা বলি, তখন বিশেষ করিয়া সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীর কথাই উল্লেখ করিয়া থাকি। গ্রামগুলিতেও যে গৃহসমস্যা নাই, তাহা নয়। কিন্তু গ্রামের গৃহসমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরও একখানি ঘুঁড়ে ঘরো থর হইলেও তাহার মাথা গুঁজিবার নিজস্ব একটু স্থান আছে। তাহাদের ইটনির্মিত বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাম ছড়াইয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পরম্পরাগত প্রভৃতি অনেক কিছু তাঁহাদের গৃহসমস্যার সহিত জড়িত। স্বাস্থ্যকর

এবং, স্বাস্থ্যোচিত (decent) বাসস্থানের প্রায়েও একান্ত অভাব। ১৩৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী অখণ্ড ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ এবং গ্রামে ও সহরে মোট ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৯২ হাজার গৃহ ছিল। এই হিসাব অনুযায়ী ১৩৩১ সালে প্রতি হাজার গৃহে ৪৯৬২ জন লোক বাস করিত। ১৩৪১ সালের সেন্সাসে দেখা যায়, গৃহের সংখ্যা বাড়িয়া ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৪ হাজার হইয়াছে, কিন্তু লোক-সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি হাজার গৃহে বাসকারী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া ৫১১৬ জন হইয়াছে। গ্রামে বাসগৃহের সমস্যা কম জটিলপূর্ণ একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।* কিন্তু সহরের গৃহ সমস্যাকে শুধু গৃহ সমস্যা বলিলেই উহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায় না। সমস্যাটিকে দেখা বিষয়ে ব্যাপক এবং জটিলতর গৃহসঙ্কট।

দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় বহু বিদেশী সৈন্য ভারতে আসে। যুদ্ধ সরকার কাজে গ্রাম হইতে বহু লোক সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের সময়ে কোন নূতন গৃহ তৈরী নির্মিত হয়নি বা, অধিকন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে সহরের অনেক গৃহ সরকারের হাতে ন্যস্ত করেন। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যে গৃহসঙ্কট অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ১৯৪৩ সালের মধ্য [illegible] হইয়া গেল। বিদেশী সৈন্যরা [illegible] সরকারের লোক। সরকারের যে [illegible] হইয়াছিলেন, সেগুলির জন্যে ক্রমে ক্রমে ভাড়া [illegible] লাগিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে গ্রাম হইতে [illegible] সহরে আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় [illegible] সহরেই থাকিয়া [illegible]। গৃহ নির্মাণের উপকরণের অভাবের [illegible] গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হইল না। অধিক [illegible] আনুষাঙ্গিক অসুবিধার ফলে গ্রামের আরও [illegible] লোক সহরে চলিয়া আসিতে লাগিল। [illegible] পর পাঞ্জাবের [illegible]। পাঞ্জাবে [illegible] আনুষাঙ্গিক হাঙ্গামা [illegible] থাকে অবশ্য [illegible] বিভাগ ও [illegible] পাঞ্জাবে [illegible] হাঙ্গামা-হুজ্জোতে আসিয়া [illegible] দেয়। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে বাস্তুহারা পূর্ব ভারতে [illegible] আসিতে লাগিল। পূর্ব পাকিস্থান হইতেও হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ভারতে চলিয়া আসিল। উহার সবটা ভারতের যুদ্ধ-সঙ্কট আরও প্রবল করিয়া তুলিল। কিন্তু গৃহ সমস্যা সমাধানের কোন উপায় এ পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই।

যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সহরগুলিতে গৃহ-সমস্যা ছিল না, একথা বলা চলে না। ১৯৩১ সালের সেন্সাসের সহিত ১৯৪১ সালের সেন্সাসের তুলনা করিলে দেখা যায়, সহর-গুলিতে লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ হইতে ২০০ ভাগ বাড়িয়াছে। বিরে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কানপুরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

	১৯৩১ সাল	১৯৪১ সাল
কলিকাতা	১১,২৬,৭৫৪	২১,০৮,৯৩১
বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩	১৪,৯০,০০০
মাদ্রাজ	৭,১৭,০০০	১১,৭১,০০০
কানপুর	২,০৩,৭৪৪	৪,৩৭,০০০

১৯৪১ সালের পর হইতে সহরগুলিতে লোকসংখ্যা ক্রমেই আরও বাড়িতে থাকে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইলেও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপ আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সহরের লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে নাই। জাপ আক্রমণের প্রথম দিকে জাপানের বোমাবর্ষণের ভয়ে কলিকাতা হইতে অবশ্য বহু লোক মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছিল। ইহা ১৯৪২ সালের ঘটনা। ঐ সময় কলিকাতার বহু বাড়ী খালি হইয়াছিল। বাড়ী খালি হইলেও ঐ সময় সামান্য কিছু দিনের জন্য কলিকাতার গৃহসমস্যা দূর হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাড়ী খালি থাকিবেন, তবু ভাড়া কমাইবেন না, বাড়ীর মালিকদের অনেকের এই জেদের জন্য বহু বাড়ী খালি পড়িয়া ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে বাড়ী ভাড়ার টায়ার বাবদ কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় পর্যন্ত কমিয়া গেলেও বাড়ী-ভাড়া কমিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে না। ঐ সময় বাড়ী-ভাড়া কত কম হওয়াতে বাড়ীভাড়া বাবদ ট্যাক্স কত কমিয়াছিল, তাহার হিসাবও কর্পোরেশন দেন নাই। অধিকন্তু বাড়ীর মালিকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ১৫ লক্ষ টাকা ট্যাক্স মকুবের প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়াছিলেন।* বোমাতঙ্কটা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতার লোকসংখ্যা [illegible] আরম্ভ করিল। ১৯৪৩ সালের মধ্যভাগে যখন কলিকাতার বহু লোক মফঃস্বল সহরে চলিয়া গিয়াছিল তখন মফঃস্বল সহরগুলিতে বাড়ীভাড়া অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বর্ধিত আকার ধারণ করিল এবং পর্যবেক্ষক মফঃস্বল সহরগুলিতে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেন এবং এপ্রিল মাস হইতে উহা কার্যকরী হয়। ১৯৪৩ সালে কলিকাতার লোকসংখ্যা যখন বাড়িতে আরম্ভ করিল তখন বাড়ীভাড়াও দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করিল। এই বৃদ্ধি এমন অপ্রত্যাশী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, ১৯৪৩ সালের জুন মাসে পর্যবেক্ষক বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রবর্তন না করিয়া পারিলেন না। এই বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের জের এখনও চলিতেছে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপ আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং ১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপের যুদ্ধ এবং আগষ্ট মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হয়। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সহরে লোক-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সরকারী ভাবে তাহার কোন হিসাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। মিঃ পি সি জৈন এই বৃদ্ধি সম্পর্কে যে হিসাব দিয়াছেন নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল :—

	১৯৪১ সাল	১৯৪৬ সাল
কলিকাতা	৩১'৪৯ লক্ষ	৪৫'৬৮
বোম্বাই	২৪'৭০ লক্ষ	১৪'৯০
মাদ্রাজ	১৫'৪০ লক্ষ	৯'৭০
কানপুর	৮'৭ লক্ষ	৪'৩৭

উল্লিখিত চারিটী সহরে ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে জনসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্যান্য সহর এবং মিত্রাঞ্চলেও যে সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জনসংখ্যা বাড়িলেও বাড়ীর সংখ্যা বাড়ে না। ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতের সহরগুলিতে মোট বাড়ীর সংখ্যা ছিল এক কোটি। ১৯৪৫ সালেও যে গৃহের সংখ্যা উহাই ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। নূতন গৃহ যদি কিছু নির্মিত হইয়াও থাকে, অনেক পুরাতন বাড়ী যে ভাঙ্গিয়াও ফেলা হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তবে একথা অবশ্যই [illegible] উহার [illegible] যাবৎ, [illegible] কোন দিনই [illegible]

বাসের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহাও মানুষের বাসস্থানে রূপান্তরিত হইয়া অত্যধিক চড়া ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে শুধু কলিকাতা সহরেই নয়, সকল সহরেই পথে বাহির হইলে যথেষ্ট সংখ্যক 'To let' বা 'বাড়ী খালি আছে' বিজ্ঞাপন চোখে পড়িত। ১৯৪২ সাল হইতে 'To let' বা 'বাড়ী খালির' বিজ্ঞাপন ভাড়াটিয়াদের নয়নমনকে আর মুগ্ধ করে না। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসারে বাড়ীওয়ালা একটা নির্দিষ্ট হারের বেশী বাড়ী-ভাড়া বৃদ্ধি করিতে অধিকারী নহেন। অনেক ক্ষেত্রেই যে আইনের এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে, পর্যবেক্ষণ এ সম্পর্কে তদন্ত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে। সহরে যাহারা বাস করেন তাঁহাদের অধিকাংশকেই উপরন্তু কষ্টের ভার করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয়। রেন্ট কন্‌ট্রোল অফিসে টাকা জমা দিবার মত সময় তাহাদের কোথায়? চাকুরী রক্ষা করিবে, না রেন্ট কন্‌ট্রোল অফিসে প্রতি মাসে একবার করিয়া বাড়ী ভাড়া জমা দিতে যাইবে, এই সমস্যা যে কত লোকের জীবনমরণ সমস্যা, তাহা আমাদের ব্যবস্থাপকগণ বুঝিতে পারিবেন কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ অস্থায়ী ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার পর, যাহারা রেন্ট কন্‌ট্রোল অফিসে বাড়ীভাড়া জমা দিয়া বাড়ীর মালিকের অনুমতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের অবস্থা কি হইবে, সে-চিন্তাও অনেক ভাড়াটিয়া না করিয়া পারেন নাই। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে সেলামী দাবী করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিনা সেলামীতে কতজন বাড়ী ভাড়া পাইয়াছেন, তাহা তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেলামী সংক্রান্ত বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে। ভাড়াটিয়া বাড়ীর একার অভাবই ইহার কারণ। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনদ্বারা বাড়ীর অভাব দূর করা যায় না এবং বাড়ীর অভাবজনিত কষ্টেরও অবসান হওয়া অসম্ভব। একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে বাড়ীর সংখ্যা বাড়ে না বটে, কিন্তু যে-সকল বাড়ীতে পূর্ব হইতে ভাড়াটিয়ারা বাস করিতেছেন এবং যে-সকল ভাড়া বাড়ী খালি হইবে সেগুলির ভাড়া যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যও যে সিদ্ধ হয় নাই, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যুদ্ধের পূর্বে সহরগুলিতে বাসের অবস্থা ভাল ছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামাজিক অবস্থা বিভাগ (U. N. Social Affairs Department) জগতের গৃহসমস্যা সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈয়ার করেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ১৯৪৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "Even before the problems of overcrowding were intensified by the war, only 6% of the Indian population lived in conditions of reasonable privacy and domestic seclusion," অর্থাৎ 'যুদ্ধের ফলে জনসমাগমের সমস্যা বর্ধিত হইবার পূর্বেও ভারতীয় জনসমূহের শতকরা চারিভাগ মাত্র পর্যাপ্ত আলো এবং পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাস করিতে পারিত।' বস্তুতঃ যুদ্ধের পূর্বেও এই কলিকাতা সহরেই অধ্যবিত্ত পরিবার একই পাকা বাড়ীতে কেহ একখানি, কেহ দুইখানি ঘর লইয়া বাস করিতেন এবং অসংখ্য ব্যবস্থাও ছিল বটে। যুদ্ধের পরে এইরূপ অবস্থা আরও ব্যাপক ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা ১৯৪৯ সালের ৪র্থা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'The Housing Muddle' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "An official survey last December showed that 69·6% of families billeted in pucca buildings lived in more crowded conditions than those in bustees." অর্থাৎ 'গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৮) যে সরকারী তদন্তকার্য হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, শতকরা ৬৯·৬টি পরিবার বস্তী অপেক্ষাও ঠাসাঠাসি অবস্থায় বাস করে।' ১৯৪০ সালের বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ-দেশের কার্যকারিতা সম্পর্কে যে বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতার মোট বাড়ীর সংখ্যা ৭২ হাজার ১০৬টি। তন্মধ্যে ২১,৫০০টি বাড়ীতে বাড়ীর মালিকগণ নিজেরা বাস করেন, ২০,৪৯৬টি বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে এবং ৩,৮০০টি বস্তী। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯২ জনেরও অধিক বাস করেন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট ১৯৪৭ সালের যে 'হইতে আগষ্ট' পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১৮,০৩৪টি পরিবার সম্পর্কে যে তদন্ত করেন তাহাতে কলিকাতার বিভিন্ন মধ্যশ্রেণীর যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ৪০ টাকার অনূর্ধ্ব তাহাদের আয়ের শতকরা ৮১ ভাগ খাদ্য ও বাড়ী ভাড়া বাবদ ব্যয় হয় আয়ের শতকরা ৭৮ ভাগ। এই সকল পরিবারে চিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ, বিলাস দ্রব্য প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট থাকে মাত্র আয়ের শতকরা ২২ ভাগ। এই সকল মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এই তদন্তের ফলে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের শোচনীয় গৃহসমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ২৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা তাহাদের বাসগৃহে জন প্রতি ২৫ বর্গ ফুটের বেশী স্থান (floor space) নাই। যে সকল পরিবারের আয় ৭৬৲ টাকা হইতে ৩২৫৲ টাকা তাহাদের বাসগৃহে জন প্রতি স্থানের (floor space) পরিমাণ ৭৮ হইতে ৪৮ বর্গফুট। বিভিন্ন অঞ্চলের ৪২৮টি পরিবার সম্পর্কে যে তদন্ত করা হয়, তাহাতে দেখা যায় ১৯০টি পরিবারের প্রত্যেক পরিবারই একটিমাত্র ঘর (room) লইয়া বাস করে। ১৮৭টি পরিবারের প্রত্যেক পরিবার ২টি ঘর লইয়া বাস করে। বারান্দায়, বাড়ীর প্যাসেজে-এ, স্নানে, এমন কি সিঁড়ির নীচে, মুদার এইরূপ লোকের সংখ্যা দশ হাজার এক ফুটপাথে, পার্কে এবং পথের ধারে শিবির তুলিয়া এক লক্ষ লোক বাস করে বলিয়া 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা লিখিয়াছেন। (৪র্থা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)।

কলিকাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা লোকবহুল মফস্বলী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া অন্যান্য সহরের অবস্থা কলিকাতা অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে বোম্বাইতেও লোকের টানাটানি বড় কম ছিল না। যুদ্ধের আগে বোম্বাই সহরে ৭,৫৬,০৭৯ লোক প্রতি ঘরে ৬ জন হইতে ৯ জনহিসাবে, ৮০ হাজার লোক প্রতি ঘরে ১০ হইতে ১৯ জন হিসাবে এবং ১৫ হাজার লোক প্রতি ঘরে ২০ জনের অধিক হিসাবে বাস করিয়া থাকে। বোম্বাইয়ের অবস্থা অন্যান্য শিল্পাঞ্চল সহরেও প্রযোজ্য মনে করিলে ভুল হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের হাউসিং কমিশনার মিঃ ই সি কাঁতাওয়ালা রোটারী ক্লাবে বক্তৃতায় বোম্বাইয়ের গৃহসমস্যা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ে ৩ লক্ষ ২৮ হাজার বাসগৃহ বা tenements আছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার বাসগৃহে (tenements) একটী করিয়া ঘর আছে। দুই ঘর আছে এরূপ বাসগৃহের সংখ্যা ৫৩ হাজার। তিনটী বা ততোধিক ঘরবিশিষ্ট বাসগৃহের সংখ্যা ১০ হাজারের বেশী নয়। বোম্বাই সহরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ জন বাস করে একটীমাত্র ঘরবিশিষ্ট বাসগৃহে। ইহার অর্থ এই যে, একজন হইতে দুইজন বয়স্কই ঘরে ৮ হইতে ১০ জন লোক বাস করে। হাজার হাজার লোক যে ফুটপাতে [illegible] মিঃ কাঁতাওয়ালা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গত মে মাসে (১৯৪১) লেবার [illegible] ইণ্ডিয়ার একজন সাংবাদিক বোম্বাই সহরের গৃহ-সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণরূপে গৃহহীন লোকদের [illegible] বোম্বাই সহরে [illegible] লোকের সংখ্যা ১৫ লক্ষ। তন্মধ্যে ফুটপাতে বাস করে [illegible] পাঁচ লক্ষ লোক।

যুদ্ধ [illegible] গৃহ-সঙ্কট সাময়িক ভাবে হ্রাস হওয়ার [illegible] দেখা গেল না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই [illegible] করিয়াছি। এখনে [illegible] খাদ্যশস্যে [illegible] এবং সহরে [illegible] সহরে লোক [illegible] কারণ হইয়াছিল। তারপর [illegible] হাজারে হাজারে সহরগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তারপর আসিল জাপান এবং পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুদের আগমন। ফলে সহরগুলিতে লোকের টানাটানি বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু নূতন গৃহনির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থা হইল না। সরকারকে শুধু বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আরও বৃদ্ধি করিয়া গৃহাভাব নিবারণের ব্যর্থচেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশ্য গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনা একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। এই সকল পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের গৃহসমস্যার তিনটী দিকের কথা প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই তিনটী দিক হইল, (১) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য অল্পভাড়ার বাড়ী, (২) কারখানার শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ এবং (৩) বস্তী সমস্যা। ইতিপূর্ব্বে এখানে গৃহসমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা আমরা করিয়াছি তাহা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ সমস্যা সম্পর্কে। কারখানার শ্রমিকদের জন্য আবাসগৃহ নির্ম্মাণ ভারতীয় শিল্পের প্রসার বা অগ্রগতির জন্য বলিয়া কোন দিনই বিবেচিত হয় নাই। সরকারেরও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। বোধ হয় বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বোম্বাইতেই সর্ব্বপ্রথম কারখানার শ্রমিকদের জন্য আবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর অন্যত্রও উহার অনুকরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল শ্রমিকনিবাসকে আলোক বাতাসবিহীন কোটর বিশেষ বলিলেই ঠিক হয়। শ্রমিকসংক্রান্ত রয়েল কমিশন ১৯৩০ সালে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-নিবাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সহরের বস্তীগুলির সংস্কার আমাদের গৃহ-সমস্যার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার লীলাভূমি কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে বস্তীসমূহের অস্তিত্ব দুই কালের বড়ই আবাদের সমগ্র জীবনকেই বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, সে-দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কাহারও হয় না। ১৯৪৪ সালের ১লা ডিসেম্বর বাংলার গবর্ণর মিঃ আর জী কেসী কলিকাতার বস্তী অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। বস্তীর অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার বিবৃতিতে মিঃ কেসী বলিয়াছিলেন, Human beings cannot allow other human beings to continue to exist under these conditions," অর্থাৎ কোন মানুষ অপর মানুষকে এইরূপ অবস্থার মধ্যে বাস করিতে দিতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বস্তী সম্পর্কে কি করা হইয়াছে, তাহা আগামী ছয় মাসের মধ্যেই কলিকাতাবাসীর জানিবার অধিকার আছে। ইহার পর বস্তী উন্নয়নের জন্য আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা অনেকদিন ধরিয়াই চলিয়াছিল। বস্তী উন্নয়নের জন্য কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একটী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গঠন করার কথা উক্ত ট্রাষ্টের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডেভ খান গত ১৯৪৬ সালের ১১ই জুলাই তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনাটী ছিল কলিকাতার চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট সহরের (satellite towns) শ্রেণী তৈয়ারী করা। আজ এই পরিকল্পনা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে তাহা কে জানে? বোম্বাইয়ে বস্তীকে বলা হয় 'চাল' (chawl)। মাদ্রাজে উহারই নাম চেরী (cheri)। উহাই আবার কানপুরে 'আহতা' (ahata) নামে অভিহিত। নামের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সর্ব্বত্রই উহার রূপ এক। বর্ত্তমানে কলিকাতার লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। এই ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ লোক বস্তী অঞ্চলে বাস করে। বোম্বাইয়ের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৭৮ জন বাস করে বস্তীতে। মাদ্রাজে ২০০ বস্তীতে ৪০ হাজার পরিবার বাস করে। কানপুরের 'আহতা' সম্পর্কে শ্রমিক সরকার রয়েল কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন, "Three-quarters of the town is made of private bustees or 'ahatas' which are covered with houses either unfit for human or in great need of improvement." অর্থাৎ সহরের (কানপুরে) তিন-চতুর্থাংশই প্রাইভেট বস্তী বা 'আহতা'। এইগুলিতে যে সকল ঘর আছে সেগুলি হয় মানুষ বাস করিবার অযোগ্য অথবা অবিলম্বে উহাদের সংস্কার করা আবশ্যক। ইহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল, বস্তীর কোন উন্নতি হয় নাই, বরং বস্তীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য কথা বা লেখার কসল যথেষ্টই ফলিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সমস্যা কমেই ভীষণতর এবং দুরারোগ্য রূপে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন অধিকতর দুর্বিষহ হইয়া

উচিতের। বোম্বাই পরিকল্পনার (The Bombay Plan) গৃহ নির্মাণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য এবং জনসাধারণকে অধিকতর বসতি উপযোগী পরিকল্পনা কিরূপ, তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার কোন স্থান নাই। কিন্তু এই পরিকল্পনা শুধু কাগজে-পত্রেই রহিয়া গিয়াছে। তদানীন্তন ভারত সরকারের যে 'যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি' (The Post-war Reconstruction Committee) গঠন করিয়াছিলেন, ঐ কমিটিও গৃহ-নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু এই কমিটির অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রসর হইলেও গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার প্রতি তেমন মনোযোগ দেন নাই। ফলেও আজ আর কোন লাভ হইত না। তদানীন্তন ভারত সরকারের 'স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং উন্নয়ন কমিটি' (The Health Survey and Development Committee) তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, "We believe that an all-wide housing programme should give first priority to the needs of the poorer sections of the people having less than a certain income." অর্থাৎ 'একটা নির্দিষ্ট আয়ের নীচে যে দরিদ্র শ্রেণী আছে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থাকে একটী ব্যাপক গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' উক্ত স্বাস্থ্য সমীক্ষা কমিটি এবং কাহারও কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 'The National Housing Service' বা 'জাতীয় গৃহ-নির্মাণ ব্যবস্থা' গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা লইয়া আজ আলোচনা করা বৃথা। গৃহ-নির্মাণ সম্বন্ধে প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে। এই বাজেটে তদানীন্তন অর্থ-সচিব তার আর্থিক রোয়াদাদ্ গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য তিন দফা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। প্রথম দফা প্রস্তাব সহরে অল্প ভাড়ায় বাড়ী নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক সাহায্য দান। এই সকল বাড়ী হইবে সরকারী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য এবং সাধিক প্রাদেশিক সরকারের খরচের শতকরা ১২॥ ভাগ সাহায্য দান করিলে কেন্দ্রীয় সরকারেরও ঐ হারে সাহায্য দান করার কথা ছিল। গৃহ-নির্মাণে উৎসাহ দিবার জন্য দ্বিতীয় দফা প্রস্তাব ছিল যে, পরবর্তী দুই বৎসরে যে সকল বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ ও শেষ হইবে সেগুলির জন্য আয়কর হইতে মুক্তি দান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যাদির জন্য নির্মিত বাড়ীর প্রাথমিক মূল্যাবলেখন শতকরা ১০ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১৫ ভাগ করা। তৃতীয় প্রস্তাব ছিল প্রাইভেট গৃহ-নির্মাণ কার্যে উৎসাহ দিবার জন্য ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্ট প্রভৃতি গৃহ-নির্মাণের মালমশলা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইহা ব্যতীত ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহের শ্রমিকদের জন্য গৃহ-নির্মাণের দুইটী পরিকল্পনা গঠন করেন। একটী ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ এই দুই বৎসরে গৃহ-নির্মাণের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, আর একটী ১০ বৎসরে ৫০ লক্ষ গৃহ-নির্মাণের দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা। একজন গৃহ-নির্মাণ কমিশনার (Housing Commissioner) নিয়োগেরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনার কিছুই কার্যকরী হয় নাই। নূতন নির্মিত গৃহের জন্য আয়করের সুবিধার প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও গৃহ-নির্মাণে সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা এই সুবিধা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনে কোন অর্থ ধার্য করা হয় নাই। বিভাগোত্তর উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে পড়িয়া শ্রমিকদের জন্য ২০ লক্ষ গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনাও মুলতুবী রাখা হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালের শেষভাগে শ্রমিকদের জন্য ১০ বৎসরে ৫০ লক্ষ গৃহ-নির্মাণের পরিবর্তে ১০ বৎসরে ১০ লক্ষ গৃহ-নির্মাণের প্রতিশ্রুতি গবর্নমেণ্ট প্রদান করেন। কিন্তু কার্যতঃ এপর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু করা হইয়াছে কি? ১৯৪৮ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, "যে সাধারণ উদ্বাস্তু আগমনে আমাদের গৃহ সমস্যা আরও অধিকতর গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এই কঠিন গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রিসভার অধীনে সুদক্ষ একটী গৃহ-নির্মাণ বিভাগ (Housing Department) প্রতিষ্ঠা করিতে ভারত গবর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি?

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের যবো এবং দুই দফা হস্তান্তর পর এখনও যান-যমদানি অভাবে গৃহ-নির্মাণ করা সম্ভব হইতেছে না, এই কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে বোম্বাইয়ে ১২ হাজার নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কলিকাতায় নির্মিত হইয়াছে ১ হাজার ৪৪৫ টী নূতন গৃহ। এই দশ বৎসরে বোম্বাই সহরে লোকসংখ্যার সমের বেশী বাড়ে নাই, কিন্তু কলিকাতার বাড়িয়াছে প্রায় ৩৯ লক্ষ। কলিকাতায় এই যে ৯,১৭৫টী নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে তন্মধ্যে বাসযুক্ত কতকগুলি এবং সিনেমা গৃহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুদামঘর বা কতকগুলি তাহার বিবরণ আমাদের জানা নাই। ১৯৪৬ সালে মিঃ ইবাদ মুল্লুক লিখিয়াছিলেন—'House Shortage in the City' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "At present what is happening is that the Government is releasing building materials only to such capitalists who are constructing Office Building or constructing Cinema Houses or constructing business premises and godowns. The present building projects are not helping to relieve the acute problem of the shortage of residential accommodation but helps only certain classes of bigges capitalists to earn more profits on their capital invested." অর্থাৎ 'বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহা এই যে, যে সকল পুঁজিপতি আপিস বাড়ী বা সিনেমা গৃহ, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাড়ী এবং গুদাম নির্মাণ করিতেছেন সরকারই তাঁহাদিগকেই শুধু গৃহ-নির্মাণের মালমশলা সরবরাহ করিতেছেন। বর্তমান গৃহ-নির্মাণ ব্যবস্থা বাসগৃহের অভাব লাঘব মোটেই হ্রাস করিতেছে না, বরং নিয়োজিত মূলধন হইতে যাহারা অধিকতর মুনাফা অর্জন করিতে চায় সেই সকল ধনী পুঁজিপতিকে সাহায্য করিতেছে।' (লেবনেলিই পত্রিকা হইতে ১৯৪৬ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখের 'The Calcutta Municipal Gazette'-এ উদ্ধৃত প্রবন্ধ)। মিঃ মিত্রাই অবশ্য সহজ ভাষায় এবং খুলিয়া

ভাবে আমাদের বাসগৃহের অভাবের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার "উক্ত বক্তব্যের মধ্যে গৃহাভাবের জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, পরবর্তী তিন বৎসরের উহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতীয় পার্লামেণ্টে মিঃ সিন্ধের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ স্যাজপিল যখন গৃহনির্মাণ শিল্পী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন মিঃ কাবাব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গৃহনির্মাণের মাল-মসলার এই অভাবের অবস্থায় দুই বৎসরের কোনও একটি সময়ে সিনেমা গৃহ, রেষ্টুরেণ্ট, এবং হোটেল নির্মাণে যেরূপ ঐ সকল মাল মসলা ব্যয়িত হইতেছে সেরূপ যে হইবে না, সে-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য রাখিবেন তো? ঐ সময় পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন, 'অন্যান্য প্রয়োজন মিটিবার পূর্বে ভারতে একটিও সিনেমাগৃহ নির্মিত হইবে না। বস্তুতঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট সময় প্রাসঙ্গিক গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত প্রাণবন্তুলা প্রাইভেট অট্টালিকাও নির্মিত হইতে পারিবে না।' বাসগৃহের অভাবের কথা বিবেচনা করিলে পণ্ডিত নেহরুর আশার কার্যে পরিণত হইয়াছে, একথা স্বীকার করা কঠিন।

ভারতের গৃহ-সমস্যা সম্বন্ধে সম্মিলিত [illegible] লোশাল অফেয়ার্স' ডিপার্টমেণ্টের [illegible] Social Affairs Department) রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "Stimulated by high rents and high selling price they (private builders) have lost no time in supplying demand for new residential buildings for the higher income groups and surmounting all difficulties in the construction of such non-residential buildings as motion picture, theatres and commercial buildings in India." অর্থাৎ 'বেশী ভাড়া এবং উচ্চ বিক্রয় মূল্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা (প্রাইভেট গৃহ-নির্মাতাগণ) বেশী আয়ের লোকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করিতে এবং সিনেমাগৃহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গৃহাদি নির্মাণের সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিতে বিলম্ব করিতেছেন না। প্রাইভেট গৃহ-নির্মাতাগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভাড়া দিবার জন্য বাড়ী নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যবসায়ি শ্রেণীর বাসোপযোগী তাঁহাদের সামর্থ্যের অনুরূপ ভাড়ার বাড়ী তো নির্মাণ করেনই নাই, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টগুলিও এ সম্বন্ধে কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের কতগুলি সহরে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দেয়। ঐ সময়ই সহরগুলিতে লোক-বাহুল্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে এবং উহা নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহা হইতেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সৃষ্টি। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আছে। কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই সকল ট্রাষ্ট দরিদ্র লোকদের জন্য যে সকল গৃহ নির্মাণ করিয়াছে তাহা যে অত্যন্ত মহার্ঘ সেকথা 'হেলথ সার্ভে কমিটির রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর গৃহ সমস্যা যে আমাদের জাতীয় সমস্যা তাহার স্বীকৃতি এ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাইতেছে না। গৃহাভাবে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্গতির সীমা নাই, যত লাঞ্ছনা তাহাদিগকে মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে হয়। তাহাদের এই দুর্গতির প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না, অথচ 'ইলিষ্ট্রেটেড উইকলী' ১৮ই আগষ্ট (১৯৪২) তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "কিন্তু যখন ভাড়াটীয়ার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অনেক বাড়ীর মালিকের নিকট হইতে আমরা অভিযোগ পাইতেছি।" এই অভিযোগ অত্যন্ত অন্যায় এবং তাৎপর্য-পূর্ণ। যতদিন গৃহাভাব থাকিবে ততদিন এইরূপ অপ্রকৃত অভিযোগ উঠিবেই। আজ আমাদের গৃহ সমস্যা এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টকেই গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের মত 'হাউসিং ফিনান্স কর্পোরেশন' অবিলম্বে গঠন করা আবশ্যক।

মধ্যবিত্তের বিপদ

কালীচরণ ঘোষ

সাধারণ লোকের সহজ [illegible] শক্তির [illegible] অতিক্রম করিয়া বিশের পরও দিন, মাসের [illegible] চলিতেছে। যুদ্ধের অজুহাতে আবার [illegible] আসিবে [illegible] সুখের আশা করিয়া [illegible], যুদ্ধের [illegible] লোকের কাছে অতীতের কাহিনী হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা অবশ্যবাহী হইয়া উঠিতেছে। এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেও জীবনযাত্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে যে [illegible] মূল্য ১০০ টাকা ছিল, ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে তাহা ৩৬০ টাকায় আর জুন মাসে ৩৮৯৷৵০ : পরিচ্ছদের ব্যয় বাড়িয়াছে এবং সর্বশেষে ১৯৪২ সালের জানুয়ারীর ৩৩০ টাকা জুনে ৩৩১৷৵০ হইয়াছে।

যুদ্ধ বাধিয়াছে, সেই কারণে জিনিষপত্রের দাম চাহিয়া নাই, তথাপি দ্রব্যাদির মূল্য কেন যে কমে না, তাহা সাধারণ লোকের কাছে এক কঠিন প্রশ্ন।

বাস্তবিকই দ্রব্যমূল্য যেরূপ চড়িয়া যাইতেছে, তাহা থামা উচিত কি না, সেই লইয়াই বড় প্রশ্ন। যুদ্ধ বিরতির সুযোগ হইতে, সকল দেশ যেরূপ চড়িয়াছিল, তাহা অপেক্ষা [illegible] নাই। অনেকগুলি বস্তু, যাহা পয়সা দিয়াও পাওয়া যাইত না, তাহা এখন অধিক করিলে, পয়সা ফেলিলে এবং কিছুকাল অপেক্ষা করিলে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই সকলের সম্পত্তি যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে জীবনযাপন একটু সুসহ হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য সুবিধা বিশেষ কিছুই হয় নাই।

বিনিময়ের সম্পত্তির সহিত চাহিদার [illegible] মূলধার যোগের সম্বন্ধের বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে যা [illegible] অনেক [illegible] যোগাযোগ আছে। [illegible] উৎপাদনের [illegible] বৃদ্ধি [illegible] হইবের যোগের [illegible]

চলিতে থাকে। এ বিষয়ে ধনিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহার জন্য যাহা ছিল, মুদ্রাস্ফীতি হইলে তাহার তাহাতে হাত নাই, মালিক হয় বাড়াইয়াছে চাহিয়া বুঝিয়া। তাহার সহিত প্রমিক বেতন, মজুর, যানবাহনের ভাড়া ও শক্তি উৎপাদনের ব্যয় প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইলে, সে সকল আদি পণ্যের উপর চাপিয়া পড়ে। তাহার পর তাহা নানা আকারে বিক্রয়ের উপযুক্ত করিতে যত কারখানা মজুরের হাত পার হয়, তত বারই চড়িয়া যায়।

দর যাহে দুই চক্র দিবে। একবার চাহিদা বৃদ্ধি হইলেই যখন দর চড়িতে থাকে, তখন তৎসংক্রান্ত সমস্ত মজুর প্রভৃতি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা লাভের অংশ দাবী করে; তাহা আদায় করিয়া পণ্যের দর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কয়লা, তুলা এবং ধানের কথা ধরিয়া আমরা তিনটী প্রধান পণ্যের কথা আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। এই কয়টী বস্তু সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাই বাস্তু সামান্য পরিবর্তিত আকারে অপর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বাস্তবিকই প্রয়োজন বা চাহিদার অনুপাতে দর যত বাড়ে, তাহা অপেক্ষা দর অধিক বাড়ে মানুষের লোভে। যে পরিমাণ দর বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনকারীর লাভ হয়, অথচ হঠাৎ অতিরিক্ত দর বৃদ্ধি হইয়া লোককে বিব্রত করে না, যদি সেই অবস্থায় আসিয়া দ্রব্যমূল্য আর বৃদ্ধি না পায় বা গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে আপনি দর কমিয়া আসে, লোকে শীঘ্রই গত দুর্বিপাকের কথা ভুলিয়া যায়।

আমাদের দেশে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,তাহাতে যুদ্ধের এত পরেও দ্রব্যমূল্য চড়িয়া থাকায় লোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যতদিন সাধারণ লোকের হাতে "চাঁচা পয়সা" ছিল, ততদিন বাজারে উপস্থিত মাল কিনিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা ছিল। ক্রমে এই তাড়াতাড়ি পূর্ণ মূল্য সমাজের "সুস্থ" হইয়া পড়িয়াছেন। কারবারে যা বাড়ীর দেনা, নূতন কারবার বাঁধার দেনা, গাড়ী ও নূতন চালানের মজুর রাখার দেনা বিব্রত করিয়াছে। এ সকলের মধ্যে যাহারা হিসাবী লোক, তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য কতকটা গড়িয়া লইলেও, বাজারে আসিয়া নূতন চালের খরিদারী করেন না; খুব পূর্বে যেমন বাজার-হাট করিতেন, প্রায় সেই রকমই করেন। তবে পূর্বের দিন হইলে বর্তমান দরে, অনেক কিছু কিনিতেন না, এখন সে সকল প্রায় করিয়া থাকেন।

চাহিদার বৃদ্ধি অপর যে ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে, তাহারও এ স্থানে উল্লেখ থাকা দরকার। প্রতিদিনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই হিসাবে অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন মিটাইতে অতিরিক্ত পণ্যের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া চাষী ও মজুর, বিশেষতঃ যে সকল চাষীর উদ্বৃত্ত পণ্য থাকে এবং যে সকল মজুর কোনও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বেতন, ভাতা, বেতন প্রভৃতি পান, তাঁহাদের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে। তাঁহারা আগে যাহা কিনিতেন না আজ বাজার হইতে তাঁহারা সেই সকল বস্তু ক্রয় করিতেছেন।

এখন বাজার যে অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অতি সঙ্গীন। লোকের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা যুদ্ধের কৃপায় যাহা সামান্য আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন কর্মের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কর্মহীন হইয়া পড়িতেছেন। লোকে আগে যাহা কিনিত, আজকাল আর তত কেনে না। যুদ্ধের পূর্বে লোকে যত কাপড় পরিত, যত ভাল ভাত যাহা খাইত, যত আত্মীয়-স্বজন অথবা কুপোষ্য পালন করিত, আজকাল আর তত করে না বা পারে না। সুতরাং যুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধোত্তর কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাহিদা যতটা বাড়িয়াছে, তাহার সবটা নাইই হউক, কতকটা লোকের ক্রয়শক্তির হ্রাস হওয়ায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে।

লোকে বলিয়া আছে, বাজারে দর পড়িলে তখন কিনিবে। বিক্রেতা কাল চড়া দরে বিক্রয় করিয়াছেন, আজ তিনি দর কমাইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার হাতে এ সময়ের মাল কতকটা নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশই নির্ভর করে মূল উৎপাদকের উপর।

পূর্বেই বলিয়াছি, চাহিদা ও প্রমিক প্রভৃতি ব্যাপারে বাড়-চড়তা কমিয়াছে, সুতরাং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া উৎপাদনে যে শিথিলতা পড়ে, তাহাতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা সম্ভব নয়।

ক্রেতা বলেন, তিনি বর্তমান বাজার দরে আর মাল কিনিতে পারেন না। বিক্রেতা বলেন, মজুরী, সরকারী ট্যাক্স, শক্তি উৎপাদন, ভাড়া প্রভৃতির বর্তমান যে হার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাজারে একটা "টানা-হেঁচড়া" ব্যাপার চলিতেছে।

একটা মীমাংসা না হইলে নগদ বিক্রেই বিঘ্নাট দেখা দিবে। কিন্তু চড়া দরে কেনার যখন লোক নাই, তখন জমাদে মাল জমা হইবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। বাজারদর সম্পর্কে ঠিক এই নিয়ম প্রযুক্ত নাও হইতে পারে, কারণ মানুষ অপর যাহাই উপেক্ষা করুক, কিছু না কিছু খাওয়ার ব্যবস্থাই করিতে বাধ্য হইবে। ব্যবহারের অন্য বস্তু সম্পর্কে এই নিয়ম পালিত না হওয়াই সম্ভব।

সাধারণ বাজারে মালের দাম কমাই উচিত ছিল। কারণ এত চাহিদা নাই, বিদেশী মাল আমদানী আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং প্রতিযোগিতা দেখা দিতেছে। লোকের ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে।

শিল্পপতিগণ ইহার প্রতিকার চিন্তা করিয়াছেন। তাঁরা ভারতবর্ষের পরিবারের মত প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে মাত্র দু'চই লোক—মালিক বা ম্যানেজিং এজেন্টের উপর। তাঁহারা কয়জন একমত হইলে বাজারে একটা অভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে প্রমিককে উৎকোচ উৎসাহ দিয়া মিলে কর্মঘট করাইয়া মিল বন্ধ রাখিতে পারেন; উৎপাদন বন্ধ থাকিলে, বাজারে যে ঘাটতি তাহা থাকিয়াই যায়। চিনি, সিমেন্ট কাগজ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যতিক্রম যা থাকিবারই কথা। তাঁহারা বিদেশী আমদানী রোধ করিবার জন্য সরকারী আইন জারী করেন। তাঁহারা অবাধ রপ্তানী করিবার জন্য জিদ ধরিয়া সরকারী আনুকূল্য লাভ করেন। এখানে বিক্রয় করিলে লাভ হয় না, বহু লাভ হয় রপ্তানী করিতে পারিলে। এই অতিরিক্ত লাভের লোভেই তাঁহাদের কর্মপ্রেরণা যোগাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করা দূরে থাক, প্রয়োজন হইলে ইঁহারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা দুকাইয়া দিতে পারেন, কারখানা চালাইলেই বিপদ বেশি।

সরকারী ব্যবস্থায় কারখানার কাঁচামালের দাম, শ্রমিকের মজুরি, ট্যাক্সের হার, মাল চলাচলের যানবাহন প্রায় সবই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহা যে সকল সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল তাহাও নহে। এই নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলে কারখানার মালিকরা যখেচ্ছ দর বজায়ইয়া দিতে পারেন, শ্রমিককে অধীনে রাখিয়া লাভের মাত্রা বাড়াইয়া চলিতে পারেন। আবার নিয়ন্ত্রণ রাখিলে শিল্পপতিরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কেবল যে মালের দর হ্রাস করিতে পারেন না তাহা নহে, উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বেশী।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে একটা 'অগ্ন-বিমুক্তি' অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত—উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে অন্ন কষ্ট, বস্ত্র কষ্ট, কোনও কষ্টেরই বিমুক্তি নাই। এই উৎপাদন বৃদ্ধি যাহাতে সুসম হয় তাহার জন্য সরকার, বিক্রেতা, ক্রেতা সকলেরই সমবেত চেষ্টা থাকা দরকার।

উৎপাদক বিক্রেতা বলিতেছেন যে, বাজার পড়িতেছে আর সেরূপ ক্রয়-বিক্রয় নাই। ব্যবসা চালু রাখার আনুষঙ্গিক যে ব্যয় তাহা অত্যন্ত ভারি হইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। চিনির বাজারে না হউক, অন্য বাজারে একটা সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ইহার ফল শুভ নহে।

উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া গেলে মাল বেশী বিক্রয় হইবে। তাহার 'হাত ফেরতা' বাড়িবে। বর্তমানে বাজারে টাকার যে অনটন আছে, তাহাতে অন্ত সরকারী নীতি কতটা দায়ী তাহাও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। অপর দিকে বিদেশী মাল আসিতেছে, তাহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহাদের যোগাযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। বাজারে মালের অত্যন্ত অভাব থাকায়, সাধারণ লোকের কথা ভাবিয়া মাল আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখন মাল যাহাতে চালু থাকে তাহার ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোন স্থানে বা কাহার স্বার্থে হাত দিলে গুরুতা কম পড়ে, তাহা বলা খুব কঠিন নয়; কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোনও একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংস্থায় একটা ঘূর্ণিপাক আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এ সঙ্কট সর্ব্ব দিক হইতেই বর্ত্তমান; কেবল অল্পে উৎপন্ন করিতে পারে।

অর্থনৈতিক নীতির কোথাও কোথাও পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত লাভের লোভ দমন করিতে না পারিলে, কোনও ব্যবস্থায় কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদক শ্রেণী পূর্ব্বের মত লাভ করিবার লোভ করিলে এবং লাভের পরিমাণ পূর্ব্বের মত না হইলে কারবার বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলে সমূহ বিপদ। শ্রমিক শ্রেণী যুদ্ধকালে অতিরিক্ত লোভ করার ফলে, কম কাজ করিয়া বা সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়া যে উপার্জ্জন করিত, তাহা আর চলিতে পারে না। যাহার একটাকা রোজ ছিল, তাহার তিন টাকা

রোগান্তে....

শুশ্রূষা ও কর্মশক্তিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে হলে সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। যেমন ইমিউনিটি কোম্পানীর "এসেন্স অব চিকেন" বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত এবং সহজপাচ্য ও আশুফলপ্রদ।

বি, আই,
এসেন্স অব
চি কে ন
আদর্শ পুষ্টিবর্দ্ধক

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা—১৩

রোধ হয়ত আপত্তি না করিতে পারে, কিন্তু এক টাকায় যে কাজ দিত, এখন তিন টাকায় তাহার অর্দ্ধেকের বেশী হয়ে না। কাজেই তিনিষের গড়তা হয়ত দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থা চলিতে থাকিলে কারখানা বন্ধ হইবে, কিন্তু উৎপন্ন মালের দাম কমিবার সম্ভাবনা নাই।

উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে, দেশের লোকের অভাব মিটিবে না; অভাব না মিটিলে তাহারা বিদেশী মালের আমদানীর জন্য চীৎকার করিবে। চড়া দ্রব্য মূল্যের সহিত তুলনায় বিদেশী ইহা সস্তায় পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট আমদানী শুল্ক পাইবে, কিন্তু কিছু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রয়োজনবোধে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ট্যাক্সের ভার না কমাইলে আর চলে না। এই সঙ্গে বলিতে হয়, সরকারী ব্যয়নীতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অত্যধিক বেতন, নূতন করিয়া অপ্রয়োজনে বিদেশে দূতাবাস সৃজন এবং আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ, আত্মীয়স্বজন পোষণ এবং তাহাদের প্রয়োজনে নূতন নূতন পদ সৃষ্টি, বিরাট পরিকল্পনার বিলাস, রাজন্য শাসন ব্যাপারে দারুণ অপব্যয় প্রভৃতির লোভ সম্বরণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার যাহা ছাড়া চলা, যাহার যাহা ছাড়া চলে, তাহা যথাসম্ভব যদি লোপে সইয়া এবং দাম করিয়া সম্ভব থাকে, তবে এই দুরবস্থার স্বাভাবিক ভাবে কোনও উপায় হইতে পারে।

যে জাতির ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, তাহার নিকট দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য পণ্য সম্ভার দেখাইয়া লাভ নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে, ইহা শিল্পপতিদলের পক্ষে গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু ক্রেতার ইহাতে সুখ নাই। কারণ তাহার ক্রয়শক্তির মধ্যে হয় নাই। আর হঠাৎ যদি হর পড়িয়া বাজারে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হয়, তাহা হইলে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইবে। যুদ্ধের অবসানে যে বেকার সমস্যা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, আজ তাহা রূপেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে এবং অতিকালের মধ্যে বেকারে দেশ ভরিয়া যাইবে। এখন হয়ত তাই চাইবে, বাপ বেটার বিলিয়া যারা কিনিতে পারে তখন একজন বা উভয়ের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইলে আর কিছুই কিনিতে পারিবে না, বাজারে একটা ওলটপালট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নাই। বিক্রয় নাই, দর আছে; সাধারণের পক্ষে যে ঘরে মাল লইয়া শিল্পকে পুষ্ট সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। সকল দিক একত্র বিলাইয়া দেখিলে দুদিকে ইহা কর্ম্ম অতিরিক্ত দামের লোভ সম্বরণ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রয়োজন হয় সর্ব্বোপরি (Communism) বা সাধারণতন্ত্র (Socialism) ব্যবস্থার সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্ত্তিত হউক। আর যা হয়ত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ধনিকতন্ত্রের অর্থনীতি সমর্থন করিয়া যথাসম্ভব ট্যাক্স ও 'রেস্ট্রক' বা অবরোধ কর্ত্তৃত্ব দূর করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আপনার ইচ্ছামত কাজ করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা হউক। বিশেষজ্ঞ বা শিল্প প্রসার পরামর্শদাতা সমিতির সভায় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞের মত শিল্পপতি ও শ্রমিককে সুপরামর্শ দান করিবেন। শিল্পপতিরা গবর্ণমেণ্ট ও শ্রমিককে এবং শ্রমিক প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট ও শিল্পপতিদের যোগাযোগ করিবেন। এ রীতি অনুসৃত হইলে গবর্ণমেণ্ট, শিল্পপতি ও শ্রমিক সকলেই বিপন্ন হইবেন; আর এই যন্ত্রের ঘরে পড়িয়া মধ্যবিত্ত ক্রেতার দল নাজেহাল হইতে থাকিবেন। এ অবস্থা যে কাহারও পক্ষে শুভ নহে, তাহা কত দিন বুঝিতে লাগিবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

জীবন-বীমা ও জীবনধারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য নির্ব্বাচিত ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তকে (বোধহয় "King Reader") হ্যারি নামক একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় ইংরাজ বালকের বাল্যস্মৃতির কথা লিপিবদ্ধ ছিল। ভারতীয়দের কাছে বিষয়টী অতি সাধারণ, কারণ ভারতীয়দের চরিত্রে বাল্যস্মৃতি অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ গুণ। তাহার জন্য আমরা আশ্চর্য্য হই না—বরং তাহার অভাবে দুঃখ বোধ করি। কিন্তু এই বিষয়টী যখন আমার দ্বারা কেলাইয়া কাঁপাইয়া ভারতীয় ছাত্রদের সম্মুখে ধরা হয় তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি হৃদয়ের সহজাত জ্ঞান ও অনুভূতিতে ভারতীয়েরা অন্য জাতি অপেক্ষা কতখানি উন্নত। মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা অর্থাৎ পরিবার ও গৃহ-সংসারের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, আমাদের গৃহ, আমাদের সংসার ও পরিবার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার তাৎপর্য্য ও গভীরতা অন্য জাতির পক্ষে উপলব্ধি করা তেমন সহজ নহে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, পরিবারের প্রতি, গৃহের প্রতি অর্থাৎ আমাদের মাতাপিতা, সন্তান ও নির্ব্বান্ধব নিকট আত্মীয়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও কর্ত্তব্যবোধ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সেই পরিবারবর্গ গৃহ-সংসারের সহিত সমগ্র জাতির একটী ব্যাপক যোগসূত্র আছে। এই গৃহ-সংসারকে রক্ষা করিয়া রাখিতে হইলে তবু স্নেহপরতা, ভালবাসা বা ভক্তি দিয়া চলিবে না। চাই সংসারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির বৈষয়িক বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। চলতি কথায় আমরা বলি সংসার বাঁচে, গৃহের রক্ষা হয় "খুঁটি"র জোরে। সংসারের অভিভাবক বা কর্ত্তাই হইতেছে সে "খুঁটি"।

এই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিকে লইয়াই আমাদের গৃহ-নীড় রচিত হইয়া থাকে। সেইজন্য খুঁটির জোর চলিয়া গেলে সেই গৃহ-নীড়টীও ভাঙিয়া পড়ে। একজন বয়স্ক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির অভাবে কি ভাবে যে আমাদের সংসার ভাঙিয়া যায়, পারিবারিক ঐক্য নষ্ট হয় এবং প্রত্যেকের জীবন বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে তাহা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষই করিতেছি—

কি করিয়া গৃহ-সংসারের স্থিতি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি না। ছায়ির যাদুকরকি আমাদের কাছে আশ্চর্য্যের বিষয় না হইলেও ছায়ির দেশের লোকেদের পারিবারিক জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে উপকৃতই হইব—শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়—জাতিগত ভাবেও।

আমাদের গৃহ-সংসারে পারিবারিক সুখ, শান্তি, সুখলা, নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে বর্ত্তমানে অভাবমুক্ত ও ভবিষ্যতে দুশ্চিন্তা হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহার ওপর সমর রাখিতে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের জীবনের কাছে "গৃহ" যে কতখানি তাৎপর্য্যপূর্ণ ও ব্যাপক কল-সম্ভাবনায় আকর্ষণীয়—তাহার কামনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ও সার্থক করিবার পক্ষে যে তাহা কতখানি প্রয়োজনের তাহা বুঝিতে পারিলে এ সম্পর্কে জীবন-বীমার যে কতখানি প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে তাহাও বুঝা যাইবে। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যানাডার সুপ্রসিদ্ধ বীমাবিদ্ বলিয়াছেন :—

Life Insurance stands for the continuity of the home. The home is the essential factor of a nation and hope of the world. Anything that works for continuity of the home must be immeasurable in its influence. The centre figure of the home is the provider, the wage-earner. The home is built around him. If he fails, the home is shattered and scattered, it can no longer holds together. But life insurance steps in when the provider is called away and takes his place. Thus the continuity of the home is preserved."

অর্থাৎ—গৃহকে চিরস্থায়ী করার জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ প্রত্যেক জাতির জীবনে একান্তই প্রয়োজন, পৃথিবীর আশাভরসাস্থল। গৃহকে বাঁচাইয়া রাখিবার যাহার সার্থকতা, তাহার প্রভাব হইবে অপরিসীম। যিনি পরিবার প্রতিপালন করেন, তিনিই ও সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাঁহার চারিদিকে গৃহ-নীড় রচিত হয়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সংসার বিকশিত ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে—পারিবারিক বন্ধনও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু প্রতিপালকের অভাবে জীবন-বীমা তাঁহার স্থানে পালনের ভার গ্রহণ করে। গৃহ-সংসার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। এই জন্যই শৃঙ্খলা-সমন্বিত, পরস্পর পারিবারিক বন্ধনযুক্ত অভাবমুক্ত সংসারের স্থান সামাজিক জীবনের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবন-বীমা সংসার-জীবনকে যে শুধু দুশ্চিন্তাবিহীন ও নিরুদ্বেগ করে তাহা নহে, জীবন-ধারাকে বিধিবদ্ধ করিয়া মানুষের সামাজিক কল্যাণের পথকে মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দেয়। দুঃখদারিদ্র্যাক্রান্ত অবসন্ন মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিজীবনের পক্ষে যেমন কুফল-প্রদ, ব্যক্তিজীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত সমাজ-জীবনেও তাহার কু-প্রভাব সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সক্ষম এবং সচ্ছল-নিশ্চিন্ততা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া সংসারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করে, এবং সমাজকে কর্ম্মক্ষেত্রে সমৃদ্ধিত করিয়া সমগ্র জাতিকে আত্মস্থতর হইবার সুযোগ দেয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বাষিক আয় কম হইলেও তাহার তুলনায় জীবন-বীমার প্রসার এখনও আশানুরূপ হয় নাই। নিম্নের অঙ্ক তালিকা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় :—

দেশ	মাথাপিছু আয়	মাথাপিছু জীবনবীমা	আয় ও জীবনবীমার অনুপাত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪০৬	২৩০০	১'৬৪
কানাডা	১০৩৮	১৪৭৩	১'১৪
ব্রিটেন	১৮০	১৭৩	১'০
অষ্ট্রেলিয়া	১৭২	১৬০	১'০
জার্মানি	৬০৩	৭৪০	০'৯
ভারতবর্ষ	৬৪	১২	০'১৮

জীবন-বীমার উপকার সম্পর্কে এডুক কারনেগি বলিয়াছেন—"Insurance brings peace and prevents ruin to innumerable lives and homes"—অর্থাৎ জীবন-বীমা অসংখ্য দুঃখ হইতে কত জীবন ও কত সংসার রক্ষা করিয়া শান্তি আনিয়াছে। আর Charles E. Hughes নামক একজন বীমাবিদ বলিতেছেন—

"There was only one way in which a poor man without capital could protect his family from the vicissitudes of fortune and make proper security against the day that must come to all, and that was through life insurance"

জাতির শিল্প, সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল
ধারক ও বাহক

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস লিমিটেড

২১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৪২৮১ : : টেলি : বিদ্যাসেবা

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিদেশী কাগজ, বোর্ড, পোষ্টকার্ড, খাম, ছাপার কালী প্রভৃতির বৃহত্তম ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুদৃঢ় সাধুতার সহিত একান্তভাবে আপনার সেবায় নিয়োজিত

ব্রাঞ্চ : ৬৯, হারিসন রোড, ফোন বড়বাজার ২৮
১১৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট
১৩৪ ও ১৩৫, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট

মফঃস্বল ব্রাঞ্চ : পটুয়াটুলি, ঢাকা।

অর্থাৎ—একজন গরীব লোক, যার কোনও বুলধন নাই, তার পক্ষে অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনা হইতে তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা, এবং যে অনিবার্য্য ঘটনা একদিন সকলের আগেই ঘটিবে—তাহার প্রতিরোধকল্পে উপযুক্ত সঞ্চয় করার একমাত্র উপায় জীবন-বীমা করা। ধনী দরিদ্র সকলের কাছেই জীবন-বীমার সার্থকতা আছে। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট কলভিন কুলিজ বলিয়াছেন—

"There is no argument against the liking of life insurance. It is established that the protection of one's family or those near to one, is the one thing most to be desired and there is no medium of protection that is better than Life Insurance."

অর্থাৎ—জীবন-বীমা করার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি চলে না। ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, নিজের পরিবার ও প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ সংস্থান-কল্পে জীবন-বীমা অপেক্ষা অন্য কোনও প্রকৃষ্টতর পন্থা নাই।

আর একস্থানে লর্ড রোজবেরি আরি সুন্দরভাবে জীবন-বীমার প্রশংসা করিয়াছেন :—

"Life Insurance means death-blow to poverty. The man who possesses a policy holds a bond from the fate. It is a security that is never absent. It can be carried in a man's pocket. If thieves steal it, they cannot cash it. Friends cannot borrow it. It is free from care and is a sure inheritance. In short a good policy is anchor of a home."

অর্থাৎ—জীবন-বীমা দরিদ্রতার পক্ষে মৃত্যু-বান। যার বীমা আছে অদৃষ্ট তার তাঁবেদার। বীমার চুক্তিপত্র সর্ব্বক্ষণ থাকে, মানুষের পকেটে পকেটে ঘুরিতে পারে কিন্তু চোর ইহা চুরি করিয়া ভাঙাইতে পারে না, বন্ধুবান্ধবও ধার লইতে পারে না। বংশানুক্রমিক নিরাপদ এই জীবন-বীমা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সারবান বীমাপত্র সংসারের সর্ব্বোত্তম অবলম্বন।

জীবন-বীমার যুক্তিসঙ্গত প্রভাব ও সার্থকতার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অর্থাৎ জীবন-বীমার সুবিধা ও কল্যাণ, নিশ্চিন্ততা ও আরাম শুধু এক পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাহার প্রভাব বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। অভিভাবকের অভাবে জীবন-বীমার দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে সন্তানগণ শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হয়। "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হয় না বলিয়া তাহার সুশিক্ষা ও আচার ব্যবহারের সুফল আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—বীমার দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী বংশের ভাবধারা, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতিকে অনাগত অপরবংশের চরিত্রে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

আমরা বাঙালী, আমাদের ঘরের মর্য্যাদা ও সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে অব্যাহত দেখিতে পাইলে—ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতার দ্বারা জাতির সামগ্রিক স্বাধীনতা রক্ষার কাজে সহায়তা করিতে পারিলে—তৃপ্তি বোধ করি। এই একার তৃপ্তিবোধের মধ্যে আমাদের মুসলমানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে—অভাবে ও দুর্দ্দশায় বিধিষ্ণু ও বিপর্য্যস্ত বাঙালী সমাজ আজ জীবনধারণের প্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমার সর্ব্বনাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার আর কোনও উপায় নাই।

যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের প্রশ্ন সর্ব্বদেশেই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আধুনিক যুগে এই পুনর্গঠন সমস্যার বিবেচনার শিল্প পুনর্গঠনের কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যুদ্ধের সময় অনিবার্য্যভাবে একটা কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি হইয়া কাজকারবার প্রসারিত হয় এবং বেকার সমস্যার সমাধান হয় মহানন্দে। যুদ্ধ শেষ হইলে এই লব্ধপ্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্রের সুযোগ স্বভাবই সঙ্কুচিত হয়। যুদ্ধান্তের স্বাভাবিক বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং সেই সূত্রে দরকার শিল্প পুনর্গঠনের। নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন চালু শিল্পাদির প্রসারের ফলে শুধু মহানগরীর কর্ম্মক্ষেত্রেরই হয় না, পল্লীঅঞ্চলেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, পল্লীর অর্থের প্রচলন-গতি বৃদ্ধি পায় বলিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশবাসী লাভবান হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় যে দেশ পণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী, সেদেশে এই যুদ্ধোত্তর শিল্প পুনর্গঠন পরিকল্পনার গুরুত্ব অসাধারণ। বিদেশী শাসনের অবসানের পর এখন ভারতের শাসন পরিচালনার ভার ভারতবাসীর হাতে আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে সত্বরভাবে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হওয়া দরকার। এ দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত, কিন্তু অকর্ম্মণ্য। ইহাদের লক্ষ্মী রাখার সহিত দেশের শান্তি শৃঙ্খলা স্থায়ীভাবে রক্ষা করার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাঁহারা আজ শাসনকার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহারা অতীতে দেশসেবা ও স্বদেশীর আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে প্রভাব আসন পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে এই জনবাহিত এবং দুর্বহ সম্মান। এখন এই দায়িত্ব যথাযথ-ভাবে পালনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে দেশের অর্থ নৈতিক দুর্গতি দূরীকরণে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিকতা। যে কারণেই হউক, ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করা যদি বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের পক্ষে অভিবিলম্বে সম্ভব না হয় দেশের সাধারণ অধিবাসী সবদিক ভাবিয়া হয়তো আর বেশীদিন তাঁহাদের সমর্থন করিতে চাহিবে না এবং সেক্ষেত্রে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব নয়। অথচ এইভাবে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা আলোচনা না করিলেও চলিবে। সুদীর্ঘ পরাধীনতার দুর্ভাগ্য ও

চাপে ভারতবাসীর অবস্থা এখন শোচনীয়। যুদ্ধোত্তর বৈকার সমস্যা তথা অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কায় সারা দেশ আজ উদ্বিগ্ন। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য অন্ততঃ সরকারকে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেই হইবে। শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি যদি ত্বরান্বিত হয়, তবেই কাজকারবার বাঁচিবার ফলে লোকের অবসরের বর্তমান ভয়াবহ সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবার আশা আছে।

শিল্পের উন্নতি করিতে ভারত সরকারের অনিচ্ছা না থাকাই স্বাভাবিক, তবে এদিক হইতে সম্প্রতি তাঁহাদের যে অসুবিধা হইতেছে, সে কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ। সকলেই জানেন, ভারতে যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয় না। বিদেশ হইতে বর্তমানে যন্ত্রপাতি বিশেষ সংগ্রহ করা যাইতেছে না এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবও এখন ভারতের বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানীর পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন শুধু নূতন কলকারখানা স্থাপনের জন্য নয়, গত কয়েক বৎসর অতিরিক্ত কাজের চাপে পুরাতন কলকারখানার যে সব যন্ত্রপাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেগুলির সংস্কারের জন্যও বহু যন্ত্রপাতি দরকার। এইভাবে যন্ত্র আমদানী এমনও [illegible] করিয়া ভারতে কলকারখানার প্রসার [illegible] হইতেছে না এবং ইহার ফলে [illegible] কর্মসংস্থান সমস্যার তীব্রতা ক্রমশঃ [illegible] হইয়া উঠিতেছে। তবে এই দুর্দিনেও আশার কথা এই যে, এ দেশের এইরূপ শোচনীয় এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি [illegible] সরকার কর্তৃপক্ষ বর্তমানে [illegible] হইয়াছেন, এবং সরকার এখন [illegible] করিয়াছেন যে, অতঃপর বিদেশ হইতে [illegible] পরিত্যক্ত্যাবশ্যকী করা হইবে তাহাদের [illegible] পরই যন্ত্রপাতি আমদানীতে স্বাভাবিক সুবিধা [illegible] হইবে। ভারতের অর্থ-বান শিল্পোৎসাহিগণ [illegible] কলকারখানা গড়িতে আগ্রহশীল হন, সেজন্য সরকার তাঁহাদের শিল্পনীতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত—এই তিন বৎসরের মধ্যে যদি কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পাঁচ বৎসরে সেই সব প্রতিষ্ঠান কোটি মূলধনের শতকরা ৬ টাকা আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইবে। ভারত সরকার যে শিল্পাদির জাতীয়করণের নীতি দশ বৎসরের জন্য স্থগিত করিয়া আগামী দশ বৎসর শিল্পগুলিকে নিশ্চিন্তভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকিতে দিবেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অতঃপর শিল্পপ্রসারের নীতিতে তাহাদের বিশ্বাসই ইহার প্রধান কারণ।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে যথাসময়ে সুবিধায় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্কের হার আগের তুলনায় হ্রাস করিয়াছেন। এইরূপ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বেলপথে সময় চলাচলে যথাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এছাড়া উৎপাদন বাড়াইতে হইলেই যন্ত্রপাতির খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়া ভারত সরকার এদেশের কলকারখানাগুলিকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস,—এই পাঁচ বৎসরের হিসাবে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে আগের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ সংস্থানের সুবিধা দিয়াছেন। শিল্পগুলিতে সরকার অর্থ সাহায্য বা লগ্নী করিলে যেখে সাধারণ শিল্পোৎসাহ থাকিতে পারে, এই ভরসায় ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন আইনের সাহায্যে ৫ কোটি টাকা বিনিময়ক্ষম মূলধনসহ একটি শিল্প সাহায্য সংস্থা গঠন করিয়াছেন। এ ছাড়া শিল্পাদির নিরাপত্তা সুবিধা লাভের আবেদনগুলি যাহাতে সুবিবেচিত হয় এবং সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কিত পরিসংখ্যান যাহাতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়, তারত সরকার তদুদ্দেশ্যে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ড বা ট্যারিফ বোর্ডের প্রথায় করিয়া সভাপতি ছাড়া সদস্য সংখ্যা দুইজনের স্থলে তিনজন করিয়াছেন। ট্যারিফ বোর্ড সম্প্রসারণ ব্যতীত ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। মিঃ এ ডি গ্রে প্রমুখ বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কমিশনের সদস্যগণ ভারতীয় শিল্পের মূলধন, শিল্প সম্পর্কিত করনীতি, শিল্পের লভ্যাংশের একাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ট্যারিফ বোর্ডের সদস্যবৃন্দের সহিত এই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিলে ভারতের শিল্প পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে উন্নতি লাভ করিবে।

প্রকৃতপক্ষে সরকারের শিল্প-নীতি ঘোষণার ফলে এবং দেশবাসী সরকারের সহিত শিল্পের ব্যাপারে সম্প্রতি অধিকতর সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া ভারতীয়

Phone :—Bank 6453. Cable :—ADJUST, CALCUTTA

EAST INDIES

TRADING CORPORATION

IMPORTERS OF MILL FURNISHING STORES, CHEMICALS AND MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF TAMARIND SEED POWDER TO THE COTTON AND JUTE INDUSTRY.

12 B CLIVE ROW, CALCUTTA—1

শিল্পের অবস্থা এখন আগের তুলনায় একটু ভালোর দিকে চলিয়াছে। এই উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এখনও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এদেশের শিল্প-সম্ভার সম্ভব হয় নাই, উন্নতি যেটুকু হইতেছে তাহা চলতি শিল্পগুলি সুপরিচালিত হইবার ফলে। প্রকৃতপক্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির যন্ত্রপাতির অবস্থা এখন ক্রমেই এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, যুদ্ধের যে সঙ্কটভাব দেখা দিয়াছিল, আশঙ্কা হইতেছিল বুঝি বা তাহা ক্রমেই লক্ষ্যীভূত হইবে। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে শিল্প-পরিবেশেই সেই অবনতির ধারা যখন প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, আশা করা যায়—অতঃপর ভারতীয় শিল্প ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই যাইবে। এই উন্নতির সহিত ভারতবাসীর তথা ভারত সরকারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এতথা আগেই বলা হইয়াছে।

যুদ্ধের প্রথম দিকে কিছু দিন অনিশ্চিত অবস্থার জন্য ভারতীয় শিল্পজগতে একটু ঢিমিত ভাব দেখা যায়, কিন্তু এই ঢিমিত ভাবের অবসানে ঘটে জাপান পূর্ব সোলার্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে। ক্রমে যুদ্ধ ঘোরালো হইয়া উঠে এবং চাহিদার চাপে ভারতীয় শিল্পে কাজকারবার বাড়িয়া যায়। সমগ্রভাবে যুদ্ধের আগের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইহার পর যুদ্ধ শেষ দিকে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপণ্যের উৎপাদন কমিতে থাকে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর কিছু কাল উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দেই উৎপাদন সব চেয়ে কম হয়। এই যে উৎপাদন হ্রাস ঘটে, যুদ্ধোত্তরকালের শ্রমিক বিক্ষোভ ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যখন মোট ৩০৬টি কর্মঘটে ৪৯,২১,১৯৫টি কাজের দিন নষ্ট হয় ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থলে যথাক্রমে ১৬১৯টি ও ১৮১১টি কর্মঘটে মোট কাজের দিন নষ্ট হয় যথাক্রমে ১,৫৭,১৭,৭৬২ ও ১,৯৮,৬২,৬৬৬টি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে সরকার, শিল্পপতি এবং শিল্প শ্রমিক, সকলে সমবেত ভাবে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্মঘটের সংখ্যাও কমিয়াছে। এই বৎসর ভারতে মোট ১৬৮৩টি কর্মঘটে ৮৫,৩১,৫৩১টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক বিক্ষোভ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও কম হইতেছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মাস পর্যন্ত ৪ মাসের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই পাঁচমাসে ভারতে মোট ৫৫৯টি কর্মঘটে কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে মোট ১৮,৭২,১১৪টি। এ বৎসরের এই পাঁচ মাসের সংখ্যাদির সহিত ১৯৪৮ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাঁচ মাসের পরিসংখ্যানের তুলনা করিলে আশান্বিত হইতে হয়। এই দুই বৎসর প্রথম পাঁচ মাসে কর্মঘটের ফলে এদেশে নষ্ট হইয়াছে যথাক্রমে ৫০,৪১,৪৬৬টি (১৯৪৮) ও ৯৩,৩৪,১৬৪টি (১৯৪৭) কাজের দিন।

সম্প্রতি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় শিল্পের অবস্থা ৪২টি শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হইয়াছিল। এই হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আগের বৎসরের তুলনায় সমগ্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যদিও উল্লিখিত ৪২টি শিল্পের মধ্যে ৭টি শিল্পে উৎপাদন বাড়িবার পরিবর্তে বরং কিছুটা কমিয়াছে এবং যে ৩৫টি শিল্পে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সেগুলির অধিকাংশের বৃদ্ধির হার লক্ষণীয় নয়, তথাপি অবনতি আরম্ভ হইবার পর সেই অবনতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া এই যে উন্নতি সুরু হইয়াছে, শিল্প ভবিষ্যতের হিসাবে ইহারও মূল্য কম নয়। উন্নতি হইয়াছে যে শিল্পগুলিতে তন্মধ্যে কাপড়, সুতা, সিমেন্ট ও কাগজ শিল্প আছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চারিটি শিল্পে উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৪২১ কোটি ৪৬ লক্ষ গজ, ১২১ কোটি ৩২ লক্ষ পাউণ্ড, ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার টন এবং ১৭ হাজার টন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৭৩ কোটি ৬০ লক্ষ গজ, ১৩৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার টন এবং ১৯ হাজার ৭ শত টন। এছাড়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লোহা শতকরা ৩২ ভাগ, দালফিউরিক এসিড শতকরা ৩৩ ভাগ, সিগারেট শতকরা ৪৭ ভাগ, সুরাসার শতকরা ৬১ ভাগ, বনস্পতি শতকরা ৪২ ভাগ, প্রিন্টিং পাইটার শতকরা ১১ ভাগ, ঔষধাদি শতকরা ৭৯ ভাগ, বাইসাইকেল শতকরা ৬ ভাগ এবং বৈদ্যুতিক মোটর শতকরা ৪৮ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়াছে। যদিও কয়লা এ বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টন (শতকরা ১ ভাগের কম) কম উত্তোলিত হইয়াছে, তথাপি খনিজের হিসাবে সমগ্রভাবে—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে শতকরা ৮ ভাগের মত উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলোচ্য হিসাবে যে সাতটি শিল্পের উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই (৩৯,২৯০ টন, —শতকরা ৪ ভাগ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া চা শতকরা ২ ভাগ, পশমী বস্ত্র শতকরা ১ ভাগ, কাঁচের বাসন শতকরা ১½ ভাগ, এ্যালেলের ডিমিথলেট শতকরা ২০ ভাগ এবং ঔষধ ব্যবহার শতকরা ৬ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এই উৎপাদনহানি অবশ্য খুব বেশী নয় এবং নানা প্রাকৃতিক অসুবিধা, যানবাহনের অপ্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে ইহা সম্ভব হইয়া থাকিতে পারে। সরকারী মহলই আশা করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এই শিল্পগুলির অবস্থাও সমুন্নত হইবে।

ভারত সরকার বর্তমানে এদেশে শিল্পাদি বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে শিল্পোৎসাহী বেসরকারী শিল্পপ্রসারে আগ্রহ বোধ করিবেন। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন চালু শিল্পগুলির সংস্কার যাহাতে হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার হিসাবে নূতন শিল্প অপেক্ষা পুরাতন চালু শিল্পের নিকট হইতে অধিক উৎপাদন আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের শিল্পের যে উৎপাদন ক্ষমতা সে তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন অনেক কম। (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে শতকরা নিম্নরূপ :—লৌহ ও ইস্পাত—৬৮ ভাগ, ইলেকট্রিক ল্যাম্প—৪৪ ভাগ, তুলা পেষণ—৮৯ ভাগ, মোটর গাড়ীর ব্যাটারি—৪১ ভাগ, ইলেকট্রিক মোটর—৪০ ভাগ, ট্রাকটর—৪৮ ভাগ, ইলেকট্রিক পাখা—৭২ ভাগ, লোহার কাস্টিং—৬৮ ভাগ, বেসিন মিল—৪৬ ভাগ, বাইসাইকেল—৮৬ ভাগ, সালফিউরিক এসিড—৮০ ভাগ, সোডা—৩২ ভাগ, প্রিন্টিং পাইটার—৩৭ ভাগ, পশমী বস্ত্র—৭১ ভাগ, সিমেন্ট—৯৫ ভাগ, চিনি—৭১ ভাগ, কাগজ—২১ ভাগ, উদ্ভিজ্জ ঘৃত—৬৪ ভাগ, দিয়াশলাই—৭২ ভাগ, সাবান—৮৩ ভাগ এবং কাঁচ—৪৭ ভাগ। চরম পর্যায়ের দিনে উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হারের এই ক্ষমতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে চালু শিল্পসমূহের এই দিকটিতেও সরকারকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত এই সব শিল্পের সংস্কার সাধন করিয়া উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।)

ষ্টার্লিং ও টাকার মূল্য হ্রাস

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে হঠাৎ ষ্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি, পোষ্টাফিস, সোনা-রূপার বাজার, সেয়ার বাজার ইত্যাদি তিন দিনের জন্য বন্ধ রহিল বলিয়া ঘোষণা প্রকাশিত হওয়াতে সমগ্র দেশ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে নানা গুজবের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণের মনে এক গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও সংবাদপত্রের আলোচনার ফলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু ষ্টার্লিং এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব পড়িবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিতভাবে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। এরূপভাবে কিছু বলা সম্ভবপরও নহে। ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের ফলে সমগ্র জগতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইল তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে নূতন ও অচিন্তনীয় যে সব সমস্যার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে সম্মিলিত ভাবে সমগ্র জগতের এবং বিশেষ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এখন এই বিষয়ে কোন চেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ষ্টার্লিংয়ের ও সঙ্গে সঙ্গে টাকার মূল্য হ্রাসের প্রকৃত কারণ কি এবং আমাদের দেশে উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডের মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের (যাহা সাধারণতঃ পাউণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে) মূল্য হ্রাসের কথা উল্লেখ করা যা'ক। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুদ্রার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয় নাই। এই মূল্য হ্রাস হইয়াছে আমেরিকার ডলারের হিসাবে। উহা মূলতঃ কোন ব্যাপার নহে। বিগত এবার ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ষ্টার্লিং মুদ্রা বা ষ্টার্লিং নোটের বদলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময় করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির এবং ঐ সময়ে সমগ্র জগতে প্রতিপত্তিশালী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে অসীম মর্য্যাদা ছিল তাহার ফলে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রার উপর সমগ্র জগতের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। উক্ত বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুদ্রারই ষ্টার্লিংয়ের সহিত একটা বিনিময় হারে নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্ত সময়ে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪'৮৬৫ ডলারের সমান ছিল। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাময়িক ভাবে উক্ত দেশ হইতে স্বর্ণমান অর্থাৎ ষ্টার্লিংয়ের বদলে স্বর্ণদানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়া লন। যুদ্ধের পরে বিগত ১৯২৫ সালে উহারা পুনরায় স্বর্ণ মান দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত করেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনীতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়াতে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংয়ের উপরে জগতের বিভিন্ন দেশের আস্থা অনেকটা কমিয়া যায় এবং ইংলণ্ডে উক্ত দেশের ষ্টার্লিং মুদ্রার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পত্তি হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ মজুত ছিল তাহা উহারা তাড়াইয়া ইংলণ্ড হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে ক্রমে ইংলণ্ডের এরূপ অবস্থা ঘটে যে, উহার পক্ষে ষ্টার্লিংয়ের বদলে স্বর্ণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে ১৯৩১ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে অর্থাৎ ষ্টার্লিংয়ের বদলে স্বর্ণ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে ষ্টার্লিংয়ের বদলে স্বর্ণ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি না থাকাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—যাহা ইংলণ্ডের স্বর্ণমান পরিত্যাগের পরে ১৯৩৩ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া তৎপর ১৯৩৪ সালে পুনরায় উহা বলবৎ করে—সেই যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের তুলনায় ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংয়ের মূল্য অনেকটা হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ক্রমাগত ইংলণ্ডের পরাজয়, যুদ্ধের খরচা চালাইবার জন্য ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উহার বিদেশস্থিত সম্পত্তি বিক্রয়, বিদেশে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির ফলে ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং কোন কোন সময়ে উহার মূল্য কমিয়া আমেরিকার মাত্র ২॥ ডলারের সমান দাঁড়ায়। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে একান্ত ভাবে অর্থের হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইউরোপে একমাত্র ইংলণ্ডই উহার সহায়ক ছিল। এরূপ অবস্থায় ডলারের সহিত পাউণ্ডের মূল্যের ক্রত পতনের ফলে উভয় দেশের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিয়া দেওয়া হয় এবং ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড আমেরিকার ৪'০৩ ডলারের সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই সেদিন যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধাবসানের সময়ের অবস্থা। যুদ্ধাবসানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আদান প্রদানের সৌকর্য্যার্থে এবং জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের আওতায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময়ের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) নামে একটী বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক গত ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতে কার্য্যারম্ভ করে। উহার পূর্ব্বেই এই ব্যাঙ্ক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শক্রমে কোন দেশের কি পরিমাণ মুদ্রা আমেরিকার এক ডলারের সমান হইবে তাহা স্থির করিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ডলারের স্বর্ণমূল্যের অর্থাৎ আমেরিকার এক ডলারের বদলে যত স্বর্ণ পাওয়া যাইবে তাহার ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্যও স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থাতে আমেরিকার ডলার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হারও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া যায়। যাহা হউক আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কর্ত্তৃক ডলারের স্বর্ণমূল্য স্থির করিবার পূর্ব্বে আমেরিকার এক আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য ৩৫ ডলার (এক ডলার ০'৮৮৬১১ গ্রেন স্বর্ণের সমান) বলিয়া উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ডলারের এই স্বর্ণমূল্যই বজায় রাখেন। সুতরাং

সঙ্গে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড আমেরিকার ৪০৩ সেণ্ট অর্থাৎ ৪·০৩ ডলার বা ৪ ডলার ৩ সেণ্টের সমান হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পাউণ্ডের স্বর্ণমূল্য নির্দ্ধারিত হয় ৩.৫৮১৩৪ গ্রাম। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৬ পেন্সী ভারতের এক টাকার সমান ছিল। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের ছার পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্যও অপরিবর্ত্তিত রাখেন এবং ভারতের এক টাকা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৩০.২১৩ সেণ্টের (এক ডলার = ৩৩০৮৪২ টাকা) সমান বলিয়া ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টাকার স্বর্ণমূল্য ০·২৪৮৬০১ গ্রামে নির্দ্ধারিত হয়।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার এইভাবে ডলার ও পাউণ্ডের বিনিময় হার এক পাউণ্ড ৪·০৩ ডলারের সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার পর প্রায় তিন বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জগতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে আর একটী বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বর্ত্তমানের দ্বার আসন্ন হইয়া উঠে নাই। তখন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন্দোচীন, শ্যামদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তখন বৃটিশ বাণিজ্য এক প্রকার অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু এখনে আর এক মহাযুদ্ধ আসন্ন এবং এরূপ যুদ্ধে ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে ইংলণ্ডের পক্ষে সাহায্য পাওয়ার আশা কম। বিশেষতঃ চীন প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত সুযোগ সুবিধা এক প্রকার বিলুপ্ত। অথচ ইংলণ্ডের পক্ষে আর একটী মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় এবং ইংলণ্ড এত দিন যে প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহা রাতারাতি কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই সব কারণে গত তিন বৎসর কালের মধ্যে ইংলণ্ডের অর্থনীতিক অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। এদিকে ইংলণ্ডের যুদ্ধোদ্যম ও জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য ডলার এবং ডলার জাতীয় মুদ্রার দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ পণ্যসম্ভার আমদানী করা অত্যাবশ্যক হইলেও ইংলণ্ড ডলার ও তজ্জাতীয় দেশগুলিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মালপত্র রপ্তানী করিয়া উহার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ ডলার অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না। অথচ আশানী যুদ্ধে ইংলণ্ডই আমেরিকার বড় সহায়। কাজেই ইংলণ্ড যাহাতে ডলারের অভাবে সাময়িক দিক হইতে দুর্ব্বল না হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রার মান খর্ব্ব হওয়ার দরুণ ইংলণ্ডে যাহাতে কোন আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা না দেয় তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য। এজন্য ইংলণ্ডের ডলারের অভাব দূরীকরণের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯৪৯ সালে উহাকে ৩০০ কোটী ডলারেরও বেশী ঋণদান করে। উহাতে ইংলণ্ডের অভাব দূরীভূত না হওয়াতে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ডলার সাহায্য বন্ধ করে। উহার মোট পরিমাণ ৫০০ কোটী ডলারেরও বেশী এবং উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইংলণ্ড পাইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড উহার পণ্যদ্রব্য রপ্তানী এবং অন্যবিধ বহু উপায়ে যত ডলার উপার্জ্জন করে ডলারের হিসাবে উহার যা ক্রয়াগত তাহা অপেক্ষা বেশী হওয়ার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পুনঃ পুনঃ সাহায্য সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ডলারের অভাব বিদূরিত হইতেছে না। উক্ত অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—যদিও ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য ডলারের অনুপাতে হ্রাস করা হইলে যুক্তরাষ্ট্রেরই ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক তথাপি উহা ইংলণ্ডকে উহার পাউণ্ডের মূল্য ডলারের হিসাবে হ্রাস করিবার জন্য কিছুদিন যাবৎ চাপ দিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের অন্যতম অর্থনীতিক পত্র 'ইকনমিষ্ট' এবং ব্যাঙ্কার্স অর্থনীতিবিদ স্যার ওয়াল্টার লেটন প্রভৃতি বহু ব্যক্তিও ইংলণ্ডের ডলারের অভাব দূরীকরণার্থে উহার পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিবার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। উহারা হিসাব করিয়া এরূপও দেখান যে, ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য বেশী থাকার দরুণ ইংলণ্ড সব চেয়ে বড় সরঞ্জাম ট্রাক্টর প্রভৃতি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের সমমূল্যের ডলার ও স্বর্ণ হারাইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অর্থসচিব স্যার ষ্টেফোর্ড ক্রিপস বরাবর এই প্রস্তাবে বাধা দেন। এমন কি ইংলণ্ড যদি উহার ট্রাক্টরের মূল্য হ্রাস করে তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন এরূপ পর্য্যন্ত আভাষ দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দিক হইতে দিন দিন অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। অবশেষে এই অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংলণ্ড প্রভৃতি কতিপয় দেশের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের প্রতিনিধিও যোগদান করেন। উক্ত বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ইংলণ্ডের অর্থসচিব গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। পূর্ব্বে যে স্থলে ডলারের সহিত ইংলণ্ডের প্রতি পাউণ্ডের বিনিময় হার ছিল ৪·০৩ ডলার এক্ষণে এই হার দাঁড়াইল ২৮০ ডলার। অর্থাৎ ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হইল শতকরা ৩০·৫২ ভাগ।

ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের এইভাবে মূল্য হ্রাসের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ডলারের অভাবের জন্য ইংলণ্ডের যে বিপদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীভূত করা। ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের মূল্য যখন ৪·০৩ ডলার অর্থাৎ ৪০৩ সেণ্ট ছিল সেই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ইংলণ্ড হইতে এক পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতে তাহার বদলে ইংলণ্ডকে উহার ৪০৩ সেণ্ট মূল্যের মালপত্র দিতে হইত। এক্ষণে এক পাউণ্ড ২৮০ সেণ্টের সমান বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে আমেরিকাকে ইংলণ্ড হইতে ১ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতে তাহাকে আমেরিকার ২৮০ সেণ্ট মূল্যের মাল দিলেই চলিবে। পক্ষান্তরে পাউণ্ডের মূল্য যখন ৪·০৩ সেণ্ট ছিল সেই সময়ে ইংলণ্ডকে আমেরিকা হইতে ৪০৩ সেণ্ট মূল্যের মাল ক্রয় করিতে এক পাউণ্ড মূল্যের মাল দিতে হইত। এক্ষণে ইংলণ্ডকে আমেরিকা হইতে ২৮০ সেণ্টের মাল ক্রয় করিতেই এক পাউণ্ড মূল্যের মাল দিতে হইবে। অর্থাৎ ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ফলে মূলতঃ এই দাঁড়াইল যে, আমেরিকাতে বৃটিশ মালপত্র অনেক সস্তা হইল এবং ইংলণ্ডে আমেরিকার মালপত্রের মূল্য অনেক চড়িয়া গেল। উহার ফলে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় মালপত্রের রপ্তানী অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে মালপত্র রপ্তানী হ্রাস পাইবে। এরূপ ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে আমেরিকার

বাণিজ্য বহাল হইয়া উঠার ফলে উক্ত দেশ হইতে ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে আমদানী করিবে বলিয়া ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের খরচ হ্রাস পাইবে। ফলে বর্তমানে ইংলণ্ডের ডলারের যে দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বিদূরিত হইবে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞগণ নূতন ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডের কত ডলার লাভ হইবে তাহা লইয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস একটা অমিশ্র সুবিধা নহে। উহা দু'মুখো ছুরির ন্যায় দু'ধারে কাটিয়া থাকে। উহার ফলে ডলার উপার্জনের দিক হইতে ইংলণ্ডের যে সুবিধা হইবে অন্য দিক দিয়া অসুবিধাও হইবে বিস্তর। কারণ একই পরিমাণ ডলার উপার্জন করিতে ইংলণ্ডকে এক্ষণে অনেক বেশী মাল রপ্তানী করিতে হইবে। কাজেই নূতন ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ড উহার ডলার সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে কতটা অগ্রসর হইতে পারিবে তাহা অমিশ্চিত। এই ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের পক্ষে অবশ্যকারী মুক্তবাজারে অধিকতর পরিমাণে রপ্তানী, ঋণ ইত্যাদি কতিপয় পরাধীনতা বিলুপ্ত করা সম্ভবপর হইবে বটে। কিন্তু ইংলণ্ডকে উহার কটীর জন্য কানাডা যেমনই গম ও ময়দার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়, পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ফলে কানাডা হইতে ইংলণ্ডকে গম ও ময়দা ক্রয় করিতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী খরচ করিতে হইবে। তবে ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কানাডাও উহার ডলারের মূল্য আমেরিকার ডলারের হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করিয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডে গম ও রুটীর মূল্য যতটা চড়িবার আশঙ্কা ছিল উহা ততটা চড়িবে না তাহা বলা যাইতেছে। উহা ইংলণ্ডের পক্ষে একটা আশার কথা। ইংলণ্ড আরও আশা করিতেছে যে, অদূরভবিষ্যতে কানাডা উহার গম ও ময়দার মূল্য হ্রাস করিবে বা করিতে বাধ্য হইবে। (কারণ পাউণ্ড-ডলার সমতা বজায় রাখিবার জন্য ডলার আয় হইতে বাজারে অধিকতর ডলার ছাড়িয়া দেওয়া হইলে ঐ অবস্থায় রপ্তানীর মূল্য আপনা হইতেই হ্রাস পাইবে।) এইদিক বিবেচনা করিলে রুটীর মূল্যের দিক হইতে ইংলণ্ড যে অসুবিধায় পড়িয়াছে খানিকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক ইংলণ্ডে খাদ্যের মূল্য যেরূপ উল্লেখযোগ্যভাবে না চড়িলেও পূর্বের ন্যায় এখনও ইংলণ্ডকে ডলার অর্জন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উহার শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী করিতে হইবে। এইসব কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি হেতু উক্ত দেশে শিল্প দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া গিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুফল অনেকটা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে এই ভাবে উহার মুদ্রা টার্লিংয়ের মূল্য প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া যে একটা জুয়াখেলার মত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার ফলে ইংলণ্ড উহার সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে—পক্ষান্তরে এরূপ উহা বিশেষভাবে বিপন্নও হইতে পারে।

উপরে বলিয়াছি যে, ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উহার হিসাবে টাকার মূল্যও সমপরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য পূর্বের মত ১ শিলিং ৬ পেন্সী হিসাবেই বজায় রহিয়াছে। এক্ষণে ডলারের হিসাবে ভারতীয় এক টাকার মূল্য দাঁড়াইল পূর্বেকার ০·২১৫ সেন্টের পরিবর্তে ৩১ সেন্ট, পূর্বেকার প্রতি ০·০৩৮৪২ টাকার পরিবর্তে প্রতি ৪·১৭৬১৯০ টাকা এক ডলারে

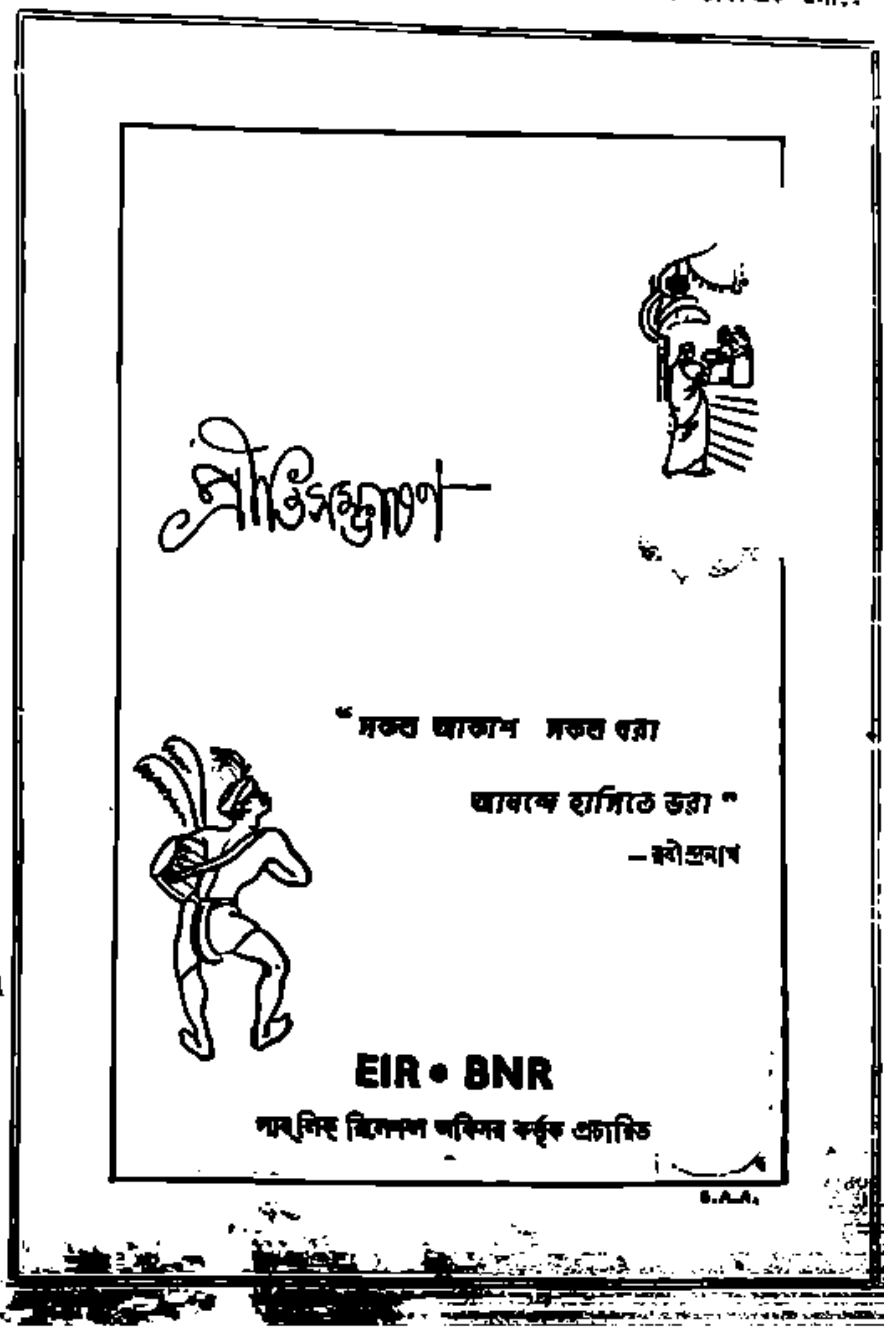

সমান হইল, ভারতীয় টাকার স্বর্ণমূল্য দাঁড়াইল পূর্বেকার ০·২৬৬৬৬৭ গ্রামের পরিবর্তে ০·১৮৬৬৭ গ্রাম এবং ভারতীয় টাকার হিসাবে প্রতি ট্রয় আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য দাঁড়াইল ১১৪·৭৯ টাকার পরিবর্তে ১৬৯·৬৬৬৬ টাকা।

এখন ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও কেন ডলারের হিসাবে উহার টাকার মূল্য হ্রাস করিল এবং ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উহার কিরূপ প্রভাব পড়িবে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। এদেশে যে সমস্ত রাজনীতিক কংগ্রেস এবং দেশের কংগ্রেসী সরকারকে সুনজরে দেখেন না এবং যাঁহারা প্রত্যেক ব্যাপারেই ভারতে ইংরাজ প্রভুত্বের ছায়া দেখেন তাঁহারা ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারত কর্তৃক উহার টাকার মূল্য হ্রাসকে বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সহযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। উহাদের এই উক্তি ভ্রান্তিমূলক। ইংলণ্ড কর্তৃক ডলারের হিসাবে উহার পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইসরাইল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, জাপান, গ্রীস, হল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, পর্তুগাল, ইরাক প্রভৃতি বহু দেশ ডলারের হিসাবে উহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং আরও বহু দেশ এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছে। এই সব দেশের সবগুলিই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন একথা উহাদের কোন পক্ষও বলিতে পারে না। ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের কোন সন্ধীতির তুলনা নাই। কিন্তু আয়র্লণ্ডও ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ডলারের হিসাবে উহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছে। আসল কথা হইতেছে যে, ইংলণ্ডের সহিত এই সব দেশের বাণিজ্য তথা অর্থনীতিক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, ইংলণ্ডের তুলনায় উহাদের মুদ্রার মূল্য অধিক রাখা কিছুতেই উহাদের স্বার্থের পরিপোষক নহে। ভারতও এই জন্যই উহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছে। উহা ইংলণ্ডের কোন রাজনীতিক চাপের জন্য উহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে নাই। ভারতবর্ষ বর্তমানে বিদেশে যে বাণিজ্য বিক্রয় করে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই ষ্টার্লিং অঞ্চলে কাটতি হইয়া থাকে। ভারত যদি ডলারের হিসাবে উহার টাকার মূল্য অপরিবর্তিত রাখিত তাহা হইলে ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের জন্য ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য আরও বেশী হইত। সেজন্য ষ্টার্লিং অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য চড়িয়া যাওয়াতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইত। আর একটী চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে ইংলণ্ডে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে গচ্ছিত স্বর্ণ সম্পর্কে। ভারত যদি ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে উহার টাকার মূল্য বেশী রাখে তাহা হইলে ভারত এখনে প্রতি ষ্টার্লিংয়ের জন্য যে স্থলে এক টাকা লোকা পাঁচ আনার বদ্ধ পাইতেছে সেই স্থলে প্রতি ষ্টার্লিংয়ের বদলে ১৷৵০ আনার বেশী পাইবে না। উহার ফলে ভারতের পাওনা ৯০০ কোটী টাকার মধ্যে এক তৃতিতে ৬০০ কোটী টাকা উড়িয়া যাইবে। ভারত সরকার এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়াই যে পাউণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে এবং উহার সমান হারে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ হইতে একটী বিবৃতিতে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "ভারতের ডলারের যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূরণের জন্য ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাসের জন্য অনেকেই চাপ দিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থাতে টাকার মূল্য হ্রাস করা ভারত সরকার সমীচীন মনে করেন নাই। কেননা ভারত সরকার অনেকদিন হইতেই উহার আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় ডলারের ঘাটতি পূরণের জন্য টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দেশে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করা কখনও সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ড কর্তৃক উহার ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্য হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশ কর্তৃক উহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর ভারতের পক্ষে উহার টাকার মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য পন্থা ছিল না। এই ভাবে টাকার মূল্য হ্রাস না করিলে ভারতের সমূহ ক্ষতির কারণ হইত। ভারতের আমদানী ও রপ্তানী এই উভয়বিধ বাণিজ্যেরই অধিকাংশ ষ্টার্লিং অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এমনিই খুব বেশী। ইহার উপর ভারতীয় টাকার মূল্য ষ্টার্লিং এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলীয় অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় বেশী হারে বজায় রাখিলে ঐ সব অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িয়া যাইত। উহাতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইত এবং উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় ভারতকে উহার আমদানীর পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইত। তাহাতে আমদানীকারী অন্যান্য দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ভারত সরকার বিশেষরূপ চিন্তাভাবনা করিয়াই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।" ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগের এই মন্তব্যের পর এই সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্তধারণা বিদূরিত হইবে আশা করা যায়।

এখন টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব পড়িতে পারে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের যে অনেক দিকে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় ডলার এবং ডলারের সহিত সম্বুক্ত দেশগুলি হইতে ভারতে আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগের মত চড়িয়া যাইবে। ভারত প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে ৪ শত কোটী টাকার মত বাণিজ্য আমদানী করে তাহার এক-চতুর্থাংশ ডলার অঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ভারতে এই শ্রেণীর মালের মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভারতের অভ্যন্তরে উৎপন্ন সমশ্রেণীর ভারতীয় পণ্যের মূল্য চড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে যে সমস্ত জিনিষ আসে তাহার মধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানীই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গত সরকারী বৎসরে ভারত সরকার ডলার অঞ্চল হইতে বহু কোটী টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াছেন। ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস হেতু এই খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ চড়িয়া যাইতে পারে। তবে কানাডা কর্তৃক উহার ডলারের মূল্য হ্রাস হেতু ঐ দেশ হইতে আমদানী খাদ্যশস্যের মূল্য তত অধিক চড়িবে না বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহারা চলতি বৎসরে ডলার অঞ্চল হইতে কোন খাদ্যশস্য আমদানী করিবেন না। ভারত সরকার আশা করেন যে, ডলার অঞ্চল হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী হ্রাস পাওয়ার ফলে ডলার অঞ্চলসমূহ উহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এবং উহার ফলে ভারতবর্ষ কিছুদিন পরে বেশী কিছু অতিরিক্ত

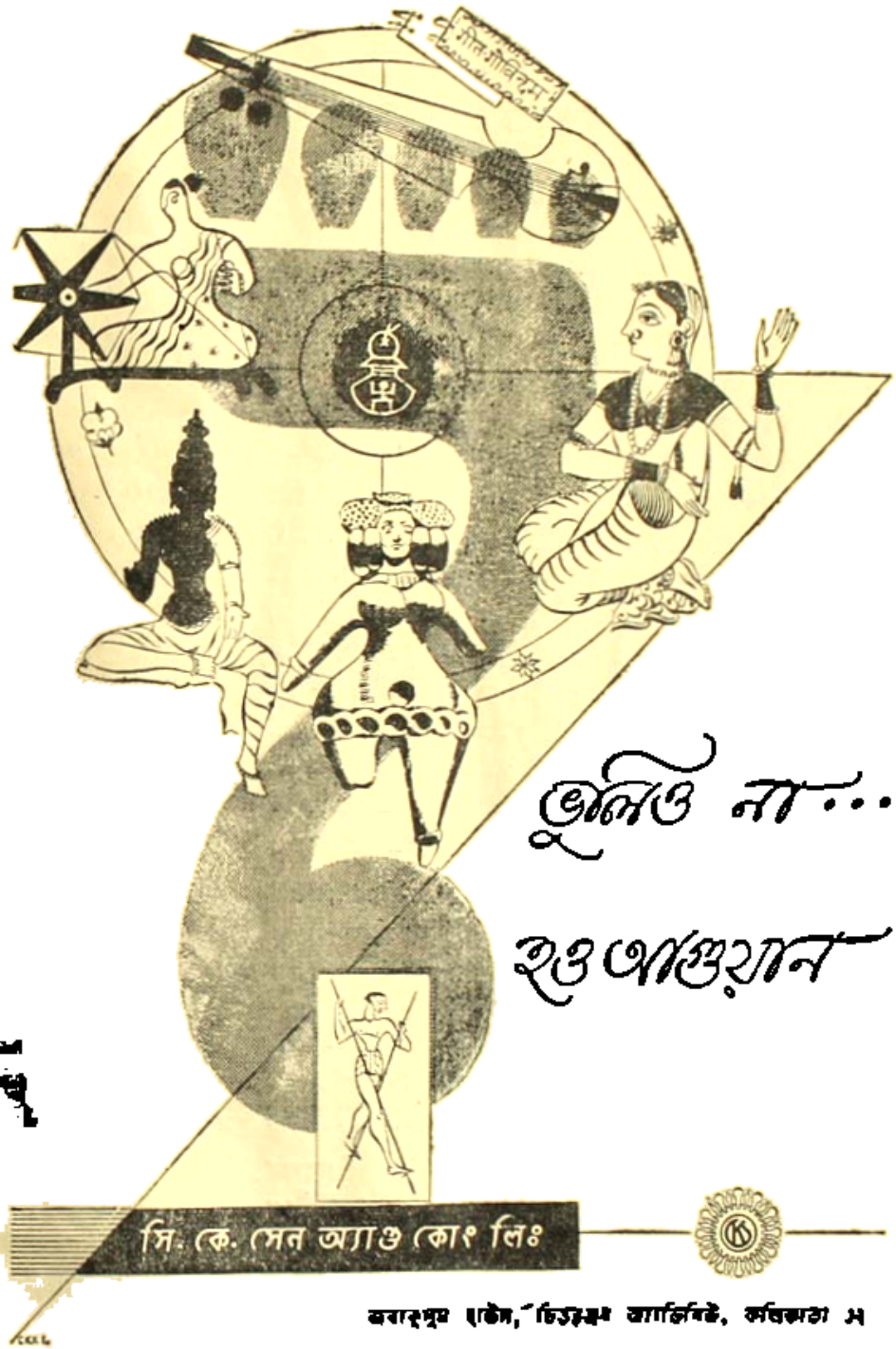
ভুলিও না...
হও আগুয়ান
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

মূল্য না দিয়াও ডলার অঞ্চল হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানী করিতে পারিবে। ডলার অঞ্চল হইতে অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আমদানী সম্বন্ধে ভারত সরকার ইতিপূর্বেই উদারনীতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডলার অঞ্চলে ভারতের পক্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অধিকতর চড়িয়া যাওয়াতে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা ডলার অঞ্চল হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ আরও কমাইয়া দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে ক্রয় করিবেন। এই ক্ষেত্রেও সরকারের আশা করেন যে, কিছুদিন পরে ডলার অঞ্চলের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। কেননা ডলার অঞ্চল সমূহ উহাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল বিস্তর পরিমাণে ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে ক্রয় করিয়া থাকে এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস হেতু এক্ষণে ডলার দেশগুলি উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পূর্বের তুলনায় অনেক সস্তায় ক্রয় করিতে পারিবে। উহার ফলে ডলার অঞ্চলে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা হ্রাস পাইবে। ভারত সরকারের এই সব আশা কতটা ফলবতী হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে আমেরিকা হইতে এই ধরণের আশাব্যঞ্জক সংবাদের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক একটা ভরসার কথা এই যে, একমাত্র খাদ্যশস্য ছাড়া ভারতের জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় এমন কোন জিনিষ ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে আমদানী হয় না যাহা ভারত উহার নিজ মূল্য এবং ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিতে না পারে। কাজেই ডলার অঞ্চলের পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য—এবং বিশেষভাবে ঐ অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য আমদানী সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপরোক্ত নীতির ফলে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার তেমন কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও এই বিষয়টীর উপর জোর দিয়াছেন। তবে ভারতবর্ষকে এখনও ডলার অঞ্চল হইতে উহার প্রয়োজনীয় তুলা, চা, রবিনের কাঠ, জাহাজের কাঠ, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কলকব্জা, অতিপ্রয় ধাতুদ্রব্য, এরোপ্লেনের সরঞ্জাম, মোটর ট্রাক, মোটরের বেয়ারিং সরঞ্জাম, ট্রাক্টরের সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রোলিং শাটারস, রেলের ইঞ্জিন, ট্রাক্টর ইত্যাদি কতিপয় শ্রেণীর জিনিষ আমদানী করিতে হইবে এবং তাহার জন্য বেশী মূল্য দিতে হইবে। উহার কোন প্রতিকার নাই। টাকার হিসাবে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘে ভারতবর্ষকে ডলারের হিসাবে যে টাকা দিতে হয় টাকার হিসাবে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহার সুদ ও আসল টাকার অঙ্কও উহাকে বেশী পরিমাণ টাকা দিতে হইবে। তবে ভারতের এই ধরণের আসল টাকা পরিশোধের অনেক দেরী আছে। সেই সময়ের মধ্যে ডলার ও টাকার বিনিময় হার কি হইবে তাহা এখন বলা যায় না। হয়ত সেই সময়ে ডলারের হিসাবে টাকার এত মূল্য হ্রাস করার প্রয়োজন হইবে না। টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে ভারতের আরও একটা দিক হইতে ক্ষতি হইতে পারে। ইংলণ্ডে ভারতের যে ষ্টার্লিং রহিয়াছে ভারত তাহার একটা অংশ ডলারে রূপান্তরিত করিয়া তদ্দ্বারা ডলার অঞ্চল হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। এক্ষণে টাকার মূল্য হ্রাস হেতু ভারত এই ডলারের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মাল পাইবে। ডলারের হিসাবে পাটজাত মূল্য হ্রাস হেতু ইংলণ্ডে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের খরচা বাড়িয়া যাইতে পারে। ডলার অঞ্চলে ইংলণ্ডের রপ্তানীর বৃদ্ধি হেতু ভারতের পক্ষে ইংলণ্ড হইতে মালপত্র আমদানীরও অসুবিধা হইতে পারে এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী পণ্য দ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারে। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি যে, টাকার মূল্য হ্রাস না করিলে অন্য দিকে ভারতের ক্ষতি উহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইত। কাজেই টাকার মূল্য হ্রাস ভারতের পক্ষে যে মঙ্গলের কাজ হইয়াছে—উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারত সরকারও এইরূপ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ইংলণ্ডের অনুকরণে টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন—বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বোটের উপর ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস ভারতের পক্ষে নিছক ক্ষতিকর হইয়াছে—তাহা বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। ডলারের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস হেতু ডলার অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানী যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চা, ব্যাঙ্কাষিক, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদির ব্যাপারে উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে পাটজাত দ্রব্য সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস হেতু আমেরিকা ও অন্যান্য ডলার অঞ্চলে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে ঐ সব দেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য অনেক বেশী পরিমাণ রপ্তানী হইবে—উহাই সকলে আশা করিতেছিল। কিন্তু পাকিস্থান উহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্থান ডলারের হিসাবে উহার টাকার মূল্য হ্রাস করিবে না স্থির করিয়াছে। উহার ফলে পূর্বে যে স্থলে পাকিস্থানের ১০০ টাকা ভারতের ১০০ টাকার সমান ছিল এক্ষণে তৎস্থলে পাকিস্থানের ১০০ টাকা ভারতের ১৩৩ টাকার এবং ভারতের ১০০ টাকা পাকিস্থানের ৭৫।০ আনার সমান হইবে। এরূপ অবস্থায় ভারতের বাজারে পাকিস্থানের সমস্ত জিনিষের মূল্য শতকরা ৩৩ ভাগ চড়িয়া যাইবে। পূর্বে ভারত পাকিস্থানকে ১০০ টাকা দিয়া যে পরিমাণ পাট পাইত এক্ষণে সেই পরিমাণ পাট পাইতে ভারতকে ১৩৩ টাকা দিতে হইবে। তুলা, বাহ্য, ডিম, তামাক, চামড়া, সৈন্ধব লবণ, ওষধিতরুকাণ্ড, বাঁশ, নরম কাঠ, সুপারি ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পাকিস্থানের এই সিদ্ধান্ত ভারতে, বিশেষতঃ পাট ব্যবসায়ী ও চটকল মহলে এক গভীরতর পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে।

পাকিস্থান কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত পাকিস্থানের পক্ষে কতটা কল্যাণপ্রসূ হইবে তৎসম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা আমার ইচ্ছা নহে। পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, গত জুন পর্যন্ত এক বৎসরে ভারত দ্বারা অন্যান্য বিদেশের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের ৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইলেও এই বৎসরে ভারতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের ২৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত কথার অর্থ এই যে, আলোচ্য বৎসরে পাকিস্থান ভারত হইতে যত টাকার মালপত্র ক্রয় করিয়াছে তাহা অপেক্ষা ২৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার বেশী মাল-

পত্র পাকিস্থান ভারতে বিক্রয় করিয়াছে। উহা হইতে ভারতের মুদ্রার পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মুদ্রামূল্য হ্রাস করিলে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় এবং বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই দিক হইতে ভারতে রপ্তানী বৃদ্ধির সৌকর্য্যার্থে পাকিস্থানের উচিত ছিল ভারতের সমান হারে উহার মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দেওয়া। কিন্তু পাকিস্থান বোধ হয় মনে করিয়াছে যে, ভারতের টাকার তুলনায় পাকিস্থানের টাকার মূল্য বেশী থাকার ফলে যদিও ভারতে পাকিস্থানের পাট, তুলা প্রভৃতির মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে—তথাপি ভারত পাটের ও তুলার ব্যাপারে অনন্যোপায় বিধায় ভারতকে এই বর্দ্ধিত মূল্য দিয়াই পাকিস্থানের পাট ও তুলা ক্রয় করিতে হইবে। কাজেই এই দিক দিয়া পাকিস্থানের কোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে পাকিস্থান পূর্ব্বে ভারতকে ১০০ টাকা দিয়া যে মালপত্র ক্রয় করিত এক্ষণে পাকিস্থানের টাকার মূল্য ভারতের টাকার অপেক্ষা বেশী হওয়ার ফলে সেই মাল উহা ৮৯৷৷০ আনা দিয়া ক্রয় করিতে পারিবে। অর্থাৎ পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য ভারতের টাকার তুলনায় বেশী হারে বাড়াইয়া 'এক ঢিলে দুই পাখী' [illegible] করিয়াছে। উহা হইতেছে ভারতে [illegible] ৪৪ ভাগ চড়া দরে পাট, তুলা [illegible] ইত্যাদি বিক্রয় করা এবং ভারতের বাজার [illegible] শতকরা ৩০৷৷ টাকা কম দরে কাগজ, [illegible] ইস্পাত, কাগজ, চিনি ইত্যাদি জিনিষ আমদানী করা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পাকিস্থানের এই [illegible] কতটা সফল হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। পাকিস্থানের পাটের দর চড়িয়া যাওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই ভারতে [illegible] কলগুলির তাঁত এক্ষণটের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। পাকিস্থানের টাকা [illegible] পাকিস্থান সরকারের আলোচ্য সিদ্ধান্তের ফলে ভারতকে পাট চটকলগুলির কাজ [illegible] সাময়িক ভাবেই বন্ধ করিয়া দিতে হইলে তাহা হইলে ভারতে পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবে। এদিকে পাকিস্থানের তুলা ও চামের ন্যায় পাকিস্থান বিদেশে যে পাট রপ্তানী করে তাহারই অধিকাংশই টাদিা অঞ্চলের দেশগুলিতে রপ্তানী হয়। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই উহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করাতে উহাদের তুলনায় পাকিস্থানের টাকার মূল্য বেশী দাঁড়াইয়াছে। ফলে ঐ সব দেশেও পাকিস্থানের তুলা, চা ও পাটের মূল্য চড়িয়া যাইবে। এজন্য পাকিস্থান ভারতে যে পাট বিক্রয় করে তাহা জাপানের অন্যান্য দেশে বিক্রয় করাও উহার পক্ষে কঠিন হইবে। উহার ফলে ভারত শেষ পর্য্যন্ত আরও সস্তা মূল্যে পাট পাইতে পারিবে। পাকিস্থানের তুলার অধিকাংশের ক্রেতা ভারত। কিন্তু এই তুলার মূল্য বৃদ্ধি যেহু এক্ষণে ভারত পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে অধিকতর পরিমাণে তুলা ক্রয় করিবে। মোটের উপর পাকিস্থানের আলোচ্য ব্যবস্থাতে উহার পাট, চা ও তুলা এই দ্রব্যেরই বাজার নাটী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। পাকিস্থান যে উহার মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি করিয়া ভারত হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে উহার প্রয়োজনীয় কাপড়, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনাও কম। কেননা মুদ্রা সম্পর্কে পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী বনস্পতি, ঘাসা, ইস্পাত, তামাক, সরিষার তৈল, লোহার পাত ইত্যাদির উপর রপ্তানী শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সরবরাহের বাধকতে ছাড়া আর কোনভাবে ভারত হইতে বাহিরে কয়লা রপ্তানী হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ দিয়াছেন। পাকিস্থানের সহিত ভারতের কিছুদিন পূর্ব্বে যে বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহার প্রথম সর্ত্তই ছিল যে, ভারত ও পাকিস্থানের টাকার মূল্যে কোন তারতম্য থাকিবে না। কিন্তু এক্ষণে এই সর্ত্ত বাতিল হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় সমগ্র ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তিই হয়ত বাতিল হইয়া যাইবে। উহার ফলে—পাকিস্থান উহার মুদ্রার মূল্য চড়া রাখিয়া ভারত হইতে আমদানী দ্রব্যের ব্যাপারে যে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিতেছে সেইরূপ সুবিধা উহা মোটেই কিছুই পাইবে না। পাকিস্থানের উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে আপাততঃ ভারত হইতে যাহারা পাকিস্থানে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনের জন্য টাকা পাঠাইবে তাহাদেরও ক্ষতি হইবে। কারণ এযাবৎ হইতে ১০০৲ টাকা ধনিঅর্ডার করিলে পাকিস্থানে ৬৯৷৷০ আনা ডেলিভারি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ পাকিস্থানী মুসলমান যাহারা ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি নানা কাজে লিপ্ত আছে এবং যাহারা নিয়মিত প্রতিমাসে পাকিস্থানস্থিত আত্মীয়-স্বজনের জন্য টাকা পাঠাইতে হয় তাহাদের ক্ষতিই হইবে বেশী। কারণ ভারত হইতে যত হিন্দু পাকিস্থানে টাকা পাঠায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক মুসলমান ভারত হইতে পাকিস্থানে টাকা পাঠাইয়া থাকে। পাকিস্থানের মুদ্রার উক্ত মূল্য বজায় রাখার জন্য উহার আর একটা বড় ক্ষতি হইবে ইংলণ্ডে উহার সঞ্চিত

জীবন, অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি
যাবতীয় বীমার জন্য
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
স্থাপিত—১৯১৩
হেড অফিস—বোম্বাই
চীফ এজেন্টস:
ঘোষ এণ্ড চৌধুরী
১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা—১

ষ্টার্লিংয়ের পরিবর্তে হ্রাস পায়। সম্প্রতি এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাকিস্থানের মন্ত্রী ষ্টার্লিংয়ের পরিবর্তে প্রতি পাউণ্ড ১৩৲০ আনার স্থলে ধরিয়া ২১০৲ কোটী টাকার ঋণ। কিন্তু এক্ষণে পাকিস্থান ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড পাকিস্থানের ৯'৭৬ টাকার অর্থাৎ ৯৷৷ পাইয়ের (পাকিস্থানের এক টাকা ইংলণ্ডের ২০ শিলিং ৩ পেন্স) সমান হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। উহার ফলে পাকিস্থানের পাওনা ২১০ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে ৩০ আনার মত হ্রাস পাইবে। অনেকে বলিতেছেন যে, পাকিস্থানের টাকার উচ্চ মূল্যের জন্য পাকিস্থান হইতে ভারতে অনেক মূলধন স্থানান্তরিত হইবে। কারণ পাকিস্থান হইতে ১০০ টাকা পাঠাইলেই ভারতে তদ্দ্বারা ১৪৩ টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহারা পাকিস্থানের টাকা ভাঙ্গাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিবেন না। কাজেই পাকিস্থান হইতে ভারতে মূলধন স্থানান্তরিত হওয়া আপাততঃ অনিশ্চিত—যদিও গোপনে অনেক টাকা স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

যাহা হউক আমাদের ধারণা এই যে, পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের ফলে উহার বহির্বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থার অবসান ঘটিয়া উহার অবস্থা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে এবং কিছুদিন পরে পাকিস্থানকে বাধ্য হইয়া ভারতের টাকার সম পরিমাণে উহার টাকার মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। ভারতের শ্বেতপত্রে অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত সুব্বেরাও এবং আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক ভারতের সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে একটা এই সুফলের আশা করা যায় যে, ডলার অঞ্চলে ভারতের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু এবং ভারতের বাজারে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানী বাণিজ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই সব দ্রব্যের সহিত ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে এবং ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যেই দেশের বাজারে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি হইতে এই বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে। যদি এই ধারণা সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতে যাহাদের হাতে মূলধন রহিয়াছে তাহারা উহা দেশের শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতে লাগিবে। উহার ফলে দেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের লোকের কর্ম-সংস্থানের পথও সুগম হইতে পারে। বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতের এক্ষণে বৎসরে ২০০ কোটী টাকার মত ঘাটতি হইতেছে। অর্থাৎ এক্ষণে ভারত বিদেশে যত টাকার মালপত্র পাঠাইতেছে তাহার তুলনায় বিদেশ হইতে ২০০ কোটী টাকার অধিক মূল্যের মালপত্র আমদানী করিতেছে। ভারত টাকার মূল্য হ্রাস করার ফলে ডলার অঞ্চলে তো ঘটেই—পাকিস্থানেও (যেহেতু পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য ভারতীয় টাকার তুলনায় উচ্চ হারে বজায় রাখিয়াছে) ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অবস্থায় টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে না হউক আংশিকভাবে নিবারিত হইবে উহা খুবই আশা করা যাইতেছে। পাউণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে টাকার মূল্য হ্রাস হেতু ইংলণ্ডে ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিংয়ের যে কোন ঘাটতি হইবে না তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ষ্টার্লিং ও পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে আমাদের উহাই মোটামুটি বক্তব্য। এই সম্পর্কে আনুষঙ্গিক আর ২।১টী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। মুদ্রামূল্য হ্রাসের কথা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে স্বর্ণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য পূর্ব্বাহ্নে (এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ৩৪ ডলার) বজায় থাকায় এবং পাউণ্ড ও টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাওয়াতে ইংলণ্ড ও ভারতে সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডে প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১৭৲ শিলিং ৩ পেন্স হইতে ২৪৮ শিলিংয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভারতের টাকার হিসাবে প্রতি আউন্স (১৮ ভরি) স্বর্ণের মূল্য ১১৫ ৭৯ টাকা হইতে ১৬৬'৬৬ টাকায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে ভারতের বাজারে স্বর্ণের মূল্য বর্ত্তমানের বর্দ্ধিত মূল্য অপেক্ষাও বিশুণ ছিল। এরূপ অবস্থায় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের বাজারে স্বর্ণের মূল্য আর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন যুক্তি নাই। জাটকাওয়ালারাই কারসাজি করিয়া বর্ত্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে। এই মূল্য বজায় থাকা কঠিন। আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমান হিসাবে স্বর্ণের মূল্য স্থায়ীভাবে বিশেষ কিছু বর্দ্ধিত হইবে না।

টাকার মূল্য হ্রাসের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানীকৃত সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্থান হইতে আগত পাট প্রভৃতি অনেক জিনিষের মূল্যই চড়িয়া যাইবে। মোটের উপর মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ যখন হইতে ঘোষণা করা হইলেও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় যে কিছুটা বাড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে ইতিপূর্ব্বেই জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ, মজুর শ্রেণী, ভূমিহীন কৃষক ইত্যাদি ধরাশায়ী হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার পর মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে এই ব্যয় যদি স্থায়ীভাবে আরও চড়িয়া যায় তাহা হইলে দেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটিবে। এজন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অবহিত হইতে এবং প্রয়োজন হইলে লোভপরবশ ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণকে কঠোরভাবে দমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই ব্যাপারে এখন উপেক্ষা করিলে দেশের সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত করা হইবে।

এসিটোন মূলধেরসা, অম্ল, অম্লীর্ণ, গলা বুক জ্বালা ও শুষ্টিকার অব্যর্থ মহৌষধ।
ক্রাউন কেমিকেল ওয়ার্কস্
৫৪।১।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯
সোল এজেন্ট—
এম, আর, সি, এল এজেন্সী
কলিকাতা।

ভারতের অঙ্গার সম্পদ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এস্-সি

— কয়লা ও লোহা এ-দু'টী খনিজ পদার্থ জাতির যে কতখানি হিতসাধন করে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য হলো জাতির উন্নতির দোপানি বিশেষ। কয়লা ও লোহাকে অবলম্বন করে যত রকমের কত ব্যবসা যে গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তাই নেই। যন্ত্রপাতি তৈরী, জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী ও এয়ারোপ্লেন নির্ম্মাণ শিল্প এবং এই ধরণের কত যত বড় নির্ম্মাণের ব্যবসা রেখে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লোহার খনি না থাকলে গড়ে উঠতে পারে না। পাশ্চাত্যের নিউকাসল্, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি অঞ্চলের কয়লার খনিগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে যত বড় বড় কলকারখানা। ভারতবর্ষেও প্রচুর লোহা ও কয়লার খনি আছে। কাজেই, এখানেও বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে। টাটার ইস্পাতের কারখানাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

খনিজ লোহার বিভিন্ন পরিমাণে কার্ব্বোন্ (carbon) মিশিয়ে ঢালাইয়ের লোহা (cast iron or pig iron), পেটা লোহা (wrought iron), নরম লোহা (mild steel), ইস্পাত (steel) প্রভৃতি তৈরী হয়। কার্ব্বোন্ পাওয়া যায় কয়লা থেকে। কয়লা ব্যতীত লোহার স্মেল্টিং (smelting) হয় না। সুতরাং যেখানে লোহার খনি থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে কয়লার খনি থাকলে তবেই দেশে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের বড় বড় কল-কারখানার সমূহ হয়ে উঠতে পারে।

পেট্রোল ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জ্বালের ব্যাপারে ভারতবর্ষ খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী হলেও ভারতে প্রচুর কয়লার খনি আছে এবং তা থেকে প্রচুর পেট্রোল ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জ্বালের তেল পাওয়া যেতে পারে। তাই গত বছর জুলাই মাসে ভারত সরকার পার্লামেণ্ট করার সঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের রেসাল কুপার্স কোম্পানীর প্রতি-নিধিদলকে আমন্ত্রণ করে আনান। এঁরা গত বছরে এ দেশের জ্বালানী সমস্যার মধ্যে এঁদের কার্য্যসূচী ভারত সরকারের কাছে পেশ করবেন বলে স্থির করেন। এঁরা বলেন ভারতে কয়লা থেকে বছরে ১০ লক্ষ টন পেট্রোল ও ডাইজেল্ অয়েল উৎপাদন করতে গেলে ১ টন পেট্রোল উৎপাদন করতে ৭ টন কয়লার প্রয়োজন—এই হিসেবে ১০ লক্ষ টন পেট্রোল উৎপাদন করতে বছরে ৭০ লক্ষ টন কয়লার দরকার। অর্থাৎ ভারতে মোট যে পরিমাণের কয়লা বছরে তোলা হয়, তার এক-চতুর্থাংশ। এই ধরণের একটা কারখানা স্থাপন করতে ৫০ কোটী টাকা ব্যয় হবে। এ ছাড়া এই কারখানা চালাতে ২ লক্ষ ডিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে একটী কারখানা স্থাপন করতে হবে; তাতে বছরে ১৫ কোটী টাকা মূল্যের পেট্রোল-জাত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারবে।

ভারত সরকার ভারতে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের অভাব পূরণের জন্যে কয়লা হতে পেট্রোল প্রস্তুত, পেট্রোলের সঙ্গে ব্যবসাতামূলকভাবে তুলনায় বিশুদ্ধ ও মহা-প্রাণ দ্রব্যে অপরিষ্কৃত তেল এনে পরে তা ভারতে পরিষ্কৃত করবার ব্যবস্থা,—এই তিন রকমের কার্য্যক্রম অবলম্বন করেছেন।

এ বছরের জুলাই মাসে পূর্ব্বোক্ত কুপার কোম্পানী পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁদের বিবরণী পেশ করেছেন। গত ১৩ই জুলাই তারিখের ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কর্ম্মকরী সমিতি এই বিবরণী সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করেছেন।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার বিচার পর্ষদ-সেক্রেটারীর কাছে এমন সব জায়গা নির্ব্বাচনের জন্যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যাতে মোট ১৫ শত টন করে এবং শ্রেষ্ঠের কয়লা সরবরাহ হতে পারে। আলোচ্য কয়লা খনিতে বছরে কয়লা থেকে ১০ লক্ষ টন পেট্রোল উৎপন্ন হবে আর এই কারখানা স্থাপন করতে ব্যয় হবে ৫৫ কোটী টাকা। প্রকাশ যে, এই কারখানায় যে পেট্রোল উৎপন্ন হবে তার উৎপাদন খরচ হবে প্রতি গ্যালনে ৶৵০। এই কারখানা যাতে পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল ও পানাগড়—উক্ত তিন অঞ্চলের কোন অঞ্চলে স্থাপন করলে সব চেয়ে সুবিধা হবে, সেটা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ভারতবর্ষের আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, অণ্ডাল পানাগড় অঞ্চলে প্রচুর কয়লার খনি আছে এই সমস্ত খনি থেকে এখনও কাঁচা কয়লা তুলে পাল করে পুড়িয়ে কোক করা হয়। এমনি পাল করে না পুড়িয়ে বায়ুবন্ধ চুল্লীতে কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে কোক করলে যে সমস্ত উপ-পদার্থ পাওয়া যায় তা থেকে বহু কোটী টাকা পাওয়া যেতে পারে। তাহলে আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের কোথাওই প্রায় আজ কাঁচা কয়লা পোড়া অবস্থায় পোড়ান হয় না। বায়ু-বন্ধ-চুল্লীতে কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে ঐ সব দেশের বৈজ্ঞানিকরা আলকাতরা ও কোল্ গ্যাসটী সমস্ত আহরণ করে নেয়। তারপর কোল-গ্যাস্ থেকে গ্যাসের জ্বালা, আলো, ইত্যাদি জন্যে, আর আলকাতরা থেকে চিনি, হাজার রকমের রং, সুগন্ধি দ্রব্য, নানা রকমের ঔষধ, জীবাণু-নাশক, কীট নাশক, ন্যাপথালিন্, বাজ, বেনজিন্, বিস্ফোরক ডিনামাইট প্রভৃতি তৈরী হয়। সুতরাং যে আলকাতরা থেকে কোটী কোটী টাকা মূল্যের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে তাকে এমন অযত্নে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলার কোন অর্থ হয় না। আলকাতরা-লব্ধ ক্রত্রিম ভেষজ, প্রাণদ্রব্য বা রঞ্জন পদার্থেই পাশ্চাত্যের বাণিজ্যনিকরা যে কত টাকা অর্জ্জন করছে তার ইয়ত্তাই নেই।

আমাদের দেশের লোকেরা কয়লার কালিমাটাই দেখেছেন। আজও তাঁরা ভবে আছেন "অন্ধকারমিলিমঃ শতধৌতেন মুক্তি" কিন্তু ঐ কালো কয়লার ভেতরেই যে মৃত্যুপথযাত্রীর অনেক ঔষধ আছে, বিলাসিনীর লোভিন পরিচ্ছদের প্রজাপতির ডানার মত চোখ-ধাঁধাঁন বর্ণচ্ছটার আছে, বোমাকবোধীর পারিজাত গন্ধও আছে ঐ কালো কয়লার মধ্যে, আমাদের দেশের লোকদের অনেকেই তা জানেন না।

খনিজ কাঁচা কয়লা পোড়ালে আলকাতরা পাওয়া যায়। কোন বায়ুরুদ্ধ চুল্লীতে কাঁচা কয়লা পুড়ে ঐ চুল্লীতে ক্রমবর্ধমান তাপ প্রয়োগ করলে কাঁচা কয়লা থেকে বাষ্প বার হবে। ঐ বাষ্পকে রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ধরে নিলে পাওয়া যাবে আলকাতরা। আলকাতরাকে তাপ দিয়ে পরিস্রুত করলে পাওয়া যায় তাপ্‌থা (coal tar naptha)। তাপ্‌থা সাধারণতঃ জাহাজি তেলের মত ব্যবহার হয়। বর্তমান ব্যাপারে এই তাপ্‌থা থেকে বেন্‌জিন্ (Benzine) নামক অতি তরল ও অতি দহন-যোগ্য একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হফ্‌ম্যানের কৃতী ছাত্র কার্ল রাম্‌ফিজ্ নামক জনৈক ইংরেজ যুবক আলকাতরা পরিস্রবণ কার্যে নিযুক্ত হন। পরিস্রবণের সময় ক্রমিক তাপের উন্নতা অনুসারে বিভিন্ন পাত্রে বেন্‌জিন, টোলুইন্, জাইলিন, এসিড, ক্রাসথলিন, এনথ্রাসিন কার্বোলিক ও যন্ত্র-পাতিতে দেবার তেল (Lubricating oil) সঞ্চিত হয়। আলকাতরার পাত্রে পরিস্রবণের পর, পিচ নামক একটি ঘন, কালো, আঁঠাল পদার্থ পড়ে থাকে। পিচ আধুনিক পথ নির্মাণে, জুতোর কালি তৈরী ও বাড়ি রঙিন করার কাজে লাগে।

মাত্র আঠার বছর বয়সের তরুণ বৈজ্ঞানিক অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি জিনিস আবিষ্কার করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। সেদিন এই ইংরেজ যুবকই কি ভেবেছিলেন আলকাতরা-জাত রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে অবিলম্বে মানব জাতির অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য কি ভাবে নির্ভর করবে। উৎসাহিত হয়ে তিনি কেবল আলকাতরা-জাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্যেই এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। পুরোদমে কাজ চলতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর সবের প্রতিষ্ঠানটিতে আগুন লেগে গেল। রাম্‌ফিজের সাধের প্রতিষ্ঠান চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তিনি তা কল্পনাও করতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন আগুন নিভাতে। সেই ধাক্কাতেই তাঁর মাথা। সে আগুন থেকে আর তাঁকে ফিরে আসতে হলো না। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাম্‌ফিজের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতিসাধন হলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

রং শিল্প

রাম্‌ফিজের মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র উইলিয়ম পার্কিন্ নামে আর একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক আলকাতরা থেকে কৃত্রিম কুইনিন্ আবিষ্কার করার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন সায়াহ্নের পরিস্রবণে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে যে সব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে তিনি সায়াহ্নিক কাজ করেন, সেগুলি সব একটি পাত্রে ফেলে দিলেন, আর মনে মনে পাত্রের নীচে অতি উজ্জ্বল এক রংয়ের সৃষ্টি হল। এই হল রাসায়নী রং। এই বিস্ময়কর রঙীন পদার্থের কথা রাসায়নিকের মত সমস্ত বৈজ্ঞানিক মহলে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের অনুসন্ধান ও পরিস্রবণের ফলে জন্মে জন্মে লাল, নীল বেগুনে, ফিরোজা প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ রং আবিষ্কৃত হলো।

নীল হলো রঙীন পদার্থের প্রতিভাস। হাজার হাজার বছর আগে মিশর ও ভারতবর্ষে সমস্ত সমস্ত বিধা জমিতে নীলের চাষ হতো। তারপর ইউরোপে নীল চাষের সূচনা হয়। ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর ক্ষেতে নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উৎপীড়নের কথা ইতিহাস-বিখ্যাত। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র এই কলঙ্কময় ইতিহাস চিরন্তন করে রেখে গেছেন তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকে। এই নীল চাষের অবসান ঘটে আলকাতরা-জাত নীল আবিষ্কৃত হওয়ায়। সুদীর্ঘকাল গবেষণা করার পর বায়ার (Bayer) নামক জনৈক জার্মান রাসায়নিক আলকাতরা থেকে প্রথম কৃত্রিম নীল রং আবিষ্কার করেন। এই রংয়ের নাম হল ম্যানিলিন (Aniline)। এই ইংরিজি কথাটির উচ্চারণেও বাংলা ভাষায় নীল কথাটি ওতপ্রোত হয়ে আছে। উদ্ভিজাত নীলের চেয়ে এ নীলের দাম হল বহুগুণ বেশী। বায়ারের আবিষ্কারের পর জার্মানীর "Badeische aniline and soda fabric" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। এঁদের গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তু হলো নীল। দীর্ঘ পনের বছর গবেষণার পর এই প্রতিষ্ঠান খুব ভালো নীল বার করলেন। এর দামও হলো খুব কম। এই নীল আবিষ্কৃত হওয়ায়ে ইংরা পৃথিবীর নীল চাষীদের আর গেল। গত শতাব্দীর শেষভাগে এক ভারত থেকেই প্রতি বছরে নয় হাজার টন নীল ইউরোপে চালানি যেত, যার দাম হলো পাঁচ কোটী টাকা।

নীলের মতই অ্যালিজারিন (Alizarin) হলো আর একটি উদ্ভিজাত রঙীন রং ও প্রয়োজনীয় বস্তু। পূর্বে ফ্রান্সে এক রকম গাছের আবাদ হতো। তার মূল থেকেই এই রং তৈরী হতো। এক ফ্রান্সেই দশ লক্ষ বিঘা জমিতে এই গাছের চাষ হতো। তা ছাড়া তুরস্ক, তুরস্ক, পারস্য ও আরবদেশেও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে এই মজিষ্ঠা গাছের চাষ হতো। নীল নিয়ে গবেষণা করতে করতে অধ্যাপক রাম্‌ফিজের জনৈক ছাত্র গ্রাবে উদ্ভিজ-জাত মজিষ্ঠা রংয়ের মত এক রকম রং পেয়েছেন। তারপর বিশ্লেষণ করে তিনি আবিষ্কার করলেন, আলকাতরা-জাত এ্যান্থ্রাসিন্ (Anthracene) নামক এক রকম পদার্থ যা থেকে খুব অল্প খরচে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিজারিন রং পাওয়া যেতে পারে। তুলছে আগে এই রংয়ের চাষ হতো। টার্কি কথাটি থেকে রং-টির নাম হয় "টার্কি রেড"। অ্যান্থ্রা-সিন্ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মজিষ্ঠার চাষ পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে উঠে গেল। এরপর আলকাতরা থেকে প্রায় তিন হাজার রকম রং আবিষ্কৃত হয়। লেখা ও ছাপার যাবতীয় রংয়ের কালি আজ আলকাতরা থেকেই উৎপন্ন হয়।

সুগন্ধি শিল্প

আলকাতরা-লব্ধ বেনজিন থেকে এনেথল, মিরাবেন, হোয়াইট হেলিওট্রোপ নামক বিখ্যাত সুগন্ধি, আইওনেন, ভায়লেট, কেমারিন, ভাইনায়াসন্ প্রভৃতি হাজার রকমের সুগন্ধ-দ্রব্য, আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকের সভ্য জগতে ব্যবহৃত প্রায় সবরকম গন্ধদ্রব্যই আলকাতরা থেকে তৈরি করা হয়। গোলাপের গন্ধ উৎপাদন করা সবচেয়ে কঠিন। দীর্ঘকাল চেষ্টা করার পর সিলজিপের জনৈক রাসায়নিক কৃত্রিম গোলাপের আতর তৈরী করতে সক্ষম হন। গত দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে এক জার্মানীই বছরে লাখ কোটি টাকার আলকাতরা

লক্ষ লক্ষ মৃত্যু পৃথিবীর বিভিন্ন করত।

জীবাণু-নাশক দ্রব্য ও ঔষধ শিল্প

আলকাতরা থেকে বছরে বহু কোটি টাকার ওষুধ ও জীবাণু-নাশক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। পূর্বোক্ত আলকাতরা-জাত ন্যাপিথিন থেকে, ক্রিয় কুইনিন্, ক্যাম্ফর, নিউরোলিন্স ও চর্মরোগের ওষুধ তৈরী হয়; টোলুইন থেকে ঘুমের ওষুধ সুমিনল্ ও ব্রাকাটিন হয়। আলকাতরা-লব্ধ কুইনিনে অনুরূপ যে ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম ন্যাপিন ও কাইরেনিন। এর মধ্যে প্রথমোক্তটি অতি সাংঘাতিক সান্নিপাতিক জ্বরের প্রতিষেধক এবং দ্বিতীয়টির কাজ কুইনিনের মত, তবে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। এরপর ন্যাপিপাইরিন নামক একটি অতি মূল্যবান জ্বরের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। প্রোটোটেইন, কোকেইন, নোভো-কোকেইন প্রভৃতি আলকাতরা জাত ওষুধগুলির কার্যকারিতা অতিশয় বিস্ময়-জনক; এই ওষুধ দুটি আবিষ্কৃত হওয়ায় অস্ত্র-চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা আজ একেবারে বেদনাহীন হয়ে গেছে। কৃত্রিম ন্যাফথেলেনই বাস রোগের একটি মহৌষধ। সিন্থেটিক ন্যাপিথও আলকাতরা থেকে তৈরী হয়। এটা গোদার একটি ভালো ওষুধ। কার্বোলিক [illegible] একটি ভালো জীবাণু-নাশক। এটিও আলকাতরা থেকেই উৎপন্ন হয়। চিনির চেয়ে বহুগুণ মিষ্টি স্যাকারিন ও চার হাজার-গুণ বেশী মিষ্টি এস-প্যারা-ফেনেটিডিন এই আলকাতরা থেকেই উৎপন্ন হয়।

বিস্ফোরক পদার্থের শিল্প

আলকাতরা-জাত টোলুইন্ থেকে টি এন্ টি বা ট্রাই-নাইট্রো-টোলুইন নামক অতি বিস্ফোরক পদার্থটি তৈরী হয়। বেঞ্জল-জাত কার্বোলিক এসিড থেকে পিক্রিক এসিড, পিক্রামাইড, পিক্রেট প্রভৃতি মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থগুলি তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়া ঐ সব পদার্থগুলি থেকে অনেক রকম ফুটবল্ বানানও হচ্ছে।

কৃত্রিম রঞ্জন শিল্প

কৃত্রিম রঞ্জন বা অ্যানিলিন্ হলো আর এক মূল্যবান আবিষ্কার। আজ আলকাতরা থেকে অনেক রকম মূল্যবান অ্যানিলিন্ আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃত্রিম লাক্ষা, ভ্যানিলা, এমন কি কৃত্রিম বেশন, পশমও, এই অঞ্চার পদার্থ থেকেই আজ তৈরী হচ্ছে।

গ্যাস বা উদ্বায়ু বাষ্প শিল্প

কাঁচা কয়লা জ্বালালে যে গ্যাস বার হয়, তা গ্যাসের আলো, গ্যাস্ ষ্টোভ, গ্যাস বার্নার, প্রভৃতি জ্বালানোর কাজে লাগে। এতে কল-কারখানার কাজ চলে, বিজ্ঞানাগারের কাজ হয়, আবার বাড়ীর রান্না-বান্নার কাজও চলে। কার্বোন্ মোনো-অক্সাইড বা কাঁচুনে গ্যাস পাওয়া যায়। এই জন্যে ছত্রখন্ড করার কাজে লাগে; কার্বোন ডাই-অক্সাইড লেমোনেডের বোতলে করা হয়, কোল গ্যাস থেকেই অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। কৃত্রিম সার ও এর থেকেই তৈরী হয়।

আজকের সভ্য জগতে আলকাতরার অবদান যে কি বিরাট তা ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে, আর এ অবদানের ব্যাপকতা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব নয়। একদিন ইংলণ্ডের কোন গ্যাসের

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :
ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা

'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক' ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের পলিসি গ্রহণ করা সর্বদাই লাভজনক।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস ঃ

শ্রী এস এম ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান
শ্রীরাজেন্দ্র সিং সিংঘী, বি কম — শ্রী আই এন রায়, বি এস-সি
শ্রী টি সি চ্যাটার্জি, বি এ — শ্রী এম এম ভট্টাচার্য, বি এ

গত ভ্যালুয়েশনের ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে এবং পলিসি হোল্ডারগণকে নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

আজীবন বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ১২৲ টাকা
মেয়াদী বীমায়- হাজার করা বার্ষিক ১০৲ টাকা

বোম্বাই, দিল্লী, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, আগরপুর, রায়পুর, শিলং ও ডিব্রুগড়ে কোম্পানীর অফিস আছে।

সৎ ও কর্মকুশল ব্যক্তিদের নিকট হইতে এজেন্সির আবেদন আমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

কারখানার পাশ দিয়ে নালা কেটে আলকাতরা বার করে দেওয়া হতো। তারপর ঐ নালার পড়ে জীবজন্তু ও মানুষ মারা যায় বলে, আইন করে নালা বন্ধ করে দেওয়া হল। যার বহু টাকা খরচ করে কারখানার মালিকদের সহর থেকে অনেক দূরে মালভিতে গড়ে আলকাতরা ফেলিয়ে আনতে হত। আজ রসায়ন বৈজ্ঞানিকদের মানুষের কল্যাণে, টাকা ও তাঁদের দিতেই হয় না। উল্টে বছরে তাঁরা আলকাতরা থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন আবশ্যকতা-জাত হবার দিয়ে কত কোটি লোক যে নিযুক্ত আছে তা বলাই কঠিন। আর মানব সমাজের অতি প্রয়োজনীয় কত সহস্র রকম বস্তু যে আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঠিক বলা কঠিন। আলকাতরা থেকে কৃত্রিম হীরে পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশে এ যেন মহামূল্য আলকাতরাকে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এখন এদেশে আলকাতরার সদ্ব্যবহার হলেও তাতে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি রসায়ন বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা দেশের কাঁচা কয়লা পোড়াবার সময় সমস্ত আলকাতরাটা নষ্ট হতে না দিয়ে তার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করান, তাহলে তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে, নতুন নতুন অনেক ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠবে, দেশের হাজার হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হবে।

মধ্যবিত্তের সমস্যা

গোপাল ভৌমিক

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যাতত্ত্ব ব্যুরোর সাম্প্রতিক বিবরণে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীদের জীবনধারণের ব্যয় যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় চারগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসের মূল্যমানকে ১০০ ধরে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৪৯ সালের জুন মাসের শেষে সে মূল্যমান এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯১'৩ এর কোঠায়। এর অর্থ কি এত তলিয়ে দেখলে তা বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। এর অর্থ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক বাজেটে অচল অবস্থার সৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু থেকে দ্রব্য-মূল্যের যে ঊর্ধ্বাভিযান সুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয় নি—আর কবে যে শেষ হবে সে সম্বন্ধেও কেউ কোন নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারছেন না। এই বর্ধিত ব্যয়ভারের সঙ্গে তাল বজায় রেখে চলতে পারে এ ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বেড়েছে এমন কথাও কেউ বলতে পারবেন না। বরং আয় যা বেড়েছে ব্যয়ের তুলনায় তা নিতান্ত নিষ্প্রভই সমান। এর পরিণাম কি হতে পারে তা বলে দেওয়ার দরকার নেই। একটু বয়সী গরীবের বুড়ি নিয়ে সমস্যাটির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। যুদ্ধপূর্ব যুগেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা নিরতিশয় আরামপ্রদায়ী ছিল এমন কথা বলতে পারি না। ধনী ও গরীবের মধ্যবর্তী এই নিম্নস্থ শ্রেণীর অভিযোগ সে দিনও ছিল—আজও রয়েছে। তবে আজকের অভিযোগ সহনীয়তার মাত্রা একেবারে ছেড়ে ছেড়ে চলেছে—এই যা পার্থক্য। সুদূর-পূর্ব এই শ্রেণীটির নিত্যদিনের যুদ্ধপূর্ব যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক বাজেটে অচল অবস্থার সৃষ্টি হত খুবই কম। যুদ্ধপূর্ব যুগ ও যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় যুদ্ধের ছয়টি বৎসর বাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। যুদ্ধকালীন দ্রব্যমূল্য আজকের মতই গগনচুম্বী ছিল—একথা সত্য; ব্যয়ের সঙ্গে সমতা রেখে আয় বাড়ে নি—একথাও সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধের সময় বাড়তি আয়ের পথ অনেক খেতে খোলা ছিল—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে মেয়ের বেকারত্ব প্রায় ঘুচে গিয়েছিল বলা চলে। সে সময় কাউকেই বড় একটা বসে থাকতে দেখা যেত না—তাই সামগ্রিকভাবে পারিবারিক আয়ও বেড়েছিল বেশ। এই সামগ্রিক সমৃদ্ধি যতই কাঁপা হোক—এ সমৃদ্ধি যে এসেছিল—সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর আজ? অবস্থা আজ চরম আকার ধারণ করতে চলেছে। সবত্র দেখে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেওয়ার বেকারত্ব প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। চাকুরী যাদের আছে তাদের আয় অনেক ক্ষেত্রে কমেছে—যে ক্ষেত্রে কমে নি, সে ক্ষেত্রে সে আয় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে জীবনধারণের ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সুতরাং অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ অবস্থা শুধু পশ্চিমবঙ্গের চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়—স্বাধীন ভারতের সর্বত্রই এ অবস্থা বর্তমান।

কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত অবহেলিত বঞ্চিত গোষ্ঠী বর্তমান ভারতে আর আছে কি না সন্দেহ। এদের জন্যে সমাজ বা সরকার কারও যেন কোন দরদ নেই। অথচ রাষ্ট্রই বলুন আর সমাজই বলুন—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই চল তার প্রধান শক্তিস্তম্ভ। শিক্ষক, অধ্যাপক, ছোট সরকারী কর্মচারী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কেরাণী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক বা শিল্পী—সবাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সারা ভারতে এদের সংখ্যা শক্তিও নগণ্য নয়—৩ কোটি থেকে ৪ কোটির মত—ভোট জন গণনার শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ। অথচ এই বিরাট জনসংখ্যার জন্যে সরকারী উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কোন আভাস আমরা পাই না। দুঃখ আরও এই নিষ্করুণের কারণ বোঝা যেত। দুঃখ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে করবার বিশেষ কিছু ছিল না। আগেও থাকলেও তাঁদের উপায় ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে গেলে ভারতীয় অর্থনীতির যে আমূল সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল, দুঃখ কর্তৃপক্ষ সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁরা এসেছিলেন এ দেশ শাসন শোষণ করতে—আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে নয়। ভারতীয় অর্থনীতিকে সমাজের সকল স্তরের নরনারীর উন্নতি বিধানে নিয়োগ করার অর্থই ছিল বিদেশের শোষণ ব্যবস্থায় মূলে কুঠারাঘাত করা। তা তাঁরা যদি সজ্ঞানে না করে থাকেন

তারে ছুঁতে তাঁদের আবহা খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। এই বাধীনতার জন্যে তাঁদের মূল্যও কম দিতে হয় নি। নিজেদের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ভারতের বুকে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একদা তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই শ্রেণীই শেষ পর্যন্ত তাঁদের বেশ কিছুদিনের ঘুম ভাঙিয়েছিল। কে না জানে যে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ। সুষ্ঠুভাবে এদেশে সাম্রাজ্যিক শাসন শোষণ চালানোর জন্যে একটী এক দল শিক্ষিত কেরাণী-কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা এদেশে এমন এক ধরণের ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন যার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত কম। কেরাণী কর্মচারীর প্রয়োজন অফুরন্ত কিংবা চিরন্তন হতে পারে না। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল যে, শিক্ষা কাজের তুলনায় শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তখনই শুরু হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারত্বের সমস্যা ও প্রতি বৎসর সে সমস্যা বেড়েই চলল। নিছক অভ্যাসবশে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত ইংরেজী শিক্ষা কারের হয়ে থাকল আমাদের দেশে। অথচ ডিগ্রীর ও কেরাণীগিরি ছাড়া এ শিক্ষা জীবিকা-[illegible] কোন অন্য পথ খুলে ধরতে পারল না [illegible] দুর্ভাগ্যের কথা। সামনে আয়-[illegible] কম দেখে শিক্ষিত যুব-শক্তির [illegible] অসন্তোষ—এরা ছিল বিদেশী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ইংরেজী শিক্ষা ভাল আর মাই হোক, এর [illegible] যে তারা বাধীনতার মর্মার্থ বুঝেছিল—এই [illegible] বুঝেছিল যে ভারতের পরাধীনতার অবসান [illegible] তাদের জীবন-সমস্যার [illegible] হবে না—দেশের জনসাধারণের [illegible] থেকে যাবে। মধ্য-[illegible] শ্রেণীর এই [illegible] তার-বিরহ থেকেই [illegible] আবেগের [illegible] ! তার [illegible] আন্দোলনই [illegible] কংগ্রেস এবং [illegible] আন্দোলনই [illegible]—তার পিছনে [illegible] শ্রেণীর [illegible] সেটা নিরপেক্ষের [illegible] বর্তমান এবং না হলেও এ প্রসঙ্গে [illegible] প্রয়োজন। পরাধীন দেশের জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিষ্ক্রোভকে যারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে প্রয়োগ করেছিল তারা হল এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সুতরাং জাতীয় জীবনে এদের দানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর শুধু রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসে এদের শক্তি নিয়োজিত হয়েছে এমন মনে করলেও ভুল করা হবে। জাতির বহুমুখী মানসিকতার যে দিক আছে তার প্রকটন ও সংরক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান অনস্বীকার্য। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু ঐতিহ্যের অধিকারী তার সব খানি না হলেও অধিকাংশই কি এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান নয়?

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল যে মধ্যবিত্তশ্রেণী তারা স্বভাবতই প্রত্যাশা করছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু গত দুই বৎসরের স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা খেয়েছে চরম আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগ সুবিধা করা তো দূরের কথা—মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে। যেরূপ টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুইশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরাণীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একজন শ্রমিক বা কৃষকের আয় তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন চাকুরের চেয়ে কম ছাড়া বেশী নয়। তার যদি চলে তবে অধ্যাপক, সাংবাদিক বা কেরাণীরই বা চলবে না কেন? তর্কের খাতিরে এরূপ প্রশ্ন উঠা সম্ভব হলেও এ ধরণের তুলনা অর্থহীন। একজন শ্রমিক বা কৃষকের জীবন-ধারণের যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড, একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণের সে ষ্ট্যাণ্ডার্ড নয়। দু জনের সামাজিক দায়িত্বও সমান নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তার মতোচের মতই চেষ্টা করুক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাকে একটা বিশেষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে চলতে হয়। টাকায় না কুলোলেও তাকে তার জামা কাপড় পরতে হয় হয়, গৃহ-সজ্জার আসবাবের কিছু কিছু আধুনিক ধরণের রাখতে হয়, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়—প্রয়োজন হলে মেয়ের বিয়েও দিতে হয়। এই দুদিনে কম মাইনের ভদ্র জীবন যাপন করা যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা কি বিশেষভাবে বলে বোঝানোর প্রয়োজন আছে? সেই দুঃখবরণ করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে অথচ এদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব নিকাশ নেওয়া হয়েছিল। তাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক দুর্দশার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা রীতিমত করুণ। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই এই অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়েছিল। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, প্রায়ই এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা ঋণগ্রস্ত। কলিকাতার ঋণগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাই তুলনায় সর্বাধিক। নিম্ন বেতনভোগী সরকারী চাকুরে-দেরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অল্পবেতনভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরেদের আর্থিক দুর্দশা আজ সহজেই অনুমেয়। দেশের আর্থিক অবস্থা যত খারাপ হয়ে চলেছে, এদের দুর্দশাও সঙ্গে সঙ্গে তত বেড়ে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা মোচনে ভারত গবর্ণমেণ্ট চরম উদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। কৃষক মজুরদের জন্যে আপাতরূপ উন্নতির কোন ব্যবস্থা তাঁরা না করে থাকতে পারেন—কিন্তু এ জন্যে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটী নেই। এদের দাবী দাওয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে জোরের সঙ্গে পেশ করার মত সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনও আছে এবং প্রায় ক্ষেত্রে এ সব আন্দোলনের নেতৃত্ব করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই। কিন্তু তাদের নিজেদের বাঁচার দিকে রাষ্ট্রীয় মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানই তাদের নেই। সুতরাং বিভিন্ন বিভিন্ন স্বার্থসাধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্বের মত আজও উপেক্ষিত ও অবহেলিত শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার আমলে তাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা যেন আরও বেড়েছে। জাতীয় জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর [illegible] দানের কথা

যদি কেউও নেই—শুধু রাজস্বগত হারের দিক থেকেও এ শ্রেণীটির মূল্য কি কম? ভারতের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জুগিয়ে আসছে তারা? উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমন্বয়েই বা কি? ১৯৬৯ সালে সমগ্র ভারতের মোট রাজস্ব ছিল ১৬১৭৬ কোটি টাকা বর্তমানে সেই রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯১৭৩ কোটি টাকায়। আর কাদের কল্যাণে এই রাজস্ব বেড়েছে তা আমরা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। রাজস্ব অর্থই করভার। এই করভারের প্রায় ৭০ ভাগ বোগায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর দশভাগ ভারতের মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন তারা জোগায় রাজস্বের বাকী ৩০ ভাগ। আসুক মন্দা, বিত্তক হয় বন্ধুন, পণ্যমূল্য বন্ধুন—এর প্রত্যেকটির আঘাতই স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর। সমাজের যে শ্রেণীটির দ্বারা রাষ্ট্র এভাবে উপকৃত হয় তার প্রতি রাষ্ট্রের কি কোন কর্তব্যই নেই? কর্তব্য যে আছে—এমন কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত পাই নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্যে কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয় বাজেটে আজ পর্যন্ত করেন নি। কর ফাঁকির যে সব বৈধব্য ও অসাধুতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি অবিচারের প্রতীক বিশেষ তার কোন সংশোধনের ব্যবস্থাও তাঁরা করেন নি। যেমন ধরুন আয়করের কথা। বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর আয় হলেই আয়কর দিতে হয়। এ ব্যবস্থা একজন পারিবারিক দায়িত্ব বর্জিত অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, তেমনই বৃহৎ পরিবারযুক্ত একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেইভাবে প্রযুক্ত হয়। অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে অন্তে যে তা হওয়া উচিত নয়। বৃহৎ পরিবারযুক্ত যে ব্যক্তি তিনি হয়তো এই বাজারে যে টাকা উপার্জন করেন, তাতে তাঁর পরিবার ভরণ পোষণের বায়ই ভাল ভাবে চলে না। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁকেও যে কর দিতে হয়, একজন সমান আয়ভোগী অবিবাহিত ও পারিবারিক দায় বিমুক্ত ব্যক্তিকেও সেই কর দিতে হয়। এ কি রীতিমত অবিচার নয়? সরকারের ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে অতি সহজেই এ বৈষম্যের প্রতীকার করতে পারেন।

আজ আর একথা লুকিয়ে লাভ নেই যে, দেশ স্বাধীন হবার পর দু বছর যেতে না যেতেই দেশের জনগণের একাংশ কংগ্রেস শাসন ও সাধারণ ভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর বিরূপ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। জন-মানসের সেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আজ আর ঢাকা নেই। ভারতের একাধিক প্রদেশে নির্বাচন উপলক্ষে জনমানসের সেই বিক্ষোভ কংগ্রেস-বিরোধী রূপ নিয়ে ফুটে বেরিয়েছে। এর মূলে প্রধানত কাজ করছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যর্থতা ও বিক্ষোভ। নিজেদের দাবী দাওয়া জানানোর মত সঙ্ঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তাদের না থাকতে পারে · কিন্তু তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, আছে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি। কংগ্রেস এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দাবী দাওয়ার প্রতিকার ব্যবস্থা না করে নিজের সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করেছে বলে আমি মনে করি। কংগ্রেসের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই একদা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আজ আবার ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই অতিদ্রুত কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের কংগ্রেস-বিরোধী মনো-ভাব ক্রমশ জনমানসেও হচ্ছে সঞ্চারিত। এর পরিণতি কি হতে পারে কংগ্রেসের নেতারা একটু চেষ্টা করলেই তা বুঝতে পারবেন। শ্রী কে. এম. মুন্সীর মত খাতনামা কংগ্রেস নেতাও এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে বলেছেন: "If we fail by the middle class, India will go the China way" তাঁর এ উক্তি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী হওয়া উচিত। ইদানীং আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণও কিছু পরিমাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীর পদে অভি-ষিক্ত হবার পর শ্রীযুক্ত অজিতপ্রসাদ সরকার একাধিক বিবৃতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর অবস্থা আমরা বুঝি। সমস্যা সমাধানের সূত্র তাঁর জানা থাকলেও একক শক্তিতে কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর নেই—তার কারণ, এ সমস্যা প্রাদেশিক নয়, সর্বভারতীয়। এ রোগের দাওয়াইও তাই সর্বভারতীয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বা রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ বা রাজাগোপালাচারী যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি নিছক যৌথিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে বিবৃতি প্রচার করেন, তখন আমরা বিস্ময় সংবরণ করতে পারি না। যৌথিক সহানু-ভূতিতে আজ আর কোন কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের জন্যে চাই অবিলম্বে সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা। বোম্বাইতে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজাজী মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর বর্তমান দুর্দশায় প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়ে যে উপদেশ দিয়েছেন তার নির্যাসিতার্থ হল এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আজ নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে মূলধন করে ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীতে ভিড়ে পড়তে হবে ও আত্মবিলুপ্তি সাধন করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী বুদ্ধিজীবীদের বিচারে তাঁর এ উপদেশ ভাল হলেও বর্তমান অবস্থায় তা কি করে সম্ভব কিংবা এতে কি সুফলের কোন কল্যাণ হবে? ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি সমাজদেহ থেকে বিলুপ্ত হয়, সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। কিন্তু তার জন্যে চাই সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। বর্তমান সমাজ-সংস্থাকে একবারে অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্য থেকে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আত্মবিলোপ সাধনের নির্দেশ দিলে চলবে কেন? বর্তমান সমাজ-সংস্থা পাল্টাতে হবে, বদলাতে হবে বর্তমান কেতাবী শিক্ষা ব্যবস্থা। তা হলে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপান্তর ঘটবে। যতদিন তা না হয়—ততদিন তারা করবে কি? শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা যদি শ্রমিক কৃষকের কাজ হাতে তুলে নেয়—তা হলেই কি সমস্যা মিটবে? তাও মিটবে না। এতে বিষম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে মাত্র। কিন্তু বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এই মুহূর্তে আমাদের দেশে কর্মবিহীন সাধারণ শ্রমিক বা অশিক্ষিত বেকার কৃষকের সংখ্যা কি কম? তাদের সঙ্গে কয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারেরা এসে যোগ দিলে অবস্থার কি এমন রদবদল হবে? সুতরাং সমাধানের পথ এটা নয়। মধ্যবিত্ত সমস্যার সমাধান করতে হলে অন্য পথের চিন্তা করতে হবে—আশা আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যেন সেই পথেই চিন্তা সুরু করেন।

—

কৃষির উন্নতির গোড়ার কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

অধিকন্তু বাংলার সরকারী কৃষি বিভাগে প্রায় ৫০ বৎসর নানারকম কাজে নিযুক্ত ছিলাম। কৃষি সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, কৃষির উন্নতিকল্পে আমার সারা জীবনে যেটুকু কি পরিমাণ ফলল হয়েছে, কৃষকদের কাজে কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছি বলতে পারবো না। তবে সারা বাংলার কৃষকদের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামত, সহজভাবে সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি এবং তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা অর্জন করবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই প্রবন্ধে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য বা কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবো না; কেবল ব্যক্তিগত কয়েকটী কথা বলবো। পাঠকগণকে অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি তারা যেন অন্যথা করে মনে না করেন যে, আমি আত্ম-প্রশংসায় প্রবৃত্ত হয়েছি বা অহেতুক হিতোপদেশ দিচ্ছি। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখায় তাঁরা যেন সে মনোভাব উপলব্ধি করে আমার সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

আমার বাল্যকাল পল্লীগ্রামে কেটেছে। পল্লী অঞ্চলের সকল জাতির ও সকল পেশার ছেলেরা আমার খেলার ও পড়ার সাথী ছিল; বাল্যকালের সাথীদের মধ্যে যে গভীর প্রীতি ও ভালবাসার উৎপত্তি হয়, আমাদের মধ্যেও সেই রকম প্রীতি ও ভালবাসা জন্মেছিল ও বেড়ে ছিল; জাতি বা পেশা বিচার করে এ প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে নি এবং কারও সঙ্গে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হয় নি; সকলের সঙ্গেই সমান মেলামেশা ছিল, সকলের বাড়ীতেই সকলের যাতায়াত ছিল; ছেলের বন্ধু ও সঙ্গী বলে সকলের পিতা-মাতার কাছ থেকে স্নেহ ও আদর লাভ করেছিলাম, আমারও পিতা-মাতা জাতি বা পেশা বিচার না করে সকলকে সমানভাবে আদর করেছেন, খাইয়েছেন। এ ছাড়া জাতি বা পেশা নির্বিশেষে বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না ডেকে জ্যাঠা, কাকা, দাদা প্রভৃতি বলতে হ'তো। এমন কি, তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের বৃদ্ধাদের কেও নাম ধরে ডাকার রীতি ছিল না; আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীকাজ কাজ করতো, সে জাতিতে হুলে ছিল; তাকে "লক্ষ্মী মাসী" বলে ডাকতুম; তার বাড়ীতে খেতুম, শুতুম, ঘুমুতুম খেতুম। একজন ব্যাসিটের বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তাঁকে 'গোলাপী পিসী' বলে ডাকতে হ'তো এবং অনেক সময় 'গোলাপী পিসীর' কাছেই আমাদের রাত্রে শুতে হ'তো। 'গোলাপী পিসীর' কাছ থেকে কত রকমের কত গল্প শুনতাম। এখনও মনে আছে 'গোলাপী পিসী' এক এক সময় বলতো "গল্প জানি না, বল্প জানি না, খাই এক গাল মোছা, পড়ে থাকি যেন ধোপা বাটের শুক্তা।'

আর্থিক উন্নতির উপায়

জীবনবীমা আর্থিক উন্নতির অন্যতম উপায়, 'মিক্সড্ চুয়াল' পলিসি সব দিক দিয়েই বিশেষ লাভজনক।

জীবনবীমা করিতে এবং প্রতিনিধি হিসাবে লাভজনক কমিশনে কাজ করিতে অথবা সকলের ভালো ভাবে করিতে হইলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। কাজের সর্ত্তাবলী দেখিলেই বুঝিবেন আমাদের সঙ্গে কাজ সংগ্রহ করাও সহজ।

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

—একটি প্রগতিশীল জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান—

হেড অফিস

১৭৭৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

শ্রী পি, এল, নারায়ণ
জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল
সেক্রেটারী

শ্রী পি, চক্রবর্ত্তী, বি-এ
এজেন্সী ম্যানেজার

বঙ্গলক্ষ্মী

ইন্সিওরেন্স লিঃ

১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

১৯৪৮—এর ভ্যালুয়েশনে

সন্তোষজনক উদ্বৃত্ত (Surplus)

"ভ্যালুয়েশনে প্রকাশিত তথ্যাবলী খুবই সন্তোষ-জনক হইয়াছে। গত ৪ বৎসর কোম্পানী পরিচালনায় যে দক্ষতা ও নিষ্ঠাবত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কোম্পানী ভবিষ্যতেও যে এই নিষ্ঠাবত্তা বজায় করিয়া চলিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং ইহাতে বীমাকারিগণের প্রচুর লাভবান হইবার নিশ্চয়তা রহিয়াছে।"

মিঃ এইচ, কে, সেন, এম-এস-সি,
এ-সি-আই-আই, এফ-এফ এ (এডুকেশন)

কলকাতায় স্কুল-কলেজে আভিজাত্য সম্পন্নদের ছেলেদের সঙ্গে পড়বার ও বেশবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাদের অনেকের সঙ্গে আজীবন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু দেশের সঙ্গে এবং বাল্যকালের সাথীদের সঙ্গে সংযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাঁদের প্রতি ভালবাসা কখনও শিথিল হয় নি। এই পটভূমিকা নিয়ে কৃষি বিভাগে যোগদান করেছিলাম। সেখানে গিয়েও তুরন্তর করলাম যে যে বিদ্যা অর্জন করতে এসেছি কেবল পুঁথি পড়ে সে বিদ্যা অর্জন করা যায় না; কৃষিজীবীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশা দরকার; তারাই প্রকৃত শিক্ষক; তাদের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী ও কার্যকরী। আবার বাল্যকালের পটভূমিকা তাদের সঙ্গে মেলামেশার পথে কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি করলো না। এখন মনে পড়ে কত বার কত কাজে ইংরাজ অধ্যাপক ও আমেরিকা প্রত্যাগত ভারতীয় অধ্যাপকের উপদেশ ও নির্দেশ অপেক্ষা প্রকৃত চাষীর উপদেশ ও নির্দেশ কত অধিক ফলপ্রসূ হয়েছে। উচ্চিংড়ে মহুসূদন দাস মহাশয় বলেছিলেন যে, কৃষি বিভালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা 'খাসীর' কাজই অধিকতর সন্তোষজনক ও লাভজনক—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। তাঁর কথাতে কৃষি-শিক্ষা প্রাপ্ত অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে কিন্তু তাঁর উক্তিতে অনেকটা সত্য আছে এ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কৃষি বিভালয়ে অধ্যয়ন করবার সময় পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে লিখিত এক প্রবন্ধে হিসাব নিকাশের দ্বারা দেখিয়ে ছিলাম যে, কপির চাষে এক বিঘা জমি হইতে প্রায় ৩০০ শত টাকা লাভ হয়। এই প্রবন্ধ পড়ে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বলেছিলেন যে, ১০ বিঘা জমিতে কপির চাষ করলে যদি তিন হাজার টাকা লাভ হয়, তা হলে এখনি ঐ কাজে হাত দাও। তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করেছিলাম; কিন্তু কৃষি বিভালয়ে অধ্যয়ন শেষ করবার পর সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে নিজের তত্ত্বাবধানে যখন কপির চাষ করেছিলাম তখন লাভের অঙ্কের সঙ্গে প্রবন্ধে লিখিত লাভের অঙ্কের অনেক তারতম্য হয়েছিল।

সরকারী কৃষি ক্ষেত্র পরিচালনায় স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষকেরাই আমার প্রধান পরিচালক ছিল; কাজাই, কবির প্রবৃত্তির উপদেশ আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করতাম। কৃষকদের ক্ষেত্রে খামারে প্রদর্শন কার্যেও কখনতঃ তাদের অভিজ্ঞতাই আমাকে পরিচালিত করতো; নিয়ন্ত্রক হলে তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি। তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে, একাসনে বসতে হয়েছে, এক সঙ্গে আহার করতে হয়েছে, তাদের দুঃখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে, তাদের গৃহে অবস্থানের সময় তাদের মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছে। এতে কখনও কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করি নি; বরং প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি। তারাও কোন বিষয়ে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে নি। আমার সঙ্গে এক আসনে বসে তারা ধূমপান করেছে। এর পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে যে প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছি তার একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি: আমার বড় বোনের বিয়ের রাত্রে কৃষি-ক্ষেত্রের নিকটবর্তী গ্রামের প্রায় সতাবিক কৃষক এক সঙ্গে বিনা নিমন্ত্রণে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই তার ক্ষেতের কোন না কোন জিনিষ এনেছিল; কেবল তাই নয়, তারা বলেছিল বিয়েবাড়ির বিয়েতে আমরা না খেয়ে যাবো না। এটা ছিল প্রায় ১৮ বৎসর আগেকার কথা; সৌভাগ্যক্রমে তখন 'কন্‌ট্রোলের' যুগ ছিল না; সুতরাং তাদের আহারের আয়োজন করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি; আর তারা নিজেরাই সব আয়োজন করে নিয়েছিল; এমন কি রাত্রে লুচুরে জাল কেনাও হয়েছিল; তাদের কি আনন্দ। এই ঘটনাতে প্রথমটা আমি খুবই লজ্জা অনুভব করেছিলাম, কিন্তু তাদের আচরণে ও আনন্দে আমি এক অদ্ভুত ও অবর্ণনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিলাম। তাদের উদারতা, তাদের সহৃদয়তা আমার প্রতি তাদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম প্রীতি সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। শিক্ষাও দিয়েছিল।

আমার প্রত্যেক কাজেই আমি কৃষকদের সহায়তা ও সাহচর্য লাভ করবার চেষ্টা করেছি এবং সর্বাগ্রেই তাদের স্থান দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে দু' একটা কথা বলবো: কৃষি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কৃষিজাতদ্রব্যের পুরস্কার নির্ধারণ করবার জন্য যে বিচারক-মণ্ডলী গঠিত হতো তার মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের স্থান আগে থাকতো না; কিন্তু আমার কার্যকালে যে সকল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতো, তার বিচারক-মণ্ডলীতে কৃষকদের স্থান সর্বাগ্রে দিয়েছিলাম এবং প্রথমতঃ তাদের মতামতই গ্রহণ করে পুরস্কার নির্ধারিত হ'তো। তাদের মতামতের মূল্য যে কত বেশী তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি: একজন বিচারক একবার আলুর গুচ্ছ আকার দেখে প্রথম পুরস্কার দেওয়া সুপারিশ করেন, আরও অনেক জন তাঁর মতেই সায় দেন, কিন্তু একজন চাষী-বিচারক সেই আলু চিরে দেখিয়ে দেয় যে, বহুলায় বেশীর ভাগ আলুর মধ্যে পোকা আছে। চাষীর অভিজ্ঞতার এ রকম কত উদাহরণ দিতে পারি। চাষীকে যে কত ভাবে অসম্মান দেখানো হয় ও তাকে কত ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয় না তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পল্লী অঞ্চলে এক কৃষি প্রদর্শনীতে আমি এক চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিলাম; সেই প্রদর্শনীর উঁচু মঞ্চের উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আরও ছোকরা-চোকরাদের বসবার স্থান হয়েছিল। সামনেই চেয়ারে আরও অনেক অল্প বয়োজ্যেষ্ঠদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল; তার পরে বেঞ্চীতে দূরে আরো পরিচিত ব্যক্তিদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল; বেঞ্চীর শেষ সারি পর্যন্ত উপরে সামিয়ানাও ছিল। সামিয়ানার বাহিরে রৌদ্রে চাষীদের বসবার ব্যবস্থা ছিল; আমার কাছে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। ২।১ জনের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় যখন আমাকে বক্তৃতা দিতে আদেশ করেছিলেন তখন আমি এত বেশী উত্তাক্ত হয়েছিলাম যে, আমার অবস্থা ভুলে গিয়ে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, যাদের উন্নতি বিধানের জন্য এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়েছে, যাদের উপর দেশের ও দশের উন্নতি নির্ভর করছে, যাদের সঙ্গে একত্রে মিলে মিশে কাজ করতে হবে তাদের জন্য যতক্ষণ না উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা হবে ততক্ষণ আমি কিছুই বলবো না। আমার সৌভাগ্য যে, সভাপতি মহাশয় আমার কথায় রুষ্ট না হয়ে আমার কথাই সমর্থন

করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কৃষকদের জন্য উপযুক্ত অসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কত ছোটখাটো আচরণ বা ব্যবহারের দ্বারা তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মন জয় করা যায় তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দেখে মাছ সংগ্রহের জন্য ছেলের খুবই অভাব। কিন্তু সে অভাবের দরুণ আমাকে কখনও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি; কারণ একবার শীতকালে অতি ভোরে এক জেলে আমার দরজায় যখন মাছ বিক্রয় করতে আসে আমি তখন চা খাচ্ছিলাম, তাকেও এক পেয়ালা চা ও অতি সামান্য খাবার দিয়েছিলাম; এতেই আমি তার মন এত জয় করেছিলাম যে, যখনি দরকার হয়, তখনি সে মাছ বহন করে আনে।

সকল কাজেই সকলতার জন্য পরস্পরের সাহায্য ও সাহায্য দরকার; এমন কি চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যেও সহযোগিতা দরকার। একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে চিকিৎসার রোগমুক্ত হবার পর আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানানর সময় তিনি বলছিলেন—You are an ideal patient. You have given me your full co-operation—অর্থাৎ আমি একজন আদর্শ রোগী, আমার সহযোগিতা না থাকলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করতে পারতেন না, আমিও তাঁর ধন্যবাদের পাত্র। প্রীতির বন্ধনের দ্বারাই সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা যায়। আচরণ ও ব্যবহার দ্বারাই প্রীতির উৎপাদন হয়। কৃষির উন্নতি বিধানে কৃষকদের প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন; এবং তা' করতে পারলে—half the battle will be won—অর্ধেক যুদ্ধ জয় করা যাবে। কৃষকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলা-মেশাই কৃষির উন্নতির গোড়ার কথা।

অর্থনৈতিক সঙ্কট

প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ

গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকেই অনেক রাজনীতিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে ব'লেছিলেন—"বেলুন এবার ফাটতে আরম্ভ করলো।" অর্থনীতি সম্পর্কে রাজনীতিকের অভিমতকে অনেকেই সেদিন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু আজ এই অভিমতকে গুরুত্ব দান করা তো দূরের কথা—সোজাসুজি সত্যটিকে আজ স্বীকার করতে হচ্ছে; স্বীকার না ক'রে উপায় নেই ব'লে।

গণতন্ত্রের শিবিরের নেতা আমেরিকা। এই আমেরিকাতেই সঙ্কট এসেছে আগে। যুদ্ধ দিয়ে দিয়ে যুদ্ধের সময় যে বেলুনকে সে অস্বাভাবিকভাবে ফুলিয়ে ফুলেছিল, আজ যুদ্ধ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে বেলুন চুপ্‌সে যেতে ব'সেছে। আমেরিকার অর্থ রীতিমত মন্দা দেখা দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে সে ১৪০০ কোটী ডলারের মালসামগ্রী করেছিল, ১৯৪৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১২০০ কোটী ডলার, এবছরে তা আরও কমের দিকে। কাপড়ের কল, পশম তৈরীর কারখানা, লোহা-কারখানা, পেট্রোলিয়ম ও তুলার কারবারের অনেকগুলি অঞ্চলেরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে, না হয় উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছে। বেকারের সংখ্যা ঐ সঙ্কের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। যে আমেরিকার জনসাধারণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বা জীবনমান পৃথিবীর সকল দেশের জনসাধারণের চেয়ে উঁচু ব'লে প্রচার করা হয়, সেখানে আজ জিনিষ কিনবার লোকাভাব। মার্কিন অর্থনীতিবিদরাই বলছেন, "ক্রেতারা ধর্মঘট ক'রে ব'সে আছে।" কারণ জিনিষের দাম তো আর কমে নাই, বরং লোকের আয় গেছে কমে—তাই যতটুকু না কিনলে নয়, ততটুকুই ক্রেতারা কিনছে।

এই অবস্থা যে সৃষ্টি হবে তা কারও অজানা ছিল না। কারণ পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকার প্রভাবের বাইরে চলে যায়, চীনও কাইশেকের শাসনমুক্ত চীনও আর তার ওপর নির্ভরশীল নয়। অথচ যুদ্ধ চালাবার জন্যে কলকারখানার উৎপাদন এমন হারে বাড়ানো হয়েছে যে, যুদ্ধ শেষে তা বিক্রী করবার ব্যাপক বাজার নেই। এদিকে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক মূলধন এসে এখানে জমে গেছে, অথচ তা খাটাবার জায়গা নেই।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মার্শাল প্ল্যান তৈরী হ'লো। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির দলে যাবতা হলো যে, এই দেশগুলি আমেরিকার ডলার ঋণ গ্রহণ ক'রে তার সাহায্যে মার্কিন মাল কিনবে। অবশ্য এর সঙ্গে সামান্য কিছু রাজনৈতিক সর্ত এবং সামরিক দিক সম্ভার সুবিধাও আমেরিকা আদায় করবার ব্যবস্থা করলো। আমেরিকার পুঁজিপতিরা ভাবলেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে যেমন বাড়তি মূলধন খাটাবার সুবিধা হবে, তেমনি বাড়তি মালও চালান যাবে।

ফল হ'লো অন্যরকম। আমেরিকা বাড়তি মূলধনও খাটাতে পারলো, বাড়তি মালও চালাতে পারলো। কিন্তু ঐ দেশগুলির অবস্থা ভাল হলো না। ঐ দেশগুলির অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হ'য়ে উঠলো। কারণ ডলার ঋণ নিয়ে ইচ্ছামত মাল কিনবার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়নি। ইচ্ছামত দেশ পুনর্গঠনও তাদের ক'রবার উপায় নেই। আমেরিকা ইচ্ছা ক'রে যে মালপত্র বা মজুরাতি দেবে তাই নিতে হবে তাদের।

মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্গত একটী দেশ বৃটেনের কথাই ধরা যাক। যথেষ্ট সাহায্য পেয়েও ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধের আগের তুলনায় বৃটেনের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৫ ভাগ—এ বছরে আবার তা কমতে আরম্ভ করেছে। বৃটেনের রপ্তানী ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। অথচ আমদানী বেড়ে যাচ্ছে হু-হু ক'রে। তাকে বার্লিন থেকে মালয় পর্য্যন্ত বিরাট সেনাবাহিনী মুতায়েন করতে হচ্ছে। এর জন্যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হচ্ছে। দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। সরকারী মজুত তহবিল শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

কেবল বৃটেন নয়, মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্গত সকল দেশেরই প্রায় একই অবস্থা। অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নিজেদের ইচ্ছামত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা তাদের নেই। যে সমস্ত মালপত্র বা—

যন্ত্রপাতি পূর্ব-ইউরোপ বা সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে বিনিময় প্রথায় কিনতে পারলে তা কিনবার উপায় নেই। অথচ আমেরিকাও তাদের প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতি বেচে না। কারণ তাতে তো তার বাড়তি জিনিষের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন, ব্রুটেনের ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পের প্রসারের জন্যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। কিন্তু তার বদলে সে পেল মার্কিন সিগারেট। এদিকে বন্ধুদের বন্ধুত্বী বৃদ্ধি করা নীতি-বিরুদ্ধ হওয়ায় দেশের মধ্যেও ক্ষোভের সংখ্যা বাড়ছে। এমন কি "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান"-এর মত পত্রিকা পর্য্যন্ত শ্রমিকদের আরও আর্থত্যাগ ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে ব্রুটেনের বাঁচবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না [১লা জুনের সম্পাদকীয়]। গত যে মাসে 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্ কাউন্সিল অব দি ইণ্টার-ডাশনাল চেম্বার অব কমার্স" "The spectre of 1953"—এই শিরোনামা দিয়ে মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, ১৯৫৩ সালের মধ্যে এই সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে আনতে হবে কারণ ঐ সময়ে ডলার ঘাটতি প'ড়ে যাবে।

আমেরিকা নিজের সংকটের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যে মার্শাল প্ল্যান চালু করেছিল তাতে ইউরোপের উন্নতি কিছুমাত্র হচ্ছে না। সবাই ভুলে হয়তো বিস্মিত হবেন যে, বর্ত্তমানে ইউরোপে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়েছে তার পরিমাণ ১৯৩৮ সালের চেয়ে অনেক বেশী, অথচ বৎসরে গড়করা ৩ ভাগের বেশী পুঁজি জমছে না।

আমেরিকার সাহায্য একেবারেই এক-তরফার মত। এই সমস্ত মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্গত দেশগুলি আমেরিকায় অতি সামান্য মালই পাঠাতে পারে। তারপর এই দেশ-গুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের সুযোগও কম। কারণ একটী সর্ত্ত রয়েছে এই যে, মার্শাল পরিকল্পনার দেশের পাওনা ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে স্বর্ণ বা ডলার দিতে হবে যাতে তারা তা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মাল কিনতে পারে। এইভাবে আমেরিকার সংকট বাঁচাতে গিয়ে এখন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এমন জালে জড়িয়ে পড়েছে যে, তা থেকে নিজেদের উদ্ধারের কোনও পথ নেই।

আবার প্রাচ্য দেশগুলি কোনও না কোনও ভাবে এই সমস্ত মার্শাল দেশগুলির সঙ্গে অর্থ-নৈতিক দিকে যুক্ত থাকার ফলে সেই সব দেশ-গুলিতে সংকট এসেছে। মালয় ব্রুটেনের খাদ্য উপনিবেশ, ভারত ও পাকিস্থানের জাপা ষ্টার্লিং ব্যালান্সের সূত্রে ব্রুটেনের সঙ্গে বাঁধা। জাপান আমেরিকার কুক্ষিগত এবং ব্রহ্মদেশ পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করলেও ব্রুটেনের অর্থ-নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে ওলন্দাজের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ হলেও অর্থনৈতিক আধিপত্য উচ্ছেদ হবার কারণ নেই। এই সব কারণেই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অথবা আমেরিকাকে বাঁচাবার জন্য যেখানে ছোক আর যাদের জন্যে হোক প্রাচ্যের দেশগুলিকে সংকটের ফাঁদে পড়তে হচ্ছে।

কিছুদিন আগে ভারত ও পাকিস্থানের অর্থসচিবরা লণ্ডনে ষ্টার্লিং ব্যালান্স সংক্রান্ত চুক্তি ক'রে এসেছেন। পাওনা ষ্টার্লিং থেকে কিছু অংশ তাঁরা আদায় করেছেন সত্যি, কিন্তু ব্রুটেনের রপ্তানী বৃদ্ধি করে তাকে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য ডলার এলাকা থেকে আমদানী শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস ক'রবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন তাতে ব্রুটেনের সাময়িক সুবিধা হলেও ভারত বা পাকিস্থানের সংকট বাড়বে। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের "পয়েণ্ট ফোর" পরি-কল্পনা অনুসারে অথবা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে ভারত ও পাকিস্থান ডলার ধার পাবে। কিন্তু তা দিয়ে মার্কিন মালই কিনতে হবে এবং এই ডলারের জন্য পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে যে সমস্ত সর্ত্ত মানতে হয়েছে, সেই সমস্ত বা সেই ধরণের সর্ত্ত এদেরও মানতে হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

ঐ সব সর্ত্ত মানবার পর ভারতের কি অবস্থা হবে সে অবশ্য পরের কথা; বর্ত্তমান অবস্থাই কি সাংঘাতিক তা-ই দেখা যাক। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে হাজ তাক সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে মূলাজাত দ্রব্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ছিল ১০৫'২। তা কমে ১৯৪৮ সালে দাঁড়িয়েছে ১০৬'৮। চটকলের উৎপাদন ১০০ থেকে ৯৩'১, ইস্পাতের উৎপাদন ১০১'২ থেকে ১১৮। কাঁচা লোহার উৎপাদন ৮৩৯ থেকে ৮১; সিমেণ্টের উৎপাদন ১১৮ থেকে ১২০, চিনির উৎপাদন ১৯৬'২ থেকে ১১৯'৩, বিদ্যুতের উৎপাদন ১৬১'৩ থেকে ১৪৫'৩ দাঁড়িয়েছে। গড়ে শিল্প উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১২০ থেকে নেমে ১০৪ দাঁড়িয়েছে। এদিকে মুদ্রাস্ফীতও বাড়ছে কমে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মুদ্রাস্ফীর তুলনায় এবছরে ১৭০ থেকে ২০০ কোটি টাকার মত বাড়তি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠছে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে এই দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ৩৪৯'২, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে তা ৩৭৬ হয়েছে। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। সর্ব্বোপরি আছে খাদ্যাভাব। এই অবস্থা থেকে কে ভারতকে রক্ষা করবে। ব্রুটেন তার নিজের সুবিধার জন্যে ষ্টার্লিং এলাকা থেকে বেশী মাল আদায়ের সর্ত্তে ভারতকে কিছু কিছু ঋণ মঞ্জুর করিয়েছে। সুতরাং অত্যধিক মূল্য হলেও এবং অল্প কয় মূল্যে কোনও জিনিষ পাওয়া গেলেও ষ্টার্লিং এলাকাতেই যেতে হবে। আর আমেরিকা যে ডলার সাহায্য দেবে তার মূল উদ্দেশ্য হবে আমেরিকার বাড়তি মাল কাবার করা। ভারতের অর্থনীতির উন্নতির তাতে আশা নেই। দুনিয়া জোড়া সংকট যখন যে যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত তখন অপরের উন্নতি গৌণ ব্যাপার। অথচ গণতান্ত্রিক পরিবারের সভ্য হিসাবে ভারতবর্ষের একঘরে বাইরে গিয়ে আগা পরিবর্ত্তনের সুযোগও নেই, এই পরিবারের যে অনিবার্য্য সংকট তার অংশীদার তাকে হতেই হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গোটা গণতান্ত্রিক জগৎ জুড়ে একটা বড় রকমের সংকট নেমে আসছে যা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। অথচ এই শিবিরের নেতা আমেরিকা বহু চেষ্টা করেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গাঁটছড়া বাঁধা দেশগুলির সংকট তো দূর করতে পারছেই না, বরং নিজে বাঁচতে গিয়ে অপরকেও মারবার ব্যবস্থা করেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জগৎ-জোড়া সংকট থেকে গণতন্ত্র কি ভাবে রক্ষা পেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্র ক্যাপিটালিজমের রক্ষাকবচ নেবন করে ইউরোপের কয়েকটী দেশ বেশ বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু তারা টিকতে পারলো না। আবার কি সেই চেষ্টা

হবে? এদিকে কোন আছে, কিন্তু অন্তরিধাও আছে। কারণ্যেদের জনসাধারণ ক্যাপিজমের চেহারা ভালভাবে চিনে ফেলেছে। তাইতেই দেখছি আমরা ইউরোপে কয়েকটী দেশের হয় রাষ্ট্রপতী, না হয় নিরাপত্তা রক্ষা-ফৌজ বেশ ধারণ করতে হয়েছে।

অবশ্য চরম-পন্থীদের প্রভাবও একেবারে কম নয়, তারা অন্তরালে থেকে, কখনও প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে আর একটা মহাযুদ্ধের জন্যে উস্কানি দিচ্ছেন। আর একটা যুদ্ধের আয়োজন যদি পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং যুদ্ধ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যদি দেশের সমস্ত অর্থ-নৈতিক কাঠামোটাকে যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করা যায় তা হ'লে আপাততঃ বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হয় এবং সঙ্কটকে সাময়িক ভাবে প্রতিরোধের একটা পথ হয়। কিন্তু এত বিপদের জনসাধারণকে যুদ্ধমুখী করে তোলা সম্ভব কি?

পাট ও পাট-শিল্পের সমস্যা

শ্রীকমলাকান্ত দত্ত

প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরিয়া বিশ্বের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় চালাইবার পর ভারতীয় পাটশিল্প প্রথম বাধা পাইল গত যুদ্ধের সময়ে। এ যুগে ভারতের আর কোন শিল্প ব্যবসায় এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই প্রকার নিরঙ্কুশ মুনাফা লুটিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রত্যেকটী দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইতে চায়। ব্যবসায়ের সর্ব্ব দিকে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমবর্দ্ধমান। আজ আর কোন দেশ কোন দ্রব্যের জন্য একান্ত পরনির্ভরশীল থাকিতে চাহে না। সুতরাং বস্তুবিশেষের অতীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় বর্ত্তমানে অচল। যুদ্ধের ফলে পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্য হওয়ায় আমেরিকার ও পাশ্চাত্য দেশগুলি পাটের নানা প্রকারের অনুকল্প জিনিষ বের করিয়াছে। এগুলির মধ্যে কাগজ ও তুলাজাত বস্ত্র পাটের বাজারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধের অবসানে এই দুইটি এবং পাটের অন্যান্য অনুকল্পিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে স্থান করিয়া লইয়াছে, যুদ্ধের পর ভারতীয় পাট তাহা অধিক মূল্যে চড়া দরের সুযোগ লইয়া তাহা অধিক ক্রমবিক্রয়ের চেষ্টা করিলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। চিনি, সার, ওষধির সার, বারিয়াতি দ্রব্যসম্ভার ইত্যাদির ব্যবসায়ে আমেরিকার তুলাজাত কাপড়ের থলের ব্যবহার আজকাল একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশমের পার্শ্বিল্যে নিট-জিনিষের প্রচলন প্রবর্তিত হইয়াছে। বিলাতী বাটির ব্যবসায়ে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, এমনকি ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেই কাগজের থলে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং দুনিয়ার ব্যবসায় ক্ষেত্রে পাটের বাজার স্থায়ীভাবে হ্রাস পাইবার কারণ দেখা দিয়াছে।

কথায় বলে—"দুর্যোগ কখন আসে একথা কেহ জানে না"। সুদূর ভারতীয় চট কলের মালিকগণ বাংলার অনুবর্ত্তর পাটকলের হাতে পাইয়া খুশি মত লভ্যের চটে ও থলে রপ্তানী করিতে পারিতেন। যুদ্ধের পরে সে সুযোগও বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ হারাইতে হইল। বিভিন্ন বাজারে যে সকলে প্রস্তুত পাট জন্মে তাহা এখন পরিণত পূর্ব্ব-পাকিস্তান। যদিও ভারতীয় চট কলগুলি সবই কলিকাতার আশে পাশে অবস্থিত তবুও পূর্ব্ব বাংলা পর-রাষ্ট্রে পরিগণিত হওয়ায় সেখান হইতে ইচ্ছামতরূপ কাঁচা পাট আমদানী করা মিল্ মালিকগণের পক্ষে দুর্ব্বহ সহজ হয়। পাট পূর্ব্ব পাকিস্তানী কৃষকের অর্থকরী ফসল বিধায় তথাকার সরকারী কর্ত্তারা দেশের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষার্থে পাটের জন্য যথাসম্ভব চড়া দর বজায় রাখিবার স্বভাবতঃই চেষ্টা করিবেন। গত ২রা জুলাই ঢাকার সরকারী বস্তুভাণ্ডারে পাট ব্যবসায়িগণের সম্মেলনে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন, ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে বৈদেশিক ক্রেতাগণের সহিত একই দরে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাজারে পাইকার করিতে হইবে। প্রতি দুই মাসে নির্দ্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় না করিলে বাকী অংশ বৈদেশিক ক্রেতাগণের জন্য বরাদ্দ করা হইবে। পরিশেষে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়িগণের আশায় ক্রয় নীতিতে পাটের দর হ্রাস পাইতে থাকিলে সরকার পুনরায় এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবেন।

দেশ বিভাগের কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে নবেম্বর মাসে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পাকিস্তান সরকার

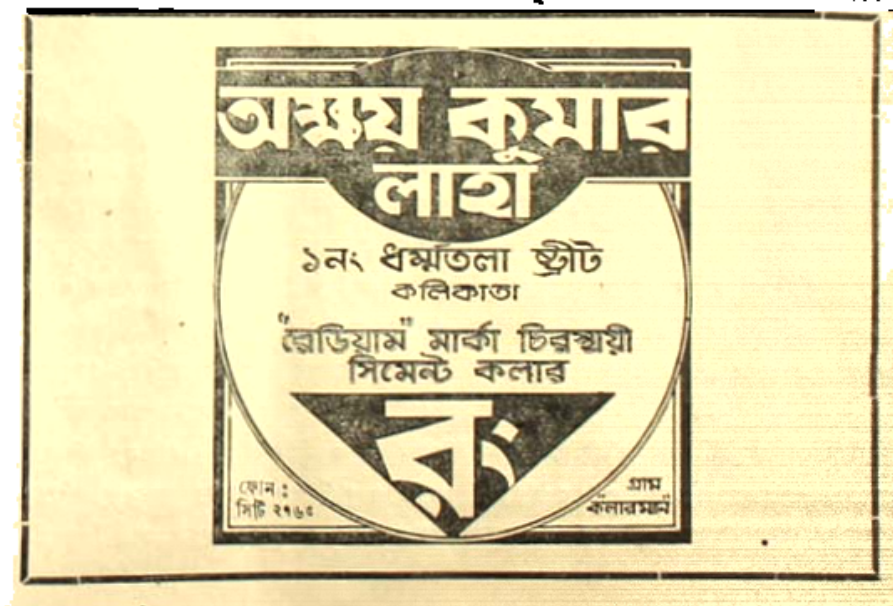

পাটের রপ্তানী বাবদ মণ প্রতি তিন টাকা শুল্ক ধার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের যে মাসের পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী কিছু দিনের জন্য পাটের যোগান সহজ হইয়া আসিলেও পূর্ব-পাকিস্তানে জমতর বাহিপাতের অছিলায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কথা প্রদর্শন করিয়া এখনে যোগানের অসুবিধা প্রচার করা হইতেছে। ফলে বাজারে দর অস্থির চলিয়া গিয়াছে। গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে ৫৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার শতকরা ১২½ ভাগ বেশী জমিতে পাট উৎপাদন সত্ত্বেও বন্যার অতিপ্রবল হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য বহরের মতে গত বৎসরের অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের ধারণা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মোট উৎপাদন ৬৪ লক্ষ গাঁটের কম হইবে না। অমির পরিমাণ দৃষ্টে এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। দর চড়াইবার নিমিত্ত পাকিস্তান সরকার যাহাই প্রচার করুন না কেন, চাহিদার তুলায় এবারকার মোট যোগান অনেক বেশী হইতেছে।

ভারতের পাটের উৎপাদন এবার ১৮ লক্ষ গাঁট হইবে বলিয়া আন্দাজ করা হইয়াছে। অপর দিকে চট কলগুলির চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় এবার অনেক কম। গত তিন মাস ধরিয়া শতকরা উহাদের ১২টি তাঁতের কাজ বন্ধ আছে। তদুপরি জুলাই মাস হইতে প্রতিমাসে এক সপ্তাহ করিয়া কলের কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছে। ভারতীয় চট কল সমিতি তাঁহাদের গত ১৯শে জুলাইয়ের বৈঠকে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা আরও এক সপ্তাহ কলের কাজ বন্ধ রাখিবেন। একাধারে তাঁচা পাটের দাম কমানো ও আমেরিকার হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার সহিত চট কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণের সমতা রক্ষা করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

আমেরিকার ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে "চাঙ্গা ভাব" সৃষ্ট হইয়াছে তাহার পরিণতি সর্ব্বাগ্রে প্রাচ্য দেশে ভারতের পাট শিল্পের উপর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দুনিয়ার চাহিদা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যের বাজার দর কমিতে থাকিলেও ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের, বিশেষ করিয়া পাটের বাজার দর কমানো সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ অবশ্য অনেক; তবুও এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ দুরবস্থার সূচনা করে। ভারতের মাননীয় অর্থসচিব মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, এই বৎসর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ও দুর্লভ মুদ্রা আয়ের ৬০ ভাগ একমাত্র পাট ও পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানী বাবদ আয় হয়। বিদেশ হইতে এদেশের অন্য কোন শিল্প এই পরিমাণ অর্থাগম করে না। সুতরাং ভারতীয় পাট শিল্পের দ্রুত প্রতিপত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার প্রয়োজন। দুর্লভ মুদ্রা ও বৈদেশিক আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকিলে তদনুপাতে ভারতের খাদ্য সামগ্রীর আমদানীও হ্রাস পাইতে বাধ্য। এই অবস্থায় পরিণতি ভারত অপেক্ষা পাকিস্তানের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অমঙ্গল সূচনা করে; কারণ ভারতীয় চট কলগুলির তাঁচা পাটের চাহিদা উত্তরোত্তর কমিতে থাকিলে তদনুপাতে পূর্ব্ব বাংলার তাঁচা পাট প্রভূত পরিমাণে অবিক্রীত রহিয়া যাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই গোটা তিনেক চট কল প্রতিষ্ঠার সনদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহারা ইতিমধ্যে কয়েকটা প্রেস স্থাপন করিয়াছেন। আরও অধিক সংখ্যক চট কল ও প্রেস স্থাপনের নিমিত্ত পাকিস্তান সরকার ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দান করিতেছেন বলিয়া শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ের রপ্তানী ক্ষমতা বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও চলিতেছে। এতৎসত্ত্বেও বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক পরিবেষ্টনীতে বিচার করিতে গেলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চট কল ও প্রেস স্থাপন করা ও চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ের প্রয়োজনানুরূপ রপ্তানী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভূত ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার তুলনায় সর্ব্বক্ষেত্রে পরিবহণ ও উৎপাদনের খরচ বর্ত্তমানে অন্ততঃ ৪০ ভাগ বেশী। আন্তর্জাতীয় অর্থ নৈতিক অবস্থা আয়ত্তে আনিয়া এত বড় বিরাট সমস্যার আশু সমাধান কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ অবস্থা বিচার করিয়াও পাকিস্তান পাটের ব্যবসায় সম্বন্ধে সঙ্গত নীতি গ্রহণ না করায় ভারতীয় পাট শিল্পের পসার বজায় রাখিবার জন্য তাঁচা পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পোৎপাদনের খরচ হ্রাস করে ভারত সরকার ও শিল্পপতিগণ যথা হইয়াই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পাট সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সর্দার বাহাদুর গুরু দাতার সিং-এর ভাষণে ও তাঁহার বক্তৃতায় ব্যক্তিগত কুশল-পরিচয় হইতে আমরা ভারত সরকারের পাটচাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে যত্ন ও মনোযোগের প্রমাণ পাইয়াছি। অন্যপক্ষে চট কল সমিতির নির্দ্ধারিত নীতি ও সভাপতি মিঃ ওয়াকারের ভাষণ হইতে আশা করা যায় যে, মিল মালিকগণ নূতন পরিকল্পনা লইয়া পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বদ্ধপরিকর। উহার ফলে ভারতীয় চটশিল্প উহার ২৬ই কাটাইয়া পুনরায় সগৌরবে হস্তক উদ্ভোলন করিবে উহা খুবই আশা করা যাইতেছে। এখানে চট কলগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সাধারণভাবে আলোচনা করা যাক্। শ্রমিকের উচ্চ মজুরী ও কাঁচা মালের অন্যান্য দ্রব্যের জন্য চট কলগুলির উৎপাদন খরচ কোন প্রকারেই কমানো সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না; মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরে চট কলগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ১৫ ভাগ হইতে শ্রমিকের মজুরীর অংশ ২০ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। একেত্রে কাঁচা মালের দাম বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ৫৭ ভাগের স্থলে বর্ত্তমানে ৭৩ ভাগের উপরে উঠিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে উৎপাদন সর্ব্বা-পেক্ষা বেশী হইয়াছিল, কিন্তু ইদানীং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৭ সালে ৭,৮০,৯১৫ টন পট্টদ্রব্য রপ্তানী বাবদ ভারতের আয় হইয়াছিল ৮৯ কোটি টাকা। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮,৭২,০৭৭ টন পট্টদ্রব্য রপ্তানীতে ১০৪ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সেক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ ৯,২৫, ৬০০ টন পাটজাত দ্রব্য। এই বাবদ ঐ সালে ১৭০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত হিসাবে যে বিপুল আয় দেখা যায় তাহার অধিকাংশই শ্রমিকের মজুরী ও কাঁচা মালের জন্য খরচ হওয়ায় বর্ত্তমান সঙ্কটে কাজ চালাইবার জন্য মিলগুলির সংরক্ষিত মূলধনে টান পড়িয়াছে।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 'ট্রাইবিউনালের এওয়ার্ড' চট্‌শিল্পের উপর যে বোঝা চাপাইয়াছে, তাহাও যত কম নয়। মজুরদের ছুটির সুবিধা ও সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়া চট্‌শিল্পের বাৎসরিক খরচা ৪৪ কোটি টাকা এই 'এওয়ার্ড'-এর জন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ ওয়াকারের হিসাব অনুসারে কাঁচা মালের ৮৮ শতকরা ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আমদানীকৃত পাটে জিন্স পাটের বাহুল্যের ফলে এবার ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী দিতে হইয়াছে। শুল্ক বাবদ খরচ হইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা। ফলে, গত ডিসেম্বর হইতে চট্‌কলগুলিকে শতকরা ৩৮ ভাগ বোঝা মাথায় লইয়া চালু রাখিতে হইতেছে। উহার পিঠের উপর বোঝার মত চট্‌কলগুলির উপর চরম ধাক্কা পড়িল হেসিয়ানের দর গত অক্টোবর হইতে শতকরা ২৪ ভাগ কমিয়া যাওয়ায়। ইদানীং চটের দরও সেই অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। তাহার উপরে লগদ আদায়ের অসুবিধা। এই পরিস্থিতিতে চটকলগুলিকে পূর্ব্বের চেয়ে বেশীর চেয়ে বেশী টাকা প্রতি মাসে খরচ দিয়া চালু রাখিতে হইতেছে। এমতাবস্থায় মিল্ চালাইতে হইলে আর চল মাসের মধ্যে ভারতীয় চটশিল্পের মোট সংরক্ষিত জমা ২৭ কোটি টাকা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং অবস্থার প্রতীকারকল্পে মিলের উৎপাদন খরচা কমাইবার জন্য মিল মালিকগণের হস্তে সরকারের যথাসম্ভব ক্ষমতা অর্পণ করা আশু কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রযত্নে ভারতীয় ইউনিয়নে পাটের চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গত এক শতাব্দীর ইতিহাসে চটকলগুলির উৎপাদন বিষয়ে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অতীতের চিরাচরিত প্রথায় নিষ্ক্রিয়ভাবে এতকাল চট্ ও থলে উৎপাদন করিয়া মিল্ মালিকগণ দুনিয়ার এক প্রান্তের ক্রেতা প্রান্তে আসিয়া ওয়াল্ ষ্ট্রীটের লিখন ওয়ালের মুখামুখি দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। মানবগোষ্ঠীর অগ্রগতির সাথে সাথে রুচির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। শিল্পেও সেই পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। শিল্পের নূতন নূতন উৎপাদন পরিবেষণ করিতে এবং পুরাতন উৎপাদন বিষয়ে রুচির ভাল মোড়কেতে নূতন সমাবেশ, সুযোগের সদ্ব্যবহার, নূতন বাজার নির্দ্দেশ এবং আর্জ্জেন্টিনি বিক্রয়ে নূতন সম্ভাব্য বাজার প্রচার ও বন্ধক ব্যবস্থায় যথেষ্ট অসুবিধা নাই এবং মূলধনের বিনিময় হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু আমেরিকার চাহিদার আশা অনেক বেশী। তাহা মনে শিল্পকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে এ ছাড়া অন্য পথ নাই।

ভারতে পাট ফসল বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে আর. এস্. ফিন্‌লো ও কোম্পানির বিপুল গবেষণা জড়িত সুপারিশগুলির কথা। বস্তুতঃ, ভারতীয় ইউনিয়নে পাটের যোগ্য জমির অভাব নাই। ইদানীং কেন্দ্রীয় পাট সমিতির কর্ম্মকার সঙ্কটে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ও অধিকন্তু তাঃ পি. সি. সুর এ সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য নিবেদন সহকারে পরিবেষণ করিয়াছেন।

ফিন্‌লো কোম্পানির বিচার প্রসঙ্গে পাটের উপযুক্ত স্থান। বাংলার সঙ্গে প্রদেশের জল-বায়ু পাট ফসলের অনুকূল।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস :

৭৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ফোন : ব্যাঙ্ক : ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ

বড়বাজার, শ্যামবাজার,
ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট
ও খুলনা।

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আসামের তৈলভূমি, দক্ষিণ কানাডা এবং সোরাবজী, টাটা ও বাবেরীর খনীগুলিকে কিন্‌লো সাহেব আদর্শ পাটের জমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বঙ্গে প্রবেশ পাটের উপযুক্ত না হইলেও সুন্দর বেড় প্রস্থ অঞ্চল, পাঞ্জিপাড়া ও কর্ণাটকের দোঁআঁশ মাটির ভাগ এবং কলকাতার উচ্চ জমিতে পাটের ফলন ভাল হইবে। বন্যা-প্রবেশের সাগপুর তাঁহার মতে পাট চাষের উপযুক্ত।

উপরোক্ত বরণের জমি পশ্চিম-বঙ্গ, আসাম, বিহার, মাদ্রাজ, যুক্ত-প্রদেশ এবং বোম্বাইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিপুরা, কোচিন প্রভৃতি রাজ্যেও এই বরণের বিস্তৃত জমি আছে। প্রতি প্রদেশের আবাদযোগ্য পতিত জমি হইতে পাট চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি বাহির হইলে অধিক লাভ জনক চাষের পরিবর্তনের আশা কেন আঘাত পড়িবে না। প্রদেশ অনুসারে পাট চাষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা লইয়া স্ব-স্ব জমি বিভাগের যোগাযোগে জমি জরিপ ও নির্ধারণের কার্য্য সহজেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ উৎপাদন, সার ও উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ছোট-খাট জল বেড় ও জল-নিকাশের পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থায় পূর্ব্বঞ্চলের কয়েক শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের সাহায্য প্রদান করিলে একাধারে তাহাদের পুনর্ব্বসতি ও পাট চাষ বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হইতে পারে। নিজ নিজ অভিজ্ঞতাবলে খুব সহজেই ইহারা জমির গুণাগুণ বুঝিয়া আজিকার পতিত অনুর্ব্বর ভবিষ্যতে সো-ফসলীতে পরিণত করিয়া পাট ও অন্য সমস্যার সমাধানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সারা পৃথিবীতে গড়পড়তা বাৎসরিক ১১০ লক্ষ গাঁট পাট ব্যবহৃত হইত। তন্মধ্যে ভারতের ৪১'১ ও ৪১'২ লক্ষ গাঁট কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হইত। বাকী অংশের ৩'১ লক্ষ গাঁট কাঁচা পাট ও ১২'২ লক্ষ গাঁট পাটজাত দ্রব্য ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের সময় এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। তখনকার গড়পড়তা বাৎসরিক কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ১৫'৩ লক্ষ গাঁট এবং পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ৪৪'৮ লক্ষ গাঁট হিসাব করা হইয়াছে। এই সময়ে যুদ্ধের কারণে ভারতে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বেকার ১২২ এর স্থলে বাৎসরিক ৫১'১ লক্ষ গাঁট পাটজাত দ্রব্য এই সময়ে ভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। তখনকার কাঁচা পাটের বাৎসরিক ব্যবহার ৬ লক্ষ গাঁট হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় যুদ্ধকালে বাৎসরিক সর্ব্বমোট পৃথিবীর পাটের ব্যবহার ৭৪ লক্ষ গাঁট অথবা শতকরা ৫১ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল।

উপরোক্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের সময় ভারতের পাটের ব্যবহার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও রপ্তানীর পরিমাণ ½ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পরে ভারতের নিজস্ব চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পাইয়াছে, কেন না যুদ্ধই মিল চাহিদাবৃদ্ধির একমাত্র হেতু। বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাইবার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। পাশ্চাত্য পাট-ক্রেতাদেশগুলির ব্যবসায় বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঐ সকল দেশের পাটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও পাটের অন্যতম শিল্প সেখানকার বাজার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী প্রভাবিত করিয়াছে। উপরন্তু আমেরিকার ব্যবসার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কমিয়া যাইতে থাকায় এ দেশের শিল্পগুলি, বিশেষ করিয়া পাট শিল্প প্রতিযোগিতার আরো বাজারে টিকিতে পারিতেছে না। আমেরিকার বাজারের "রিসেসন্" বা "ডাউনটার্ন" পরিস্থিতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে পাটের জন্য ভারতের গবেষণা করা প্রয়োজন ও চট কলগুলির উৎপাদন ব্যয় কমানো দরকার।

এই সকল তথ্যের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিলে অদূর ভবিষ্যতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর বাৎসরিক পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁটের অধিক ধার্য্য করা চলে না। সে ক্ষেত্রে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ গাঁট ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ১০ লক্ষ গাঁট ধরিয়া লইলে পৃথিবীর সর্ব্বমোট বাৎসরিক চাহিদা ৭৫ লক্ষ গাঁট ধার্য্য করা যাইতে পারে।

১৯৪০ সালে বর্ত্তমান ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকায় ১২,৬০,০০০ একর জমিতে ৫৭,৭৯,০০০ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের এলাকায় ৪৪,১০,০০০ একর জমিতে ১,০৩,১০,০০০ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। উন্নত বরণের বীজ ও বীজ যোগাইতে পারিলে এবং চাষীকে প্রয়োজনানুরূপ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিলে একর প্রতি পাটের ফলন

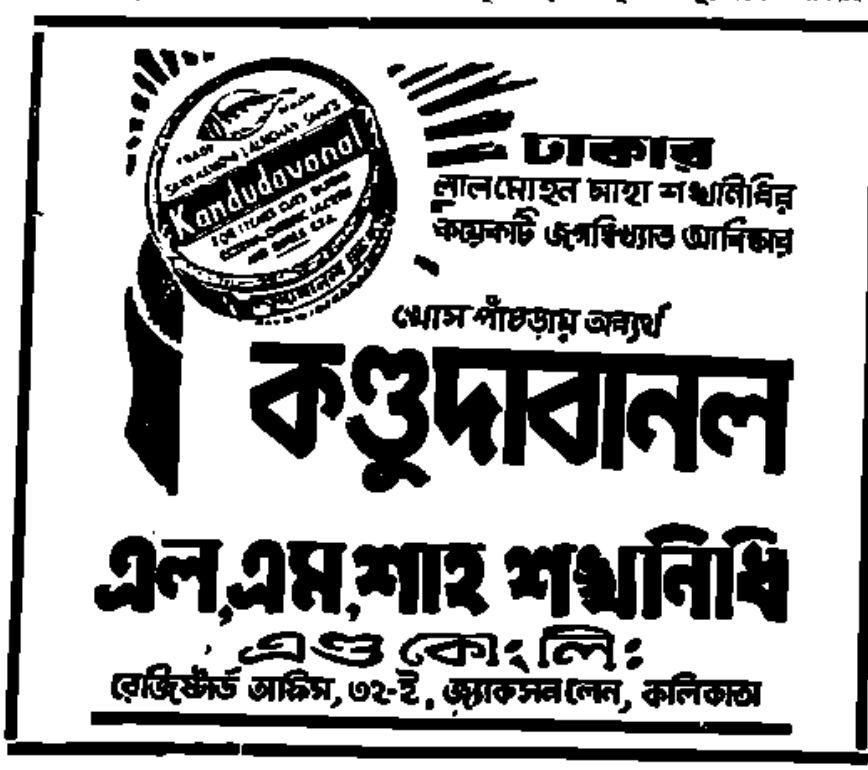

৩ পাট" আধা" করা যায়। সুতরাং ৭৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদনের লক্ষ্য উপরোক্ত ১২,৬৭,০০০ একর জমি ছাড়া আরও ১২,৩৩০০০ একর জমি পাট চাষের জন্য বাড়িয়া লওয়া দরকার। মোট ৪৩ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন করিতে পারিলে ভারতীয় ইণ্ডাস্ট্রির পাটের জন্য সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবে ভারতে যে এই পরিমাণ জমির অভাব হইবে না তাহা উপরের বিবরণ হইতে উপলব্ধি হইবে। বর্তমান দুনিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার প্রধানতঃ রপ্তানের উপরে নির্ভর করে। শিল্পজাত দ্রব্যের দর কমাইতে হইলে তাহা মূল্যে কাঁচা মালের যোগান চাই ও শিল্পোৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে যথাযথভাবে উৎপাদন খরচা কমানো দরকার। ভারতীয় পাটশিল্প তথা দেশের সর্বপ্রধান দুর্লভ মূল্য ও বৈদেশিক অর্থ আয়ের পথ সুগম করিতে হইলে অবিলম্বে পাট সমস্যার সমাধান আবশ্যক। সুতরাং পাট চাষ বৃদ্ধি ভারতীয় ইণ্ডাস্ট্রিসমূহের পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে?

শ্রীহেরম্বনাথ রায়

শ্রীলঙ্কার সরকার কিছুদিন পূর্বে এক ঘোষণায় সকলের জন্য কর্মসংস্থান সম্পর্কে সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। কয়েকমাস পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক এশিয়া সম্মেলনের অধিবেশনেও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মানুষের স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইলে সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তা থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন্ পথে— সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিরাপদ এবং সংসারযাত্রা নির্বাহের উপযোগী জীবিকার সংস্থান করাই সামাজিক নিরাপত্তার মূল ভিত্তি। সকলেই জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ পাইবে। কেহই বেকার থাকিবে না এবং প্রত্যেকেই ভালভাবে খাওয়া পরা ও থাকার উপযোগী বেতন পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা যতদিন সম্ভব না হইতেছে, ততদিন সামাজিক নিরাপত্তা একটা কথার কথা হইয়াই থাকিবে মাত্র। জীবিকা অর্জনের উপযোগী কাজের সংস্থান এবং সেই কাজের নিরাপত্তাই শুধু যথেষ্ট নয়। কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে বেকার হইয়া পড়া সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব নয়। কখনও কখনও অসুস্থ হইয়া পড়াও খুব স্বাভাবিক। আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং বার্ধক্যে কাজে অসমর্থ হইয়া পড়াও সাধারণ ঘটনা। সাময়িক বেকার অবস্থায় এবং অসমর্থ হইয়া পড়িলে সাংসারিক এবং চিকিৎসা উভয়বিধ ব্যয় নির্বাহের উপযোগী ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। মানুষ বিবাহ করে, পুত্র কন্যার জন্ম হয়, সংসারের খরচ বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত ব্যয়ের সহিত তাল রাখিয়া আয় বর্ধিত না হইলে কর্ম-

সম্ভোষ হওয়ার কোন অর্থই হয় না। তাহার মৃত্যুর পরে স্ত্রীপুত্রকন্যার জীবিকা নির্বাহের কোন কষ্ট যাহাতে না হয়, তাহাও মানুষ চায়। এই সকলের সুব্যবস্থা করার নামই সামাজিক নিরাপত্তা এবং তাহার প্রথম স্তর সকলের জন্য কাজ এবং ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা। সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সহিত সামাজিক নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কথাটা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে রচিত আটলান্টিক সনদেই সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তার কথা উল্লিখিত হয়। তার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তার কোন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চতুর্বিধ স্বাধীনতার কথাও আজ পর্যন্ত শুধু কথাতেই পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা কতখানি নিরাপদ করা সম্ভব তাহার আভাষ পাওয়া যায় বেভারিজ পরিকল্পনায়। কিন্তু এই পরিকল্পনাতেও ইংলণ্ডের সকল অধিবাসীর কাজ জুটিবার মত কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় নাই। স্যার উইলিয়ম বেভারিজ "Full Employment in a Free Society" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এই পুস্তকেও সকলেরই কাজ জুটিবে এমন কোন আর্থিক পরিকল্পনার আভাষ তিনি দিতে পারেন নাই। বেকার সমস্যা যে যথাসম্ভব হ্রাস করা যাইতে পারে, তাহাই এই পুস্তকে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সুবিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনাতেও সকলের কাজ জুটিবার মত ব্যবস্থা নাই। এমন কি যাহাদের কাজ জুটিবে তাহারা সকলেই যে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী মজুরী পাইবে, এইরূপ আভাস দিতেও তাঁহারা অসমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক এন এন অগ্রবাল তাঁহার 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' (The Gandhian Plan) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "The third principal of planning should be that every citizen of a nation is entitled to earn his or her livelihood by just and honourable means...we should not confuse livelihood with 'dole' and unemployment insurance." (P 6)। মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক অগ্রবালের রচিত এই পরিকল্পনার সহিত অন্যান্য পরিকল্পনার মৌলিক পার্থক্য আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। প্রচলন প্রচেষ্টার উপরই সমাজের ব্যাপক প্রচলন দ্বারা দেশকে নিয়ন্ত্রিত করিবার তিনি বিরোধী; তিনি বলেন করেন, "The Problem of unemployment and therefore of livelihood can be satisfactorily solved only when we realise that attainment of increased productivity with the help of efficient and labour-saving machine is not and should not be our goal." এই পরিকল্পনায় তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বাবলম্বী করার প্রস্তাব করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাপক কুটিরশিল্প গঠিয়া তোলার উপর এই পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা। গান্ধীবাদী অর্থনীতি লইয়া আমাদের দেশে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়কগণ যে দেশের কৃষি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যকে গান্ধীবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবেন, এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ভারতকে অভিদ্রুত শিল্পোন্নত করিবার জন্য তাঁহারা যদি প্রয়োজনীয় উন্নত ধরনের আধুনিক কলকব্জা সম্বলিত বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে আগ্রহশীল হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বর্তমান অনুকূল অতীতের কুটির-শিল্পে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতের মত বৃহৎ দেশের বিপুল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার্য পণ্য উৎপন্ন করা আবশ্যক। পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার্য পণ্য উৎপন্ন করিতে হইলে বৃহদাকার-শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহার এই যে, উন্নত ধরনের আধুনিক কলকব্জার ব্যবহার এবং 'রেশনেলিজেশন'-দ্বারা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও, সকল লোকের কর্মসংস্থান তাহাতে সম্ভব হইবে কি? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতেও শান্তির সময়ে সকল লোকের কর্মসংস্থান করা প্রভব হয় নাই, এই সত্য আমাদের অজানা নয়।

ব্যাপকভাবে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে সকলেরই কাজ জুটিবে, ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ কুটির-শিল্পে প্রত্যেকটি পণ্য তৈয়ার করিতে বহু সময় আবশ্যক হইবে। মোটামুটি অভাব পূরণের জন্যই প্রত্যেককেই যথেষ্ট খাটিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় কাহারও বেকার বসিয়া থাকা অসম্ভব হইলেও জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার আশা করা কঠিন। অধিকন্তু 'শার্টেন লাইফ' বা সামাজিক জীবন যাপনের নামে করিয়া শোচনীয় দারিদ্র্যকেই অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। প্রাক্-মুঘল যুগে ভারতের ঐশ্বর্য পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে দারিদ্র্যের গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম শ্রমবিভাগকে বংশগত করিয়া সকলের অন্নই কায়েমীভাবে ব্যবস্থা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সকলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্নবস্ত্রের সংস্থান তাহাতে হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম যে দুর্ভেদ্য জাতিভেদপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা আজও তাহার ফল ভোগ করিতেছি। যদি জীবিকা নির্বাহের উপযোগী মজুরী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সকলের কর্মসংস্থান হওয়ার কোন অর্থ হয় না। আবার পর্যাপ্ত মজুরি পাওয়াও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় পণ্য বাজারে না থাকে। সকলের অভাব মিটাইবার উপযোগী পণ্য ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধন করাও সম্ভব নয়।

ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও, এ কথা সত্য যে, বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এখনও অতীতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে পর্যবসিত হয় নাই। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছিল, যদিও বেকার সমস্যা একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। মানুষ যখন পরস্পরকে ধ্বংস করিবার কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই সময়ই হইয়াছিল বেকার সমস্যার সমাধান। বেকার সমস্যা সমাধানের এই উপায়টি অত্যন্ত বর্বরোচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিলেও, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘটিয়াছিল একান্ত অভাব। মানুষের সমস্ত পণ্য উৎপাদন শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল যুদ্ধ সম্ভারের যোগান যোগাইবার জন্য। মানুষের পণ্য উৎপাদন শক্তি যে কত বিপুল তাহার পরিচয়ও এই সময় আমরা পাইয়াছি। আমরা এই সময়েই দুর্ভিক্ষের ও দুষ্প্রাপ্যতার চাপ নিশ্চিহ্নরূপেই তখু আমরা সহ্য করি নাই। বাংলার ৩০ লক্ষ লোককে তেমন পঞ্চাশের মন্বন্তরই মৃত্যুকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্নের প্রয়ে করিতে হইয়াছে। মানুষ ধ্বংস করিবার কাজে নিযুক্ত হইয়া আমরা যদি বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে মানব জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলের কর্মসংস্থান করিতে আমরা অসমর্থ হইব কেন, ইহা কি সত্যই ভাবিবার বিষয় নয়? অথচ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতেই আমাদের দেশে বেকার সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মুখে অধিকতর প্রকট বেকার সমস্যার দিন আসিতেছে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। এদিকে ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদনও যুদ্ধের সময়ের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। পণ্যের উৎপাদন হ্রাসের বিভিন্ন কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে নীতি গৃহীত হইয়াছে দেশবাসী আগ্রহের সহিত তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবে। কিন্তু সকল লোকের জন্য কর্ম-সংস্থান ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে তাহার জন্য সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

অনেকে মনে করেন, সকলের জন্য কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা একটা সুবিদিত লক্ষ্যস্থল। আমরা এই লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু লক্ষ্যস্থল চিরকালই প্রান্তরেখা কলের মত আমাদের নিকট হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা এইরূপ অভিমত পোষণ করেন তাঁহাদের সহিত আমরা তর্ক করিব না। কিন্তু সকলের জন্য কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ নাই। সকল লোকের কর্মসংস্থানের মত সকলের অভাব মিটিবার উপযোগী পর্যাপ্ত পণ্য তৈয়ার হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কের আমাদের কথা এই যে, সম্ভব হউক আর যা-ই হউক চেষ্টা করিয়া দেখিতে বাধা কি? বস্তুতঃ-

এই জীবনধারাই হ'ক চিরন্তনী

আশ্বিনার আগমনের বেলা, গাঙে
ভরিত-পোকির পূর্ণঘট, নদীর নাচিয়ের
ও আগমন, মধুমাসিয়ার কলগীতের,
আর ভারি মাঝে সকলের পরিবারে
নব আশার সমারোহ—এক
অপূর্ব আনন্দের সুরে যেন আকাশ-
বাতাস, মানুষের মন মেতে উঠেছে।

শারদীয় পূজা বাঙ্গার শ্রেষ্ঠ উৎসব—
এই বিশেষত্বের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়
বাঙ্গার জীবন, বাঙ্গার সংস্কৃতি ও
চিরাচরিত ধারার সন্ধিকার পরিচয়।

এই আনন্দের দিনে সবাইকে আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার জানাই।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, যেমন কঠিন, তেমনি নমনীয়। [illegible]

পক্ষে লোকের কর্মসংস্থান এবং সকলের অভাব মিটাইবার উপযোগী পণ্য উৎপাদন উভয়ের মধ্যেই আন্তরিক সম্পর্ক। সকলের অভাব মিটাইবার উপযোগী পণ্য উৎপাদনের আয়োজন করিয়াই সকলের জন্য কর্মসংস্থানের চেষ্টা আমরা করিতে পারি।

মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা তাহার বৈষয়িক জীবনের উৎকর্ষতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা অবশ্য প্রায়ই শুনিতে পাই যে, 'Man cannot live on bread alone'. বাক্যটি এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, শুনিলেই মনে হয় বুঝি 'রুটি' অর্থাৎ খাদ্য না হইলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সেই আধ্যাত্মিক জাতি ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষ উপনিষদের ঋষি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইলেও, আহার করা প্রয়োজন। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর সমস্ত লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য পাইতে পারে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, বিশেষতঃ পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়ার উপযোগী খাদ্যশস্যের সঙ্কুলান করা অসম্ভব। কিন্তু এই কথাকে বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাই সঙ্গত, ইহাও স্বীকার করা কঠিন। 'Diminishing returns'এর বিধানটি অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, কৃষি ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি ব্যবস্থাকে 'Industrialised' বা শিল্পায়িত করিয়া পৃথিবীর সকল লোকের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন সংস্থান করা অসম্ভব নয়। অন্নের পরেই বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা বলিতে হয়। সকলের অভাব পূরণ করিতে হইলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হওয়া প্রয়োজন। শিল্প ব্যবস্থার যন্ত্রের ব্যবহার এবং 'রেশনেলিজেশন' দ্বারাই সকলের অভাব মিটাইবার মত বিনিময় উৎপাদন করা সম্ভব। এইখানেই আসে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের অভাব পূরণের সামর্থ্য নির্ভর করে তাহার ক্রয়শক্তির উপর। উৎপাদিত প্রচুর পণ্য ক্রয় করিবার উপযোগী ক্রয়শক্তি যদি জনসাধারণের না থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণের দিক হইতে পণ্যের প্রাচুর্য্য যেমন নিরর্থক, তেমনি উহাই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দেউলিয়া হওয়ার কারণে পরিণত হইবে। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত পণ্য শিল্পপতিগণ তৈয়ার করিতে রাজীই বা হইবেন কেন? তৈয়ারী সমস্ত পণ্য ক্রয় করিবার উপযোগী ক্রয়শক্তি জনগণকে দিতে হইলে সকলেরই কর্মসংস্থানও হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিজেশনে'র অর্থাৎ শিল্পায়নের ফলে বর্ত্তমানে যে সকল লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের অনেককেই, অন্ততঃপক্ষে অর্দ্ধেককে তো বটেই, কৃষি ব্যবস্থা হইতে সরাইয়া আনিয়া শিল্পে নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু শিল্পের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও এই আনুপাতিক (Relative) বর্দ্ধিত জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োজিত করা সম্ভব হইবে কি? যন্ত্রের ব্যবহার মানুষের শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। একমাসে উৎপাদিত পণ্য দুই মাসেও ব্যবহার করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে শ্রম সময় হ্রাসের কোন ব্যবস্থা এই পর্য্যন্ত হয় নাই। উন্নত জীবন যাপনের জন্য পরিশ্রম যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত অবসর। জীবনের অতিরিক্ত আনন্দধারাকে অব্যাহত রাখিতে হইলে জীবিকা অর্জ্জনের সময়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অবসরকাল বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থায় মানুষ যতই পরিশ্রম হওয়ার অভিশাপ হইতে যেমন মুক্ত থাকিবে, তেমন সম্ভব হইবে বেকার ও বাড়তি লোকদের কর্মসংস্থান করা। এখানে দক্ষশ্রমিক (skilled) ও অদক্ষশ্রমিক (unskilled) শ্রমিকের একটা জটিল প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়। আমাদের দেশে বেকার লোকের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও দক্ষশ্রমিক (skilled) শ্রমিকের অভাবও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। চাহুরী বিনিময় বা Employment Exchange বিভাগ সম্প্রতি এর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, বাংলার ইঞ্জিন ড্রাইভার, কোয়ার্যান, বয়লার মিস্ত্রীতা প্রভৃতি যোগাইতে নিপুণ হিসাবরক্ষক (accountants) এবং টেক্‌নিশিয়ানের, মাদ্রাজে ওভারসিয়ার, সার্ভেয়ার, রাজমিস্ত্রী, যুক্তপ্রদেশে কলের গার্ডদল চালক, রেফ্রিজেরেটর সংক্রান্ত শিল্পী, চালাই কাজের মিস্ত্রী প্রভৃতির অভাব। টেলোটাইপিষ্টের অভাব প্রায় সব প্রদেশেই। এই বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সকলের জন্য কর্মসংস্থান করিতে হইলে প্রথমেই দক্ষশ্রমিক ও অদক্ষশ্রমিক শিল্পীর পার্থক্য দূর করার চেষ্টা প্রয়োজন। প্রত্যেককেই কোন না কোন বিষয়ে দক্ষশ্রমিক করিয়া গড়িয়া তোলা আবশ্যক। দক্ষশ্রমিক ও অদক্ষশ্রমিক শিল্পীর পার্থক্য দূর হইলেও, যদি দক্ষশ্রমিক শিল্পীর বেকার বসিয়া থাকা নিবারণ করা সম্ভব হইবে না, যদি শিল্প ব্যবস্থায় শ্রমিকের কাজের সময় হ্রাসের ব্যবস্থা না থাকে। এইখানেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইব। শিল্পে দক্ষশ্রম নিয়োগের জন্য incentive ও motive প্রভৃতি কথার সহিত আমরা সকলেই সুপরিচিত। শ্রম সময়ের হ্রাস এবং অদক্ষ বৃদ্ধি incentive ও motive-এর পক্ষে কতখানি অনুকূল হইবে তাহা বলা কঠিন। আমরা গণতান্ত্রিক যুগে বাস করিতেছি। একথা যদি সত্য হয়, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের incentive ও motive-কেও গণতান্ত্রিক করা প্রয়োজন। ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ত, খনি এবং চালকশক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ এন. ভি. গ্যাডগিল কানপুরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "Within 10 years every home in an Indian village should have electric light and radio set." অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক পল্লীর প্রতিগৃহে বিজলী বাতি ও রেডিও প্রতিষ্ঠিত হইবে'। খুবই ভাল ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সুন্দর সহর এবং পল্লীর প্রত্যেকটি লোকের খাওয়া, পরা ও বাসগৃহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। জীবিকার নিশ্চয়তা ব্যতীত বিজলী বাতি ও রেডিও আমাদের ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে শিল্পে

পরিবর্তে অন্য আর কিছুই হইবে না। মৃত্যুর পরীর প্রতি গৃহে যদি বিজলী-বাতি ও রেডিও স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সকলের অন্ন কর্মসংস্থান, জীবিকার নিরাপত্তা বিধান এবং অভাব পূরণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া একটী সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করার প্রয়োজন সর্বপ্রথম।

এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন নীতি

অতুল বসু

নিঃস্বার্থ উদারতায় আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপকে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু এশিয়ার প্রতি সে বিরূপ কেন? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের এই পক্ষপাতিত্বের জন্য অনেকেই দুঃখ। আমেরিকাকে এশিয়া সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করাইবার জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। এই অঞ্চলের অধিবাসীর যে দারুণ দুঃখ দুর্দশা, তাহা দূরীভূত না হইলে বিশ্বের গণতন্ত্রের অভিভাবক রূপে আমেরিকার বিপুল দায়িত্ব সে পালন করিবে কিরূপে? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূনিবাসীর দুঃখমোচনকে আগ্রহ করিয়া বিজলী রাজনীতির বীজ যদি অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তাহা হইলে গণতন্ত্র তো নিরাপদ হইতে পারে না। কিন্তু ডলার ষ্টার্লিংয়ের একচেটিয়া-নির্ভরতা যেন সমাধানের [illegible] একটা যুক্তি তাহাও তাঁহারা [illegible]।

ট্রুম্যানের [illegible] ভাষণ—

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নূতন কংগ্রেসের [illegible] তাঁহার অন্যান্য দেশগুলির উন্নতি বিধানের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, বক্তব্য বিষয়বস্তুর পর্যায়ে [illegible] স্থান দ্বিল চতুর্থ। তাহার পর গত জানুয়ারীমাসে এক সাংবাদিক [illegible] তিনি বলেন যে, এই "চতুর্থ দফার" [illegible] একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে। [illegible] আট মাসের মধ্যে এই সুচিন্তিত পরিকল্পনার কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য দেশগুলির উন্নতির জন্য প্রধানত মার্কিন ডলারের [illegible] দেখিয়া ডলারশিপাসুরা নিরাশই হইয়াছে। [illegible] দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তরিকতার অভাবের দরুণ ইউরোপ সম্পর্কে আমেরিকার আগ্রহটা ফুলনা করা যাইতে পারে। মিঃ মার্শাল হার্ভার্ডে [illegible] তাঁর ইউরোপকে সাহায্য দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র চারিদিকে সে কি উৎসাহ, কি ব্যস্ততা! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিসে সম্মেলন আহ্বান এবং তাহার কি প্রয়োজন, সে সম্পর্কে তালিকা তৈয়ারীর ব্যবস্থা। সোভিয়েট রুশিয়া যদি তাহার দলবল লইয়া যোগদান না করিত, তাহা হইলে আয়োজনটা হয়ত আরও দ্রুত শেষ হইতে পারিত।

আমেরিকার নিকট হইতে প্রাচ্যে সাহায্য পাইবার জন্য যাহাদের আগ্রহ প্রবল, তাহারা হয় আমেরিকার উদারতায় অভিভূত; অথবা আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ জড়িত মনে করিয়া তাহার উদারতায় মহিমা ইচ্ছা করিয়াই প্রচার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে উদারতা বা মহানুভবতার স্থান নাই, সব স্বার্থের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক লেনদেন চলিয়া থাকে। এই স্বার্থটা হয় তাত্ত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, অথবা সম্ভাব্য সামরিক; অথবা একসঙ্গেই ত্রিবিধ স্বার্থই। বস্তুতঃ আমেরিকা তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ভবিষ্যৎ সামরিক প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়াই সর্বাগ্রে ইউরোপের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। এশিয়া সম্পর্কে [illegible] তাহার যে উদাসীনতা, তাহাও ইচ্ছাকৃত।

ইউরোপের সমস্যা অগ্রগণ্য কেন?—

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি প্রধানতঃ উদ্বৃত্ত, ইহারা এশিয়ার ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যের মালিক। ইহাদের বলবিক্রম প্রধানতঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সাম্রাজ্যের উপর ইহাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের [illegible] সম্পর্কে আমেরিকার আগ্রহ স্বভাবতঃ অধিক। মার্কিন সাহায্যের ও মার্কিন নেতাদের নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে এই প্রধানতঃ পুনঃসংস্থাপনের যে ব্যবস্থা, তাহাতে স্বভাবতঃ এই সব দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা মার্কিন উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সমতা লাভ করিবে। ইহাদের সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উপরও মার্কিন অর্থনীতির কর্তৃত্ব প্রসারিত হইবে। পশ্চিম ইউরোপের এই অঞ্চলের কথা স্মরণ করিয়াই আমেরিকা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে সংহত করিবার সমস্তটা বেসরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দেয় নাই; একেবারে সরকারীভাবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতেও ইউরোপের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে দাঁড়াইয়া রাখা আমেরিকার স্বার্থ। এখানকার সমাজ-ব্যবস্থা বিপন্ন হইলে আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে উহা নৈতিক বিপত্তি; ভবিষ্যতে বাস্তব বিপদের রূপও ধরিতে পারে। আর সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত—পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে এশিয়া অপেক্ষা ইউরোপের সামরিক গুরুত্ব অধিক। যন্ত্রের সমরই (Clash of machines) হইতেছে আধুনিক যুদ্ধ। সে যন্ত্র উৎপাদনের শক্তি নিঃসন্দেহে এশিয়া অপেক্ষা ইউরোপেরই বেশী। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণের সময় মিত্রপক্ষ মানিয়া লইয়াছিলেন যে, এশিয়ার সমস্যা অপেক্ষা ইউরোপের সমস্যা অগ্রগণ্য।

এশিয়া ও ইউরোপ সম্পর্কিত নীতি—

তবে, এশিয়া সম্পর্কে আমেরিকা উদাসীন নহে। বর্তমানে বিশ্বের বাজার যখন পূর্বাপেক্ষা বহু অংশ সঙ্কুচিত, পুঁজিবাদ-বিরোধী রাজনীতি শক্তি লাভ করার এই সম্ভাবনা আরও [illegible] পরিস্থিতির সম্ভাবনা যখন প্রবল, তখন প্রাচ্যের [illegible] সম্পর্কে আমেরিকার উদাসীন মনোভাব

নহে। উপরন্তু বর্তমানে ইহা সে নিঃসঙ্গতা (isolationism) ত্যাগ করে নাই; কঠোর বাস্তব তাহাকে এই নিঃসঙ্গতা ত্যাগে বাধ্য করিতেছে। এশিয়া সম্পর্কে আমেরিকা উদাসীন নহে বটে; তবে, ইউরোপ সম্পর্কে সে যেমন স্বীয় নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছে, এশিয়া সম্পর্কেও তাহাই সে করিতে চায়। ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে আমেরিকার যে নীতি, তাহাতে পশ্চিম জার্মানীর স্থান অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ, প্রবন্ধিষ্ণু অনুন্নত পশ্চিম জার্মানীর নেতৃত্বে অ-কম্যুনিষ্ট ইউরোপের অর্থনীতিকে সংহত করাই আমেরিকার উদ্দেশ্য। পশ্চিম জার্মানী এখন যে তিনটি বিজয়ী শক্তির কর্তৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান আমেরিকারই। এই অঞ্চলের প্রাক্-যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সঙ্ঘগুলি (International combines) পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সাহায্যে সমগ্র অ-কম্যুনিষ্ট ইউরোপের অর্থনীতিতে আমেরিকার পরোক্ষ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই চলিতেছে। বস্তুতঃ, ফুপ্‌স্, আইসেন্, আই, জি, ফারবেন্ প্রভৃতি ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মারফৎ অ-কম্যুনিষ্ট ইউরোপের অর্থনীতিক্ষেত্রে যাহাতে আমেরিকার কর্তৃত্ব বিস্তারিত হইতে পারে, আয়োজনটা সেইরূপই। এশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার পরিকল্পনাও অনুরূপ। তবে, এক্ষেত্রে কারণে এশিয়ার অর্থনীতিতে সরকারী-ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে সে অগ্রসর হইতেছে না। এশিয়াতেও পরাজিত ফাসিস্ত শক্তিকে সে তাহার অর্থনৈতিক এজেন্টরূপে ব্যবহার করিতে চায়। তবে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইউরোপ ও এশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলগত পার্থক্য আছে। সমগ্রভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত মূল ব্যবস্থাটা অক্ষুণ্ণ রাখাই যেমন আমেরিকার নীতি, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও সে তেমনি মূল অবস্থার পরিবর্তন চাহে না। প্রবন্ধিষ্ণু উন্নত ইউরোপ তাহার সেই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকুক; আর কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচা মালের ভাণ্ডারস্বরূপ এশিয়া তাহার পূর্ব গৌরব (?) অক্ষুণ্ণ রাখুক—ইহাই আমেরিকার উদ্দেশ্য। অবশ্য, কৃষিতে এবং কাঁচা মাল আহরণের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাহার আপত্তি নাই। অর্থাৎ, এশিয়ার কৃষি ট্রাক্টরে চাষ হউক, খনিজের সন্ধান আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিকাশিত হউক ইহাতে তাহার আপত্তি নাই; বরং সে তাহাই চাহে। কিন্তু এশিয়ার বিমানের ও জাহাজের ইঞ্জিন তৈয়ারী হইয়া বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির আয়ত্তের বাহিরে যেন কিছুতেই বিস্তৃত না হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য সংক্রান্ত জাতি সঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিশনের (United Nations Economic Commission for Asia and Far East) মার্কিন প্রতিনিধি ডাঃ গ্রাডি প্রভৃতি এই অঞ্চলে ভারি প্রমশিল্পের (heavy industry) প্রতিষ্ঠার বরাবর আপত্তি করিয়া আসিয়াছেন। এই অঞ্চলে হাল্কা ও আনুষঙ্গিক শিল্পের প্রতিষ্ঠায় জাপানের ভূমিকার কথাও আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি।

জাপানের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মার্কিন প্রভুত্ব—

ইউরোপে যেমন পশ্চিম জার্মানী, এশিয়ায় তেমনি জাপান আমেরিকার অর্থনৈতিক এজেন্ট। এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রমশিল্পে উন্নত এই দেশটি এখন সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত। এখানে কেবল নিয়মমাফিক জাপানীদিগকে গণতন্ত্রের পাঠ শিখা দেওয়া হইতেছে না। এখানকার অর্থনীতিক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রথমে জাপানের শিল্প-ব্যবসায়ে প্রভুত্ব আর্থিক সাহায্য আসিয়াছিল; এখন ক্রমেই মার্কিন মূলধন প্রত্যক্ষভাবে জাপানে বিনিয়োজিত হইতেছে। আমেরিকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জাপানীদের সহিত সংযোগে শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে। অবশ্য এই সহযোগে কর্তৃত্বটা মার্কিন ব্যবসায়ীদেরই। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ "জইবাৎসু" ভাঙিয়া দেওয়ার কথাটা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু উহার ফলে ঐ সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মার্কিন ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব কতখানি বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহার সন্ধান আমরা অনেকেই রাখি না। মিৎসুবিশির অর্দ্ধেকের বেশী শেয়ারের মালিক এখন ওরেঞ্জি চার্টার্ড ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল। মিৎসুইর শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার আজ জেনারেল ইলেক্ট্রিকের। সুমিতোমো কেমিক্যিল কোম্পানীর বহু শেয়ার ইষ্টার্ন-আফগান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের হাতে গিয়াছে। মিৎসুবিশি কার্যশিল্প কাইশা নামক জাহাজ কোম্পানীর বহু শেয়ার মার্কি জেনারেল ষ্টাক-আর্থার স্বয়ং ক্রয় করিয়াছেন। পোর্টস্ম্যাথ চুক্তিতে রিপাবলিকের সকলে এই মূলনীতি মানিয়া লন যে, জাপানের আক্রমণ-শক্তির হ্রাস করিবার জন্য তাহার সমরশিল্প কমাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান সম্পর্কে সে নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছে। জাপানের লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ যে সীমার মধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা প্রথমে স্থির হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া ঐ দুইটি সমরোপকরণের উৎপাদন অন্ততঃ চতুর্গুণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপানের সমস্ত এলুমিনিয়ম শিল্প আটুট রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; জাহাজ তৈয়ারীর ইয়ার্ডগুলি অক্ষত রাখা হইতেছে। এশিয়ায় জাপান আমেরিকার অর্থনৈতিক এজেন্ট এবং তাহার প্রধান সামরিক ঘাঁটী। অবশ্য, সাই বলিয়া জাপান সম্পর্কে মার্কিন অর্থনীতির উদারতা নাই। বর্তমানে জাপানের সমস্ত বহির্বাণিজ্য মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন। জাপানে পণ্য আমদানীতে একচেটিয়া অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। গত বৎসর রপ্তানীর তুলনায় আমদানী এত বেশী হয় যে, আমেরিকার নিকট জাপানের বাণিজ্যিক ঋণ দাঁড়ায় ১৭১ কোটী ডলার। এই আমদানীকৃত মার্কিন পণ্যের জন্য জাপানকে অত্যন্ত অসঙ্গত মূল্য দিতে হইয়াছে; অথচ তাহার রপ্তানী মালের মূল্য পাইয়াছে এক-তৃতীয়াংশে।

এশিয়ায় মার্কিন অনুচর জাপান—

যুদ্ধের পূর্বে এশিয়ার অর্থনীতিক্ষেত্রে জাপানের যে অবস্থা ছিল, উহাকে সেই অবস্থায় পুনঃসংস্থাপিত করিয়া এশিয়ার দেশগুলিকে কাঁচা মাল সরবরাহের ক্ষেত্র এবং তৈয়ারী পণ্য বিক্রয়ের বাজার করিয়া রাখা আমেরিকার উদ্দেশ্য। তবে, যুদ্ধের পূর্বে জাপান ছিল আমেরিকার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী; এখন সে হইবে তাহার একান্ত অনুগত অনুচর। যুদ্ধের পূর্বে এশিয়ার দেশগুলির কৃষিতে যে অনুন্নত প্রণালী

প্রবর্তিত হিল, তাহার যে কিছু পরিবর্তন ও উন্নতি প্রয়োজন, তাহা আমেরিকা অস্বীকার করে না। আমেরিকার পরিকল্পনার একটা নমুনা দেওয়া যাক। ফেলপ্রি কমিশনের "গ্রহ-বিভাগের" সুপারিশ অনুসারে আমেরিকা তুলা পাঠাইবে জাপানে, জাপান কাপড়ে তুলা প্রস্তুত করিয়া উহা সরবরাহ করিবে ইকোয়েসিয়ারে। ইহার মূল্য পরিশোধের জন্য ইকোয়েসিয়া তাহার খনিজ সম্পদ দেশন করিবে আমেরিকায়। মার্কিন পুঁজিপতিদিগকে এশিয়ার ব্যক্তিগত বাণিজ্যে এশিয়ার মূলধন নিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে অনেক দিন হইতেই। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক স্থৈর্য সম্বন্ধে কতকটা নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে এই মূলধন আসিবে। এই মূলধনে এশিয়ার ভারি শিল্প (heavy industry) গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই মূলধন বিনিয়োগের জন্য আমেরিকার লভ্যাংশ রপ্তানী সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ব্যবস্থা মার্কিন পুঁজিপতিরা দাবী করিবে। মার্কিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রতি ব্রুটেনের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে যে, বিনিযুক্ত মূলধনের শতকরা ১৭৫ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ মার্কিন ডলারে পাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

যক্ষ্মা রোগ ও যক্ষ্মা-নিবারণী টীকা—বি-সি-জি

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি

প্রাক্-যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে বৎসরে যক্ষ্মা-রোগজনিত মৃত্যুসংখ্যার হার ছিল ৫,০০,০০০ এবং ঐ সময়ে ২৫,০০,০০০ লোক যক্ষ্মারোগে দূষিত। অবিভক্ত বাঙ্গালা এবং কলিকাতার প্রতি বৎসর যথাক্রমে এক লক্ষ লোক ও তিন হাজার লোক মারা পড়িত—আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে চার লক্ষ এবং পনেরো হাজার। বর্তমানে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির উক্তি হইতে জানা যায়, যুদ্ধোত্তর ভারতে বাৎসরিক যক্ষ্মা-মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে [illegible] লোক মারা পড়িত, এখনে [illegible] করিয়া মৃত্যুমুখে পতিতহ হইতেছে। [illegible] যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিদের [illegible] অন্য অত্যাবশ্যি কতদূর কি ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে তাহা শুনিলে [illegible] হইতে [illegible] বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের (World Health Organisation) জনৈক [illegible] বিশেষজ্ঞ এবং ভারত সরকারের [illegible] বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ সি [illegible] বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে যক্ষ্মা রোগের [illegible] জন্য যেখানে [illegible] ৪,০০০ [illegible] ৫,০০,০০০ 'বেড'-এর প্রয়োজন সেখানে [illegible] চিকিৎসক' এবং 'বেড'-এর সংখ্যা [illegible] ১৫০ এবং ৭,০০০।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, চিকিৎসাব্যবস্থার অভাব, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাব এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—প্রধানতঃ এই চতুর্বিধ অভাব হইতেই এই রোগের প্রসার হইয়া থাকে। ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদের সভাপতি ডাঃ মুদালিয়র হাল বলিয়াছেন, যক্ষ্মা-প্রতিরোধক কর্মিবৃন্দের প্রধান কাজ হইবে—

(১) যক্ষ্মারোগের কারণ, প্রসার ও প্রতিরোধ বিষয়ে জনসাধারণকে সহজ সরলভাবে শিক্ষাদান করা। (২) যক্ষ্মা সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার ফলে লোকের মনে যে অহেতুক ভীতি ও রোগীর মনে নিরাশার সঞ্চার হইয়াছে তাহা সর্বাগ্রে দূরীভূত করা। মন হইতে ভয় এবং সংশয়কে তাড়াইতে না পারিলে সব প্রচেষ্টাই নিরর্থক হইবে। যক্ষ্মা 'শিবের অসাধ্য' রোগ নহে—প্রাথমিক অবস্থায় যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগও একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে নিরাময় করা যায়। (৩) রোগীর পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে অবহিত করা। কিন্তু রোগীকে পৃথক করা হইবে কোথায়? হাসপাতাল এবং যক্ষ্মাগারে তো নিদারুণ স্থানাভাব। সারা বাংলাদেশে পুরাপুরি ১০০০ বেডও যক্ষ্মারোগীর জন্য সংরক্ষিত নাই। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীকে তাহাদের নিজ নিজ বাসগৃহে তাহাদের পরিবারের মধ্যে থাকিতে হইবে। সুতরাং রোগীর ব্যবহার্য বাসনপত্র সমস্ত পৃথক করিতে হইবে এবং তাহার থুথু সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। একটি চাকমি দেওয়া পাত্রে খানিকটা লাইসল ঢালিয়া তাহাতেই রোগীর থুথু ফেলার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ডাঃ আর বি লিণ্ডিকোয়িস্ট এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আইস করিয়া পান সুপারি খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ পান সুপারিই আসলে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে বিরাট পিক্‌দানিতে পরিণত করিয়া যক্ষ্মারোগের প্রসারের সহায়তা করিয়াছে।

ডাঃ কেনার বলেন, প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের গুণাগুণের উপরেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব নির্ভর করিয়া থাকে। কোন দেশের কোথাও যখনও সাধারণের জন্য স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, উপযুক্ত বাসস্থান অথবা যোগাতানুযায়ী চাকুরী প্রভৃতি সংস্থান করা সম্ভব হয় নাই—সাধারণতঃ কেবল কাগজে-কলমেই এই ধরণের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এই রোগের আক্রমণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কেনারের মতে যাহারা উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহারা যতই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকুক না তথাপি তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মার আক্রমণ অল্পই ঘটিয়া থাকে। অনেকের ধারণা যে, ভাল কম্বল কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই যক্ষ্মার আক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু কেনার বলিয়াছেন এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত—কম্বলের পরিবর্তে দুধ, ডাল, মাংস প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। বিখ্যাত যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ব্রিল সিমবার্ণও বলিয়াছেন, "Great meat-eaters, if not alcoholic, rarely even in most unhygienic surroundings, become phthisical"—যাহারা অতি মাংসভোজী তাহারা যদি মদ্যপায়ী না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত

অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়াও তাহারা কদাচিৎ থাইসিসাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমাদের জাতীয় সরকার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা করিতেছেন - শ্রমিকদের জন্য পরিষ্কার বাসস্থান করিয়া দিবেন, কার্যভারমূলক জীবন-বীমার প্রবর্তন করিবেন, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, fair wages বা চলনসই মাহিনা দিবেন—অর্থাৎ তাহাদের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার এখন কিছু নাই যাহা করিতে বা করিয়া দিতে বিরত থাকিবেন। কিন্তু এসব সময়সাপেক্ষ—অন্ততঃ দশ-পনেরো বৎসর সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে বা বস্ত্রাগারে দরিদ্র শ্রমিক যা কেরানী দরিদ্রার মত আশ্রয়টুকুও পাইবে না, কারণ অগ্রাধিকার 'বেড' যারা আছে তাহা প্রভাবশালী বা বড়লোকের সুপারিশ ভিন্ন পাওয়া যায় না। আবার যেখানে একটিমাত্র ঘরে একটি সমগ্র পরিবারকে বাস করিয়া থাকিতে হয় সেখানে segregation বা রোগাক্রান্তকে বাঁচাইয়া বাস করিবার কল্পনা করাও যায় না। এতদ্ব্যতীত যক্ষ্মা রোগের কারণ ও প্রসার সম্বন্ধে অনেক নিরক্ষর লোকেরও সম্যক্ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু কেবল জানিলেই তো আর ইচ্ছামত কাজ করা যায় না। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন এবং সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত নিয়োমাইসিন কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল দিয়েছে বটে, তথাপি ব্যাসেলিয়া-প্রতিষেধক সুইমাইসিন বা প্যাসুড্রিনের মত অথবা টাইফাস-প্রতিষেধক ক্লোরো-মাইসেটিনের মত এমনতর যক্ষ্মা প্রতিষেধক ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানিগণের নিকট হইতে আমরা প্রতিদিনই এই রোগের কোন সুসারকারী আবিষ্কারের কথা শুনিতে পাইবার আশা করিতেছি। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন যক্ষ্মাকে ঠেকাইবার জন্য মাত্র দুইটি সহজ সরল পথ খোলা রহিয়াছে :—

১। সরকার কর্তৃক যথা সম্ভব সস্তায় সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালীর ভাতের পাতে একটু মাছ না পাইলে মুখে অন্ন রোচে না। সেই মাছের সের আজ ৪০-৫০ টাকা হওয়ায় তাহা তাহার পক্ষে বিলাসিতার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। ফলমূল চিরদিনই মহার্ঘ—সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সাধারণে পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু ভাত-ভাত, ডাল-ভাত এবং সময়ে সময়ে দুধ-ভাত জুটিবে না কেন? আমরা জানি ডালের মধ্যেও প্রোটিন রহিয়াছে। পূর্বাপেক্ষা আজ বন্যার প্রসার দ্বিগুণীকৃত হওয়ায় মূলে রহিয়াছে সাধারণ মানুষের সাধারণতম দৈনন্দিন খাদ্যেরও একান্ত অভাব। বড় বড় পরিকল্পনার কথা না আওড়াইয়া আমাদের সরকারের যদি সুবিধা হয় এবং দুধ কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন তাহা হইলে যক্ষ্মা নিরাময়ে না হউক যক্ষ্মা নিবারণে অন্ততঃ খানিকটা সাহায্য করিতে পারিবেন।

২। দ্বিতীয়তঃ বসন্তের ন্যায় যক্ষ্মানিবারণী কোন টীকার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা। যক্ষ্মা প্রতিরোধ ব্যাপারে এইটিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। আমরা দিনের পর দিন এই মহাবিকারের জন্য উন্মুখ থাকিয়াছি। যক্ষ্মা নিরাময়ক ঔষধের প্রয়োজন অবশ্য খুবই জরুরী, তথাপি নিরাময় অপেক্ষা নিবারণ অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সম্প্রতি যক্ষ্মানিবারণী টীকা বি-সি-জি-র আবিষ্কারে আমাদের এতদিনের আশা ফলবতী হইয়াছে।

কলিকাতা ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬-এর ষ্টেটস-ম্যান পত্রিকায় সুইডেন কর্তৃক যক্ষ্মা নিবারণী টীকা বি-সি-জি আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করিতে গিয়া ষ্টেটসম্যান লেখেন, "গত ৩১শে আগষ্ট দিল্লী হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, ভারতবর্ষে যক্ষ্মা মৃত্যুর সংখ্যা পূর্বে যেখানে বৎসরে পাঁচ লক্ষ ছিল, আজ সেখানে তাহার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির পরে সুইডেনের এক সংবাদে ষ্টেটস-ম্যানের পাঠকবৃন্দ অবশ্যই উল্লসিত হইবেন যে, এই ভয়াবহ রোগ বি-সি-জি টীকা ব্যবহারের দ্বারা নিশ্চিহ্নরূপে অবলুপ্তি করা যাইতেছে। ...গো-বসন্ত-জীবাণু হইতে এই টীকা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হয় এবং তাহা মানব দেহে জীবন্ত প্রবেশ করানো হয়।...গত বৎসর (অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে) কেবল সুইডেনেই ১,১২,৫০০ লোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই টীকা লইয়াছে। ...আশা করা যায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুইডেনে আর একটি লোকও যক্ষ্মায় মরিবে না।

নিউজ ক্রনিকল-এর বিজ্ঞান-সম্পাদক রিচি-কালেডার বলিয়াছেন, ষ্টিটবারকুলোসিসের রোগী প্রত্যুহ হইল সামাজিক পদ্ধতিতে নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন—নিরাময় নহে—অর্থাৎ রোগকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করা। আর একমাত্র বি-সি-জি-র পক্ষেই তাহা কার্যকরী করা সম্ভব।

বি-সি-জি'র পুরা নাম ব্যাসিলাস্ কলমেট গুয়েরিন (Bacillus Colmette Guerin) অর্থাৎ আবিষ্কারকদ্বয়ের নামেই টীকার নাম। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের কলমেট গো-বসন্ত-জীবাণু হইতে এই টীকা সর্বপ্রথম প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। ইহার পর দীর্ঘ ১৩ বৎসর প্রাণিদেহের উপরে সকল পরীক্ষা চালাইবার পর সর্বপ্রথম ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলমেট মনুষ্যদেহে এই বি-সি-জি প্রয়োগ করেন। দেখা গেল মাত্রা ঠিক থাকিলে বি-সি-জি হইতে ক্ষতির কোনরূপ সম্ভব নাই। ১৯২১ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ অবধি বি-সি-জি কেবল নবজাত শিশুদের প্রদান করা হইত, এবং তাহার পর ধীরে ধীরে কিশোর এবং তরুণ বয়স্কদের দেওয়া হইতে লাগিল। ১৯৪৮-এর মধ্যে স্কেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেনের দশ লক্ষ লোক এই টীকা লইয়াছে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং রাশিয়াতেও এই যক্ষ্মা-নিবারণী টীকার ব্যবহার বেশ আলোড়নেই চলিতেছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলিও এ সম্বন্ধে তৎপর ও মনোযোগী হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিবে, বি-সি-জি যদি সত্যই ফলপ্রদ হয় এবং সত্যসত্যই যদি উহার অন্তরতর প্রভাব না থাকে, তাহা হইলে পাশ্চাত্যের দেশগুলি উহা গ্রহণ করিতে এরূপ মন্থরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে কেন? আসলে যক্ষ্মা টীকা বি-সি-জি'র কার্যকারিতা সম্বন্ধে মন হইতে ভয় ও সন্দেহ এতদিন দূরীভূত হয় নাই। ইহার উপর একটু অসতর্কতার ফলে—একই ফুটন-যন্ত্রে (incubator) রক্ষিত গো-বসন্ত-জীবাণুর কাদু-চারের পরিবর্তে প্রকল্পে মনুষ্য-বসন্ত-জীবাণুর টীকা প্রস্তুত হওয়ায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লুবেকের টীকাপ্রাপ্ত সকল শিশুই যখন দুরন্ত বসন্তাক্রান্তে আক্রান্তদের মধ্যে প্রাণ হারাইল, তখন সর্বত্রই বি-সি-জি সম্বন্ধে গভীর ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। আমেরিকার পেডিক বি-সি-জি বর্জন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এজন্য বি-সি-জি দায়ী নহে—দায়ী ডিপ্লি

বিধি অসাবধানতাবশতঃ গো-বসন্ত জীবাণুর সহিত মনুষ্য-বসন্ত জীবাণুর কালচার একত্রে রাখিয়াছিলেন এবং গো-বসন্ত টীকার পরিবর্তে মনুষ্য বসন্তটীকা ব্যবহার করিয়াছিলেন এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় কতখানি সাবধানতা সহকারে কাজ করিতে হইবে।

১৯৪৮-এর "আমেরিকান রিভিউ অব টিউবারকুলোসিস" নামক পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় যে ডি আর্বলন কর্তৃক ১৯৩৫ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের উপর বি-সি-জি টীকার ফলাফল সম্বন্ধে যে তথ্যটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই মূল্যবান। কিন্তু সে তথ্য উল্লেখ করিবার পূর্বে কি ভাবে এই টীকা প্রদান করিতে হয় তাহা জানিতে হইবে।

টীকার উদ্দেশ্য হইল primary infection বা প্রাথমিক সংক্রমণ। যাহাদের রক্তে বসন্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই তাহাদের রক্তে জীবন্ত গো-বসন্ত-জীবাণু সংক্রমিত হইলে চার হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহারা বসন্ত প্রতিরোধক ক্ষমতায় অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু টীকা দিবার পূর্বে যাহাদের বসন্ত-প্রবণ বলিয়া জানা যায় অর্থাৎ টীক রোগরূপে দেখা না দিলেও যাহাদের রক্তে বসন্ত-জীবাণু অবস্থান করে, তাহাদের টীকা দিলেই কিন্তু বিপরীত ঘটিবে। অনতিবিলম্বেই তাহারা বসন্ত-কবলিত হইবে। সাধারণতঃ শিশুকালে পনেরো কুড়ি বৎসরের উর্ধ্ব বয়স প্রায় সকলেই বসন্ত-প্রবণ হইয়া থাকে, তাই শৈশব অথবা কৈশোরেই বি-সি-জি টীকা গ্রহণের প্রশস্ত সময়। এইখানে আমরা একটা সন্দেহ দূর করিয়া রাখিতেছি। বসন্ত-প্রবণ হইলেই অর্থাৎ দেহে বসন্ত জীবাণুর অবস্থিতি ঘটিলেই যে তাহাকে বসন্তে ভুগিতে হইবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, যদি যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহা হইলে এই প্রাথমিক বসন্ত-জীবাণু বহুক্ষেত্রেই চিরকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে—কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশেই তাহা দুরন্ত রোগরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। অনেক দীর্ঘজীবী শতায়ু ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তাহাদের দেহে বসন্ত-জীবাণু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

গো-বসন্তজীবাণু জীবন্ত অবস্থায় মনুষ্য-রক্তে সঞ্চালিত হইলে সেই রক্তের ধীরে ধীরে ছয় সপ্তাহের মধ্যে immunity বা নিরোধক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। ইহার পর পুনরায় মনুষ্য-বসন্ত-জীবাণুর আক্রমণ ঘটিলেও বসন্তরোগে কাবু করিতে পারে না। কিন্তু গো-বসন্ত-জীবাণুর দ্বারা প্রাথমিক সংক্রমণ না ঘটিয়া যদি সরাসরি মনুষ্য-বসন্ত-জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে তাহা হইলে অতি সহজেই বসন্তরোগ মৃত্যুর কারণরূপে দেখা দেয়।

বসন্ত-প্রবণ বয়ে এইরূপ ৩০০১ জন উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের লইয়া পরীক্ষা সুরু হয়। ইহাদের মধ্যে ১৯৩৬-৩৮ সালে ১৪৫০ জনকে টীকা দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ১৪৪৭ জনকে টীকা না দিয়া পরীক্ষা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেখা যায় টীকাপ্রাপ্তদলের মধ্যে যেখানে বসন্ত-মৃতের সংখ্যা এতদিনে দুই হইয়াছে সেখানে অপ্রাপ্ত টীকাদলের ৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সময়ে ইহাদের ১৬২টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই নবজাতকদলের মধ্যে ১২৩ জনকে বি-সি-জি টীকা দেওয়া হয়। দেখা যায় টীকাপ্রাপ্ত নবজাতকদলের একজনও বসন্তে মরে নাই, অথচ যে ৩৯টি নবজাতককে টীকা দেওয়া হয় নাই তাহাদের সাতজনের বসন্তে মৃত্যু হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বসন্ত-মৃতের হার ভারতবর্ষের চার-

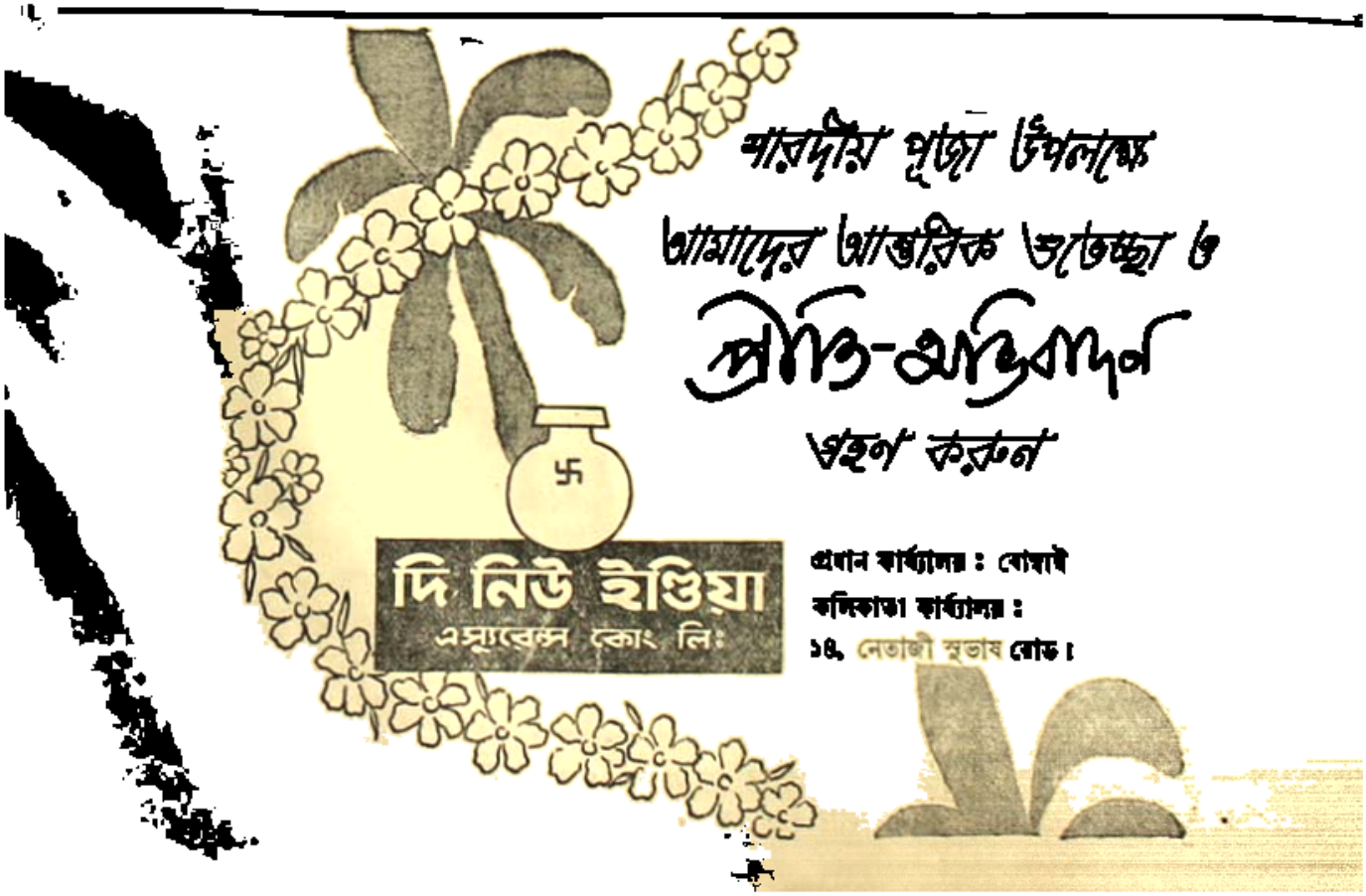

ভয়ের বেশী। অবশ্যে দীর্ঘ ছুটি বৎসর ধরিয়া বি-সি-জি টীকা প্রদান করিয়া হিসাবের দেখানে যক্ষা-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের যক্ষা-বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা ডাঃ ফোহানের মতে বলিয়াছেন, প্রাথমিক সংক্রমণ যে পর্যন্ত না নিরোধ শক্তি অর্জন করে, অর্থাৎ বি-সি-জি টীকা দেওয়ার ছয় সপ্তাহ অবধি, টীকা প্রাপ্ত শিশু বা তরুণকে তাহার মাতাপিতা ও পরিবারবর্গ হইতে একেবারে তফাতে রাখিতে হইবে। কারণ পরিবারের মধ্যে যদি কাহারও চাপা (suppressed) যক্ষা থাকে তাহা হইলে সেই প্রাথমিক অবস্থায় উহার সংক্রমণের ফল মারাত্মক হইবে—অথচ অল্প লোকে মনে করিবে বুঝি টীকা দেওয়ার ফলেই শিশুটি অকালে প্রাণ হারাইল—লোকে বি-সি-জির কার্যকারিতায় সন্দিহান হইবে। ছয় সপ্তাহ পরে টীকাপ্রাপ্ত শিশু পুনরায় স্বচ্ছন্দে পরিবারবর্গের সহিত মিশিতে পারে।

কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের গত ১৮ই জুন, ১৯৫৮-এর প্যারিস অধিবেশনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যেখানে সর্বসাধারণকে টীকা (mass vaccination) দিবার ব্যবস্থা করা হইবে সেখানে পৃথকীকরণের তেমন আবশ্যকতা নাই।

নরওয়ে আজ এই টীকা আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করিয়াছে। ডেনমার্ক এবং সুইডেনে যক্ষা প্রবণ নহে এইরূপ লোকেরা মনে ভুলে স্বেচ্ছায় টীকা লইতেছে। ভারতবর্ষেও আজ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে এবং গবর্নমেণ্টও বিশেষ তৎপর হইয়াছেন।

কিন্তু দেশের লোক যখন উপযুক্তচিত্তে —স্থির ভরসা বি-সি-জিকে বরণ করিতে যাইতেছে, সেই সময়ে বি-সি-জি সম্বন্ধে কয়েকটি বিরুদ্ধ মন্তব্যও শোনা গেল। ব্রিটেনের জনস্বাস্থ্য গবেষণাগারের পরিচালক ও অধ্যাপক ডাঃ জি এস উইলসন বলিলেন, যক্ষা নিবারণে বি-সি-জির ফল কতখানি এবং তাহা ব্যবহারে নিরাপত্তা সম্বন্ধে কতখানি নিশ্চিত হওয়া যায় তাহা এখনও অনুশীলনসাপেক্ষ। গত ১৩ই এপ্রিল '৫৯ তারিখে ব্যাঙ্গালোর হইতে আমাদের ডাক্তার বিনোদচন্দ্র রায়ের অনেকটা অনুরূপ মন্তব্যই করিয়াছিলেন। তাঁর মন্তব্যের অবশ্য পরে বলিয়াছেন যে, সাইকারি ভাবে এই টীকা প্রবর্তন হইলে যক্ষার প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে পারে এবং নির্ভরে বি-সি-জি টীকা লইতে পারা যায়। কিন্তু তখন হইতেই সাধারণ মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) বি-সি-জি জীবন্ত টীকা—প্রস্তুতের সাতদিনের মধ্যেই জীবাণুগুলির অধিকাংশ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ইহা প্রস্তুত করিবার সময়েও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। (২) গো-যক্ষা জীবাণুর সকল strain বা ধারার তীব্রতা সমান নহে। কম টীকা অতি উগ্র হইলে যেমন ক্ষতিকর হইবে, তেমনই তাহার তীব্রতা যথোচিত না হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না। (৩) এই টীকার ফলে যে ক্ষত হয় তাহা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া থাকিতে পারে এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে পুঁজ হইতেও দেখা যায়। (৪) যক্ষাক্রান্ত মাতার নবজাত শিশুকে দুগ্ধপান হইবার পরে সঙ্গেই পৃথকীকৃত করিতে হয়—টীকা দেওয়ার অন্ততঃ ৬ সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইলে মাতাকে ফিরাইয়া দেওয়া চলে না—কারণ ইহাতে টীকা কার্যকরী হইবার পূর্বেই সে মাতার যক্ষাজীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। (৫) নবজাত শিশুকে মাতার নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখিলে অনেক সময়ে নিউমোনিয়া প্রভৃতি অন্য সাংঘাতিক উপসর্গ ঘটিতে পারে। (৬) এই টীকা একবার মাত্র লইলেই চলে না—নির্দিষ্ট সময়ান্তর ইহা বারে বারে গ্রহণ করিতে হয়। (৭) দেশভেদে এবং পাত্রভেদে রোগ-জীবাণুর তীব্রতারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার যক্ষা-জীবাণু এবং গ্রেট ব্রিটেন বা ভারতের যক্ষা-জীবাণু এক নহে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় যেখানে সাধারণতঃ ১৮-২০ বৎসর বয়সের পূর্বে কেহ প্রাথমিক সংক্রমণ বা যক্ষা-প্রবণতা আয়ত্ত করে না, সেখানে ভারতবর্ষে এবং গ্রেট-ব্রিটেনে অতি অল্প বয়সেই এই যক্ষা-প্রবণতা অর্জন করিতে দেখা যায়। তাই দুইদেশে যে ধারা এবং যে মাত্রা ব্যবস্থার করিয়া অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র ধারায় হুবহু সেই মাত্রা অতিরিক্ত প্রবর্তিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বয়সের তারতম্যানুযায়ী সম্ভবতঃ মাত্রারও তারতম্য ঘটা সম্ভব, কিন্তু দুইদেশের নির্দিষ্ট পন্থা ও মাত্রা ব্যতীত বর্তমানে আমাদের অন্য কিছু জানা নাই। ও-দেশের জীবাণু এদেশে যে কিরূপ কার্যকরী হইবে তাহাও বলা যায় না। (৮) এদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথোচিত বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া এই জীবাণু তৈয়ারী ও প্রস্তুত হইতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে দেশবাসীর মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগিতে পারে। কর্পোরেশন ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার, নার্স প্রভৃতির কর্তব্যজ্ঞানের যেরূপ প্রখর পরিচয় মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাতে এ সন্দেহ নিতান্ত অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

এতগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকিলেও প্রমাণের ছুরিদ্বারা বি-সি-জি'র যক্ষা-নিবারণী শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া লইতে হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অনেক যক্ষা বিশেষজ্ঞ ও নিউ-ইয়র্কের কার্নেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ একনার মায়ার বলিয়াছেন, দীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল যক্ষারোগ নিবারণের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে দৃঢ়তার সহিত তিনি বলিতে পারেন, (১) বি-সি-জি টীকা সম্পূর্ণ নিরাপদ—ঐ টীকা গ্রহণ করিলে যে যক্ষা হইতে পারে সে ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। (২) আমেরিকায় এই টীকা বহুপরিমাণে যক্ষা-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করিয়াছে। (৩) আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে এই টীকা সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন ও ব্যাপকতামূলক প্রবর্তন কেবল এইজন্যই চলিতেছে না যে, সেখানে তাহার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। এতদ্ব্যতীত বহু পূর্ব হইতেই তদ্দেশে সানাটরিয়াম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। (৪) এই টীকা যদিও নিরাময়ক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তথাপি ইহার ফলে যে শিশুরা কেলিবার সময়টুকু পাওয়া যাইবে সেই সময়ে অন্যান্য সানাটরিয়াম ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ইহার স্বপক্ষে আরও বহু যুক্তি আছে। (৫) কোন টীকা বা কোন ঔষধই কখনও নিবারণ বা নিরাময় সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত গ্যারান্টি দিতে

পারে না। বি-সি-জি টীকা সেক্ষেত্রে বসন্ত নিবারণ সম্বন্ধে শতকরা ৮০ ভাগ গ্যারান্টি নিঃসন্দেহে দিতে পারে। (৫) মাত্র চার হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ইহার নিরোধ শক্তি জন্মায়। (৭) পুনঃকীরণেরও আবশ্যক নাই। (৮) কিন্তু যেখানে মাতা বসন্তাবোগ-গ্রস্ত বলিয়া জানা যায়, সেখানে ডাক্তারে কি স্বভাবতঃই রোগাক্রান্ত বাঁচাইবার জন্য নবজাতককে তফাতে রাখিবার নির্দেশ দেয় না? ইহাতে বি-সি-জি'র ত্রুটি কোথায়? (৯) টীকা গ্রহণে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ টীকা প্রদানের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যাহাকে টীকা দেওয়া হইবে সে বসন্ত-প্রবণ কিনা। যদি বসন্ত-প্রবণ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে টীকা দেওয়া হইবে না—যাহার বসন্ত-প্রবণতা নাই কেবল তাহাকেই টীকা দেওয়া হইবে। (১০) সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদিগকে এই টীকা দিতে পারিলে কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোকই বসন্তাক্রান্ত হইয়া পড়ে। (১১) এই টীকা প্রদানের ফলে বসন্ত-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগ কমিয়া যাইবে। (১২) এদেশে বি-সি-জি টীকা প্রস্তুতিতে, সংরক্ষণে ও ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিশুদ্ধতা যে বজায় থাকিবে তাহা ভারতের স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীযুক্তা রাজকুমারী অমৃত কাউরের উক্তি ও বিশেষজ্ঞ-উপদেষ্টা-কমিটির সভ্যবৃন্দ যাঁহারা আমন্ত্রিত ও নিযুক্তি হইয়াছেন এবং যাঁহারা উপদেষ্টা হিসাবে রহিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে বি-সি-জি টীকা সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি। বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ভারত-গবর্মেণ্ট যে বি-সি-জি বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—প্রত্যেকটি দলে আছেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং দুই-জন নার্স। ভারত সরকার ইহাদের আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৫০ অবধি ভারতবর্ষে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, যাহাতে এই সময়ের মধ্যে এদেশ হইতে অন্ততঃ ৬০ অথবা ৬৫টি দলকে যথোচিত শিক্ষিত করিয়া বি-সি-জি বিশেষজ্ঞ রূপে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। এই দুইটি দল বর্তমানে বাঙ্গালোর, দিল্লী, বারাণসী, পুনে, বরোদা এবং কলিকাতায় কাজ করিতেছেন।

১১ই আগষ্ট ১৯৪৮ বসন্তাপল্লীতে ভারতের সর্বপ্রথম বি-সি-জি কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়—রাজকুমারী অমৃত কাউর ইহার উদ্বোধন করেন। ইতিপূর্বে কোপেনহেগেন হইতে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের ল্যাবরেটরী সরঞ্জামপত্র আমদানী করা হয়। ভারত গবর্মেণ্ট এজন্য ২,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করিয়া রাখেন। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০০টি দল গঠিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। বছরে এক লক্ষ লোককে টীকা দিতে পারা যাইবে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রথমে ২০০টি কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০,০০০ ছেলেমেয়েকে এই বি-সি-জি টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-বিভাগের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের জনস্বাস্থ্য ডিরেক্টরের পরিচালক মহাশয় সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, গত এপ্রিল '৪৯ হইতে কলিকাতার উচ্চ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বসন্তপ্রবণতা নিরূপণ করা হইতেছে। যাহারা বসন্তপ্রবণ নহে কেবল তাহাদেরই এই টীকা দেওয়া হইয়াছে। তিন মাসের মধ্যে কলিকাতার বিদ্যালয়গুলির দুই হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে এই বসন্ত নিবারণী বি-সি-জি টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

আদায়ীকৃত মূলধন　৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল　২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

—শাখাসমূহ—

কলিকাতা	দিল্লী	বোম্বাই	মাদ্রাজ
বালিগঞ্জ	লক্ষ্ণৌ	কলবাদেবী	নাগপুর
ভবানীপুর	এলাহাবাদ	ভাণ্ডঘাট রোড	নাগপুর সিটি
বড়বাজার	কাটরা	আহমেদাবাদ	অমরাবতী
ক্যামিং ষ্ট্রীট	বেনারস	আজমীঢ়	জব্বলপুর
হাটখোলা	পাটনা	আগ্রা	জব্বলপুর ক্যাণ্টঃ
হাইকোর্ট	গয়া	কানপুর	রায়পুর
কালীঘাট	কটক	মেইন রোড	চট্টগ্রাম
ডালহাউসী	আসানসোল	বেরিলী	ঢাকা

লণ্ডন এজেন্টস : মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়।

"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।

ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় ট্রেডিং চুক্তি অনুসারে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে এবং ভারতের বৈদেশিক ক্ষেত্রে অনেকটা সমতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অত্যাবশ্যক নানারকম পণ্য সম্পর্কে এই দুইটি দেশ পরস্পর নির্ভরশীল। তবে, ভারতবর্ষের নির্ভরতা অনেক বেশী। ভারতে তৈয়ারী পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, অভ্র ও বিবিধ খনিজ পদার্থ চালান একেবারে অপরিহার্য্য। আবার বিপরীত দিক হইতে যন্ত্রপাতি, কাগজ, রাসায়নিক, নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং আরও বহু জিনিষ না আসিলে ভারতের কলকারখানা ও গার্হস্থ্যজীবন অচল হইয়া উঠে। প্রগতিমূলক কার্য্যসূচীগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবর্ত্তন করার উপরই এই দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। তৎসম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অপরিহার্য্য; যাত্র সেইখানেই অনাবশ্যক বিলম্ব বাতিরেকে ও ছাড়া দরে যন্ত্রাদি পাওয়া যাইতে পারে। তথাকার সস্তান দরে ও তাড়াতাড়ি অন্য কোন অঞ্চল হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি পাওয়া অসম্ভব। সেজন্য এদেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করাই ভারতের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু সম্প্রতি চুক্তি অনুসারে ভারতীয় বাণিজ্য দপ্তর সে পথে অন্তরায় বিস্তার সৃষ্টি করিয়াছেন।

সরকারী অদূরদর্শিতা

বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে অযথাসত সরকারী নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে মাসাধিক কাল দেশের অন্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৬ সনের প্রথমার্দ্ধে পঞ্চম ভূতপূর্ব আবদাতন্ত্র সরকার কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার পণ্য সম্পর্কে দেশে একটা বিরাট ঘাটতি ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রয়োজনের সহিত তুলনায় একটা নগণ্য অংশও আমদানী করিতে দেন নাই; অন্য দিকে ফুটবলের ও অন্যান্য বিত্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভারতে প্রকাশ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহের একটা মোটা অংশ রপ্তানী করিয়া অত্যন্তরীণ ঘাটতি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এত চড়িবার মূল কারণগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৬ সনে সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্বর্ত্তী মন্ত্রিসভা গঠনের পরে বাণিজ্য-নীতি সংশোধিত হয়। সরকার স্থির করেন যে, মূল্য হ্রাসের উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে আমদানী বাড়ানো হইবে। সে সময় উৎপাদনকারী দেশগুলিতে খরিদ্দারের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি দেশই সর্ব্বাগ্রে মাল কিনিতে উদ্‌গ্রীব, দর খুবই চড়া, মালও তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইত না। সেজন্য সংশোধিত নীতি কার্য্যকরী করিতে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু ভারত সরকারের কর্ণধারগণ সেরূপ সময় না দিয়া, মাত্র কয়েক মাস পরে, ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে পুনরায় আমদানী হ্রাসের সিদ্ধান্ত করেন।

১৯৪৭ সনের শেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমদানী সম্পর্কে ক্রমাগত ওলটপালটের ফলে ভারতবর্ষ আর এক দফা অতিপ্রস্ত হইয়াছে। ঐ বৎসর বহির্বাণিজ্য বাবদ চলতি খাতের সহিত তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য আমদানীর জন্য ট্রেডিং ব্যালান্স হইতে কার্য্যকরী তহবিল খাতে ৩৯ কোটী পাউণ্ড ও চলতি খরচের জন্য ৩ কোটী পাউণ্ড—মোট ৬৷৷ কোটী পাউণ্ড বরাদ্দ হইয়াছিল। সরকারী "সুব্যবস্থায়" তন্মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয় ও বাকী ৬ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল তহবিলে পুনরায় হস্তান্তরিত হয়।

তৎকালীন সরকারী নীতি পর্য্যালোচনা করিলেই এইরূপ বিপর্য্যয়ের মূল রহস্য বুঝিতে পারা যায়। ঐ বৎসর যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সর্ব্বাধিক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল; অথচ অর্ডার মত যন্ত্রপাতি পাইতে কখনও ৭।৮ মাস, কখনও একবৎসর, কখনও বা দুই তিন বৎসর দেরী হইয়া থাকে। সেজন্য ঐ বৎসর বিদেশে যে সব যন্ত্রপাতি অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই বৎসরের মধ্যে আমদানী হয় নাই। ফলে বরাদ্দ তহবিল প্রায় অটুট থাকে।

আবার পরবর্ত্তীকালে বরাদ্দ তহবিল কমাইয়া দিলেও ১৯৪৭ সনে প্রদত্ত অর্ডার মত যন্ত্রপাতি খালাস করার জন্য উহার একটা মোটা অংশ খরচ হয়।

১৯৪৮ সনের প্রথম দিকে ট্রেডিং ব্যালান্স সম্পর্কে আলোচনাকালে এইরূপ বিপর্য্যয়ের খবর প্রচারিত হইলে তুমুল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তখন বাণিজ্য দপ্তর আর একবার পূর্ব্বের অনুরূপভাবে আমদানী নীতি আমূল পরিবর্ত্তন করা অবাধে লাইসেন্স দিতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে দেশের প্রয়োজন কতটা, মূল্যহ্রাস হ্রাসের উদ্দেশ্যে কিরূপ ব্যবস্থা করা ও কত মাল আমদানী হওয়া দরকার, বরাদ্দ ট্রেডিং তহবিল কোন কোন খাতে কি পরিমাণে খরচ করিলে দেশের সর্ব্বাধিক কল্যাণ হইবে..... ইত্যাদি বিষয় উপেক্ষা করিয়া অত্যাবশ্যক তালিকাভুক্ত বহু জিনিষ আমদানীর জন্য তাঁহারা কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি জিনিষের উল্লেখ করিতেছি :—

অনাবশ্যক আমদানীর হিসাব

লক্ষ টাকার সমষ্টিতে

	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
কেক-বিস্কুট	৬৬	৭৪১
কৌটা ভর্ত্তি খাদ্য (উহার মূল্য সহ)		২৮
কোকো ও চকোলেট		১৩৬
ফলফলাদি		২৩
পেটেণ্ট মূল		২০০
অন্যান্য মূল		৫৮১৬
যন্ত্রচালিত গাড়ী (রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি বাদে)		অনুল্লেখ
কাঠ	১০	৩৮৬
রুচির খেলনার মূল্য	৩২৯	১২৮৩
ঐ কাগজ	৬২৯	১৩৩

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে এইরূপ অদূরদর্শিতার অনিবার্য্য পরিণতি প্রকট হইয়া উঠে। সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, বেপরোয়াভাবে লাইসেন্স বিতরণের ফলে গত বৎসর রপ্তানী পণ্যের মূল্য ও ট্রেডিং ব্যালান্সের

নির্দিষ্ট কিস্তি (৪ কোটি পাউণ্ড) খরচ করার পরেও ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি পড়িয়াছিল। সমগ্র ষ্টার্লিং এলেকার বৈদেশিক তহবিল সম্পর্কেও সে সময়ে কতগুলি উদ্বেগজনক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। বহির্বাণিজ্য চালু রাখার জন্য ইহাতে অন্ততঃ ৪০ কোটি পাউণ্ড মজুত থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে ১৯৪৯ সনের ৩১শে মার্চ মাত্র ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মজুত ছিল। উহা আরও কমিয়া ৩০শে জুন তারিখে ৪০ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি দাঁড়ায়। বৃটিশ সরকার ডলার খরচ হ্রাসের জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির একটি বৈঠক ডাকেন।

এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ভারত সরকার অত্যধিক তাড়া-হুড়া করিয়া, বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই, আমদানী সম্পর্কে অনেক সাধারণ লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেন, এবং অন্যান্য পণ্য ও ডলার পণ্য আমদানী সম্পর্কে অত্যধিক জড়াজড়ি করেন। পরে বৈঠকের সুপারিশক্রমে তাঁহারা আমদানী হ্রাস সম্পর্কে কতগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলম্বন স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তদনুসারে ১৯৪৯ সনে বাণিজ্যের অবস্থা দাঁড়াইবে নিম্নরূপ :—(১) ১৯৪৮ সনে মোট ৫১,৭৯৮ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। উহা ২৫ শতাংশ কমাইতে হইবে [illegible] ১৩,৪৪৮ লক্ষ টাকার বেশী আমদানী করা যাইবে না। (২) গত বৎসর আপীয় ও ফিলিপাইন বাদে ডলার এলেকার অন্যান্য দেশ হইতে ১২০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। ইহাও ২৫ শতাংশ কমাইয়া ৯০ কোটি টাকার মধ্যে ডলার খরচ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

এসম্বন্ধে স্মরণ রাখা দরকার যে, ডলার এলেকা হইতে আমীত প্রায় সব রকম পণ্যই প্রয়োজনীয় তালিকাভুক্ত। মাত্র খাদ্য-শস্য ক্রয়ের জন্যই সরকার সেখানে বার্ষিক প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচ করিয়া থাকেন। সরকারী খাতে রেল-ইঞ্জিন, পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্যও মোটা খরচ ধরিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল খরচ হ্রাসের উপায় নাই। সুতরাং ডলার এলেকার আমদানী হ্রাস বাবদ ৩০ কোটি টাকা যে-সরকারী পণ্য আমদানী কমাইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ যে-সরকারী জন্যান্যদের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহার এলেকাজাত বহু জিনিষের আমদানী বন্ধ করিতে হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ষ্টার্লিং এলেকার দর অনেক চড়া; ডেলিভারি পাইতেও অত্যধিক বিলম্ব ঘটে। সেজন্য ওখা হইতে মাল ক্রয়ের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ অনুসারে অনেক বেশী দর দিতে হইবে। মাল পাইতে বিলম্বের জন্য ভারতে প্রগতিমূলক পরিকল্পনাগুলি চালু ও শিল্প কারখানা সম্প্রসারণ করার কাজে দীর্ঘকাল পিছাইয়া যাইবে; নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে, অপচিত সম্পদ সদ্ব্যবহারের ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যাহত হইবে।

প্রগতিমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে যন্ত্রপাতি আমদানীর অন্তরায়েরও বহু কাজই বন্ধ থাকিবে। ভারত সরকার বৈষয়িক উন্নতির জন্য এইগুলির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন ব্যবস্থানুসারে পূর্বেকার অবস্থাই আরও দীর্ঘকাল বলবৎ থাকিবে। ইতিমধ্যেই তাঁহারা বহু কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; যেগুলি একেবারে বন্ধ করেন নাই—সেখানেও খরচ কমাইয়া মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

আমদানী নীতির ব্যর্থতা—

মূল্য-হ্রাস পর্য্যালোচনা করিলে আমদানী নীতির ব্যর্থতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। মূল্য হ্রাসের যুক্তি দেখাইয়াই দরকার ১৯৪৬ সনের শেষে ও ১৯৪৮ সনে আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদনুসারে গত বৎসর আমদানীও যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। কিন্তু মূল্য হ্রাস সম্পর্কে সরকারের মূল উদ্দেশ্য আদৌ সফল হয় নাই। দর মাত্র কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময়ে সরকার আবার কড়াকড়ি করায় ব্যবসায়ীরা দর চড়াইয়া দেয়। তিন মাস পূর্বেকার সহিত তুলনায় এখন প্রায় সব রকম বিদেশী মাল ১০ হইতে ৩৪ শতাংশ চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। অথচ ইতিমধ্যে বিদেশে দর ২৫ শতাংশের মত কমিয়া যাওয়ায় আমদানীর খরচ যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা সে সুবিধা পায় নাই—বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতের প্রতি অবিচার—

ষ্টার্লিং ব্যালান্স হইতে বার্ষিক কিস্তি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ভারতের প্রতি ক্রমাগত যেরূপ অবিচার হইতেছে, তাহার সম্যক

তাৎপর্য্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রী হয়তো বলিবেন যে, বৃটিশ সরকার ষ্টার্লিং বরাদ্দ কমাইয়া দিলে, তাহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আমরা সে যুক্তি স্বীকার করি না। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিত করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের সমস্ত বৈদেশিক লেনদেন আটক করিয়াছিলেন। ভারতে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র আমদানীর জন্যও উহা খরচ করিতে দেওয়া হয় নাই। এমনকি, ইজারা কর্জ্জ খাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিনা মূল্যে মাল আনাইয়া এদেশে জনসাধারণের ক্রয় হ্রাস করিবার, শিল্প সম্প্রসারণের ও নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের যেটুকু সুযোগ ছিল—তাহাও সঙ্কুচিত করিতে দেন নাই। অথচ সে সময় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বৈদেশিক তহবিল খরচ করিয়া বৃটেনে শিল্প কারখানার পণ্য আমদানী করা হইতেছিল, জনসাধারণকে সব রকম অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করা হইতেছিল। এমনকি চা, তামাক প্রভৃতি জিনিষও আমদানী হইতেছিল। আবার মার্কিণ হইতে ইজারা কর্জ্জ খাতে সাহায্য লইয়া বৃটেনে ও ডোমিনিয়নগুলিতে নূতন নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইতেছিল।

তৎকালীন বন্দোবস্তের জন্যই ভারতবর্ষ এখনও অতি শোচনীয় দুরবস্থা ভোগ করিতেছে। অন্যান্য বৃটিশ এলেকার সহিত তুলনায় এখানে মূল্যস্তর প্রায় দ্বিগুণ, পাইকরী প্রায় তিনগুণ, অধিকাংশ নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সম্পর্কেই ভারতবর্ষ পরনির্ভরশীল। সর্ব্বব্যাপক এই দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে ভারতের প্রতি তৎকালীন বন্দোবস্তের হিসাব স্মরণ রাখিয়া একটা অতিরিক্ত দাবী দাওয়া করা উচিত।

ষ্টার্লিং এলেকা—ভলার তহবিল বন্টনের ব্যাপারে বৃটেন কর্ত্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক চালিয়া লইতেছে। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সাড়ে তিন বৎসরে ষ্টার্লিং এলেকার মোট ভলার ঘাটতি ১৯০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ১৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড একমাত্র বৃটেনের জন্য খরচ হইয়াছে। ভলার তহবিলে বৃটেনের হিসাবে জমার পরিমাণ প্রায় শূন্য। অথচ খরচ বৃটেনের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—মোট খরচের শতকরা ৭১ ভাগ। ইহাতে জনসাধারণের জন্য চিনি, দুধ, কয়লা, সিগারেট, মদ ও বিলাস উপকরণ প্রভৃতি কিনিতেও এই অর্থ অপব্যয় চলিতে থাকিবে। অথচ ভারতবর্ষ প্রভৃতি অন্যদের এলেকা অত্যাবশ্যক ঔষধপাতি কিম্বা শিল্প উপকরণও আমদানী করিতে পারিবে না। কোন যুক্তিতে ভারত সরকার এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

বহির্ব্বাণিজ্যে অবনতির কারণ—

স্থানীয় বাণিজ্য আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্যই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ভারতীয় পণ্যের যে অত্যধিক চড়া, অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় উহা বিক্রয় করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় বাজার অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। তদুপরি রপ্তানীকারীরাও যথোচিত অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় লইয়া থাকে। অনেকে নমুনামত মাল না পাঠাইয়া অপরিচ্ছন্ন মাল পাঠায়, যথাযথভাবে জিনিষ বিশাখ, ওজনে বা মাপে কম দেয়। সেজন্য বিদেশী খরিদ্দারদিগের মধ্যে ভারতীয় পণ্য সম্পর্কে অনুত্তম ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে রপ্তানী কমিতেছে। এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য ভারত সরকার ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদিগের একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এযাবৎ কোন কার্য্যসূচী স্থির হয় নাই।

যাহাই হউক, ভারত সরকার ১৯৪১ সনের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে কয়েকটী ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, এবং তৎপরে ব্যাঙ্ক আমদানী একেবারে বন্ধ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সর্ব্বতোপ্রকারে সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। দেশবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যাঙ্ক আমদানী খাতে সাধ্যাতিরিক্ত খরচের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি যথাযথ রূপায় প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাহার ফলে অদূরভবিষ্যতে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে।

খরচাতি সাহায্য ও ঋণ প্রয়োজন—

বহির্ব্বাণিজ্যের যাবা আলোচনা করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, চলতি আয়ের ও ষ্টার্লিং বরাদ্দের দ্বারা প্রয়োজনানুসারে ঔষধপাতি, শিল্পোপকরণ প্রভৃতি আমদানী করা সম্ভব নহে। অথচ শেষোক্ত জিনিষগুলি আমদানী না করিয়াও উপায় নাই। মাত্র আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ভারত সরকার গতবৎসর যাহা তহবিল হইতে ৭৯ কোটি ডলার ও তৎপরে ৪। কোটি ডলার ঋণ লইয়াছেন, এই বৎসরও অপেক্ষাকৃত চড়া সুদে কিছা সমপরিমাণে ঋণ লইতে পারিবেন। আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কও সম্প্রতি ভারতের জন্য ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন, আরও কয়েকটী ঋণের প্রস্তাব তাঁহাদের বিবেচনাধীন। কিন্তু মাত্র এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ লইয়া সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিবে না। বেসরকারী হিসাবে বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের জন্যও প্রচুর ঋণ ও মূলধন দরকার। মার্কিণ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক, বেসরকারী ধনিকগণ ও মার্কিণ সরকারের নিকট হইতে উহা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইজারা কর্জ্জখাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষ ভারতত্ব যতটা সাহায্য পাইতে পারিত তাহা তাঁহারা দেন নাই। এখন মার্কিণ সরকারের পক্ষে সে ত্রুটি সংশোধন করা উচিত। অন্যদিকে, বেসরকারীভাবে মূলধন ও ঋণ সরবরাহ করিয়া ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও সদিচ্ছার বাস্তব রূপ দেখানও তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন। ইউরোপে পুনর্গঠনের জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর একশত কোটি ডলারের মত ঋণদান বা ঋণ দিতেছেন। বৃটেনকে দরাজ হাতে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনুন্নত দেশ সম্পর্কে সেরূপ কোন সাহায্য ব্যবস্থা এখনও কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। এই অবস্থায় কেবল তাহাদের নৈতিক সমর্থন ও সদিচ্ছায় ভারতের কি উপকার হইতে পারে?

পূজা-লাভালোক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,— আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দশের আনন্দ একাগুভাবেই আপনার, আর আপনাকে দেখা করবার আনন্দ আমাদের
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্কিং

ভূপেশ গুপ্ত

সম্প্রতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেণ্ট কাউন্সিলের এক্সপার্ট কমিটি দেশে শিল্পে মন্দা দেখা যাওয়ার কারণ ও তাহার প্রতিকার নির্ণয় করিতে গিয়া ক্রয়ক শ্রেণীর ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের মধ্যে লেভিংস ও ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট করার অভ্যাস গঠনার্থে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত পাঁচ ছয়টী বেসরকারী ব্যাঙ্ককে বাছিয়া লওয়া এবং উহাদের প্রত্যেককে গ্রামাঞ্চলে দুইশত করিয়া শাখা খুলিবার জন্য অনুরোধ জানানো। এই শাখাগুলিতে যে ক্যাশ থাকিবে বা নগদ টাকা রাখিতে হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিনা সুদে তাহা ব্যাঙ্কগুলিকে ধার দিবে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়িয়া তোলা ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। এই কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় ১০ বছর কাল প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাটি দিতে হইবে।" ["The committee commended a suggestion that the Reserve Bank should select five or six leading commercial banks and request each of them to establish about two hundred branches in rural areas and lend them, free of interest, the cash balances to be maintained in such branches. It should be the duty of the banks to cultivate the banking habit in rural areas and for that purpose the bank in each area should be guaranteed freedom from competition for a period of ten years."]

বিশেষ করিয়া ক্রয়কের হাতে পারিবারিক খরচ নির্ব্বাহ করিয়া টাকা বাঁচে—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া এক্সপার্ট কমিটি ক্রয়কের ও গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য লোকের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তোলা এবং উক্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক ডিপজিট হিসাবে আকর্ষণ করা দেশের ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বাড়াইবার একটা প্রধান রাস্তা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক ডিপজিটের একটা মোটা অংশ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বা বাদদে পরিণত হইবে। এ ছাড়া ব্রাঞ্চলেস্ ব্যাঙ্কিং দাঁড়াইবে ব্যবসায়ের ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট গড়িয়া তোলা হইবে। লোকাস্থলি লাভজনক (যেমন নানাপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করা) করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবার কথা কমিটি বলেন নাই। ক্রয়কের ও অন্যান্য গ্রাম্য লোকের এই সব টাকার নিরাপত্তা কি কি উপায়ে রক্ষা করা হইবে কমিটি সে বিষয় নীরব।

সমবায় ঋণ দান সমিতির সংখ্যা বাড়াইবার কথা এবং গবর্ণমেণ্টের এতদিনকার কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট বা সমবায় বিভাগকে পুনর্গঠন করিবার কথা না বলিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে গ্রামাঞ্চলে ১২০০ শাখা খুলিবার নির্দ্দেশ দেওয়াটা বিশেষজ্ঞ কমিটির ঠিক কাজ হইল কি? আর যদি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে বাদিয়া ফেলাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উহাদিগকে প্রবলের হাতে সঁপিয়া না দিয়া আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব দেওয়া অনেক ভাল ছিল। কমিটি যদি ইহা মনে করেন যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিলে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে মৃত্যু জীবন লাভ করা যাইবে তাহা হইলে দুই সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের ব্যাঙ্কিং কার্য্যনির্ব্বাহের ভিতর কি প্রকার সম্পর্ক থাকিবে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের গ্রাম্য সমবায়কে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন যতটুকু তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের হাত হইতে রক্ষা করা। ইংরেজ চতুর আই, সি, এস অফিসার দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিংকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল নিতান্ত আইনানিক ব্যাপার ছিলাবে। এই অফিসারগণ কাজের কাজ না করিয়া তাহা-সমূহ অসত্য বার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া গিয়াছেন অনাগত। একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজহাতে নিয়ন্ত্রণ ভার নিলে উক্ত বিভাগকে সত্যজীবন দান করিতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কাজ হাতে নিলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিবার অনুরোধ জানানোর কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিংকে পুর্ণভাবে পরিচালনা করিবার ভার কিছু লোক করের পয়সের "ভার" বার নেওয়া মন্দ নয়।

ধরিয়া লওয়া যাক্ ১২০০ শাখা দ্বারা গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়িয়া তোলার কার্য্য হাতে নেওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু পাঁচ ছয়টী ব্যাঙ্ককে বাছিয়া নিয়া প্রত্যেককে ২০০ করিয়া শাখা খুলিবার জন্য আমন্ত্রণ করার সোজা অর্থ গিয়া দাঁড়াইবে তেলা মাথায় তেল দেওয়া। মানে Big Business-কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া। এতগুলি সিডিউলড্ ব্যাঙ্কের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়টাকে বাছিয়া নেওয়ার আর অন্য কি অর্থ হইতে পারে? ব্যাঙ্কের গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিবার নিয়তম যোগ্যতা বাঁধিয়া দেওয়া এবং আর্থিক শক্তি অনুসারে কোন্ ব্যাঙ্ক কোথায় কোথায় কতকগুলি শাখা খুলিতে পারিবে তাহা বলিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকিবে। প্রস্তাবিত একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার পিছনে ব্যবসাগত কোন যুক্তি নাই। আবশ্যকী অথবা নিরাপত্তার জন্যও এরূপ একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও বরোদা ব্যাঙ্ক মাত্র বড় বড় শহরে শাখা খুলিয়া থাকে। এই শ্রেণী ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে তাহারা নাবিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পাঁচ ছয়টার মধ্যে পড়িবে আসন্ন ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। মাত্র বড় ব্যাঙ্কের তালিকা আনিবার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। কলকাইতলী শহরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ছাড়া বাকারি ধরণের ব্যাঙ্ক রহিয়াছে দুইটি ব্যাঙ্কিং ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেবল ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সমগ্র কলকাইতলী জেলায় গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং আফিস খোলার অধিকার পাওয়ার কথা। আর্থিক শক্তি অনুসারে পেরোক্ত দুই ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিকে উক্ত জেলায় গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিতে দেওয়ার কি আপত্তি থাকিতে পারে? ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে (Zonal influence) অঞ্চল

লিক প্রভাব একটা বড় কথা। যেমন যেমন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জাহিদের পুরোন শাখা, ঘুরিয়া ব্যাঙ্কিংয়ের নতুনবাজার শাখা এবং ঘুরিয়া ইউনিয়ানের লৌহাটী শাখা। অনেক বড় ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ইহাদের স্থানীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ। গ্রাম্য শাখা খুলিবার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের আর্থিক প্রভাবের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে ব্যাঙ্ক যে জায়গায় জনপ্রিয় তার পক্ষে সেই অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়িয়া তোলা সহজ। গ্রাম্য শাখা খুলিবার অধিকার সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়ার আর একটা বিশেষ যুক্তি এই যে, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কালে ব্যবসার ঝুঁকি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে শক্তির পরিমাণে যত বেশী ভাগ করিয়া দেওয়া যায় ততই ব্যাঙ্কিং সিষ্টেমের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর একটা কথা, "ব্যাঙ্কগুলিকে দশ বছরের জন্য প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার গ্যারাণ্টি দিতে হইবে"—এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না যদি উপযুক্ত ধারায় সকল ব্যাঙ্কের যুক্তিসঙ্গতভাবে শাখা খুলিবার অনুমতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেন। অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা তাহাতে আপনি বাধা পড়িয়া যাইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আতীয়করণের [illegible] মাত্র কয়েকটী ব্যাঙ্কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইলে তাহাতে মূলে ভুল করা হইবে।

[illegible] করাই ব্যাঙ্কের একমাত্র [illegible] করার ব্যাঙ্কের একটা বড় [illegible] গৃহীত আমানতের কত ভাগ কিনিতে বাধ্য করা হইবে তাহার নিয়মকানুন বাঁধিয়া দেওয়ার কথাও কমিটী বলেন নাই: কসল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া, কসলের ষ্টোরেজ এবং মার্কেটিং প্রভৃতি কিছু দিয়া কৃষকদের প্রয়োজন মিটানো গ্রাম্য ব্যাঙ্কিংয়ের প্রধান কাজ। ভূমির সিল্কের প্রবর্তনে ও উন্নতি সাধনে টাকা ধার দেওয়া গ্রাম্য ব্যাঙ্কিংয়েরই কাজ। এই দুই কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। তাহাদের কার্য্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে এবং সময় সময় পরিদর্শন করার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট এখনও শুরু অবস্থায়। গ্রাম্য ব্যাঙ্কিংয়ের গোড়া-পত্তন ও উন্নতি বিধান করিতে এই বিভাগের অনেক সময় লাগিবে।

বিশেষজ্ঞ কমিটী বলিয়াছেন যে, গ্রামাঞ্চলে লোকের ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়িয়া তোলা ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। গ্রামবাসীদের "ব্যাঙ্কিং অভ্যাস" বলিতে কি বুঝায় কমিটী তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। সম্ভবতঃ গ্রামবাসীদের "ব্যাঙ্কিং অভ্যাস" ও সহরবাসীদের "ব্যাঙ্কিং অভ্যাস" এক হইবে না। সেই কর্ত্তব্যের ভার ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ সুবিধা, এমন কি দশ বছরের "মনোপলি রাইটস্" দেওয়া হইবে সেই কর্ত্তব্যের পরিষ্কার নির্দ্দেশ না থাকিলে ব্যাঙ্কগুলি নিজ কর্ত্তব্য নির্ণয় বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারিলেও কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। কেন না, তাহাতে উহাদের বেশী মুনাফা অর্জ্জনের সুবিধা ঘটিবার কথা। ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য কর্ম্মের Qualitative এবং Quantitative standard থাকাও একান্ত আবশ্যক। ব্যাঙ্কের শক্তি, সুনাম এবং ভাল দাদন-এই তিনের সম্বন্ধে তার Qualitative standard। আমানতের পরিমাণ, আমানতকারী ও অগ্র কাইয়াতের সংখ্যা এবং গভীর পরিমাণ—এই সব হইল Quantitative standard। সাময়িকভাবে তহবিল পরিচালনা করা এবং উপরোক্ত দুই প্রকারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই কাজ।

সমবায় বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা, উহাদের ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত গ্রহণ ও কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থা করা এবং কৃষককে সঞ্চয়শীলী করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কয়েকটি বড় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং করিতে দিলে একদলে সমবায় ব্যাঙ্ক ও ছোট ও মাঝারি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত ক্ষতি সাধন করা হইবে। গ্রামে একচেটিয়া ব্যবসা এবং সহরে বিরাট আকারের ব্যবসার জোরে বড় ব্যাঙ্কগুলি এত বেশী শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে যে, তাহারা শীঘ্রই ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্কগুলির প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে আক্রমণের প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া উঠাই কঠিন হইবে। অধিকাংশ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হীনবল হইয়া থাকিয়া থাকিবে যতদিন প্রবল পক্ষের আরও কয়েকটি আক্রমণ না আসে। বড় ব্যাঙ্কগুলির জন্যে এই ধরণের শুভাকাঙ্ক্ষা এই বিশেষজ্ঞ কমিটীর পক্ষে লক্ষ্যত হয় নাই। দেশে অর্থ লগ্নীর সুযোগ বাড়াইবার জন্য এই ধরণের একদেশদর্শী কাজে হাত দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সমীচীন হইবে না।

ভারতীয় কয়লা শিল্প

শ্রীকুমাররঞ্জন পরমবীশ এম-এ

১৯৩১ সালে তার [illegible] যে অনুসন্ধান [illegible], তার ফলে তিনি, ভারতীয় কয়লাকে [illegible] শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—গণ্ডোয়ানা, টার্সিয়ারী ও [illegible]। বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং হায়দ্রাবাদে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ গণ্ডোয়ানা শ্রেণীভুক্ত; টার্সিয়ারী শ্রেণীর কয়লা রাজ্যের [illegible] পরিমাণে পাওয়া যায়; এবং আসামের কয়লা লিগনাইট শ্রেণীভুক্ত।

ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বিহার থেকে এবং বাংলা থেকে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ আসে। অবশিষ্ট শতকরা ১০ ভাগ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে উত্তোলিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতের মোট কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী টন; ১৯৪৮ সালে উত্তোলনের পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২ কোটী ৯০ লাখ টনে। ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] তুলনায় উত্তোলন কমে গিয়েছিল, কিন্তু কয়লার পরিবহন '৪৮ সালে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ২ কোটী ৫১ লাখ টন কয়লা ধনিমুখ হতে যাইবে চালান হয়েছিল আর ১৯৪৮ সালে উক্ত পরিবহনের পরিমাণ হয়েছিল ২ কোটী ৫৮ লাখ টন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রালগাড়ীর অভাবে বরাবরই ধনিমুখে কয়লা জমে থাকছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ জমে থাকা কয়লার মোট পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৭ লাখ টন। '৪৮

সালে অন্তত বেড়ে গিয়ে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লাখ টনে। '৪৮ সালে আমার কিছু কমে যায় এবং ১৭ লাখ টনে দাঁড়ায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান প্রবন্ধে যে সব সংখ্যার উল্লেখ থাকবে না তা সাধারণতঃ বাংলা ও বিহার কয়লাক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আর, যেহেতু এই দুই ক্ষেত্র থেকেই ভারতের মোট কয়লা উত্তোলনের শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক এসে থাকে, সুতরাং এই দুই ক্ষেত্রকেই ভারতীয় কয়লা শিল্পের আধার বলে ধরলে বোধহয় ভুল করা হবে না। ভারতীয় কয়লা শিল্পের এক বিশেষত্ব এই যে, এখানে নিম্নশ্রেণীর তুলনায় উচ্চশ্রেণীর কয়লাই বেশী পরিমাণে উত্তোলিত হয়ে থাকে এবং স্বভাবতঃই উচ্চ শ্রেণীর কয়লাই বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয়। '৪৮ সালে যত কয়লা পরিবহন হয়েছিল তার মধ্যে আনুমানিক হিসাবে সিলেক্টেড 'এ' শ্রেণী কয়লার অংশ ছিল—শতকরা ২৩, সিলেঃ 'বি'—৩০, ১নং গ্রেড—২০, ২নং গ্রেড—১৪, এবং ৩নং গ্রেড—১৩। ১৯৪৪ সালে কয়লা উৎপাদন এবং খনিজের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয় ও কোল কমিশনারের এক পদ সৃষ্টি করে তাঁর উপর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার ভার দেওয়া হয়। তিনি কয়লার অন্তর্নিহিত ছাই-এর পরিমাণানুসারে উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ করেন এবং বিভিন্ন প্রকার কয়লার মূল্য নির্ধারণ করেছেন। সিলেক্টেড 'এ' থেকে ১নং গ্রেড এই তিন শ্রেণীর কয়লাকে সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২নং গ্রেড, ৩নং গ্রেড 'এ', এবং গ্রেড 'বি'—এই তিন প্রকার কয়লাকে ধরা হয় নিম্নশ্রেণী।

সংরক্ষণ

ভারতে কয়লার অভাব নেই বল্লেই চলে; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কয়লার সমগ্র ভাণ্ডার খুব বেশী নেই। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার তার কে সি মহীন্দ্রের অধীনে এক কমিটি বসিয়েছিলেন কয়লা শিল্প বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। মহীন্দ্র কমিটি অনুমান করেন, ভারতে উচ্চশ্রেণীর কয়লার মোট ভাণ্ডার হবে ৭৫ কোটি টন। কমিটি অবশ্য হিসাব করেন যে, উত্তোলনের বর্তমান হার বজায় থাকলে এই সমগ্র ভাণ্ডার একশত বৎসরের অধিক চলবে না এবং রোদাই ও নিম্ন প্রভৃতি অঞ্চল অবলম্বন করলে আরও ৫০ বর্ষাৎ মোট ১৫০ বৎসর টিকতে পারে। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর কয়লার সংরক্ষণের জন্য মহীন্দ্র কমিটি বিশেষ সুপারিশ করেন। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ লাখ টন উচ্চশ্রেণীর কয়লা উত্তোলিত হয়, তার মধ্যে অধিকাংশই বাষ্পীয় কয়লা (metallurgical coal), যাহা লোহা ও ইস্পাত শিল্পে লৌহ আকরিক গলাইবার জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৩০ লাখ টন লৌহ শিল্প এবং কোক তৈরীর উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়; বাকী প্রায় ৫০ লাখ টনই বাষ্পীয় কাজ ভিন্ন অন্য কাজে লাগান হয়। রেল সমূহের ইঞ্জিনে ব্যবহার করার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ৩৪ লাখ টন উচ্চশ্রেণীর কয়লা খরচ হয়। রেলে এই শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার জাতীয় সম্পদের অপচয়—মহীন্দ্র কমিটি এই কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। '৪৮ সালে লৌহ শিল্পে মাত্র ২৪ লাখ টন বাষ্পীয় কয়লা ব্যবহার হয়েছিল এবং রেল-ইঞ্জিনে প্রায় ৩৫ লাখ টনের ব্যবহার হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধারম্ভের কাল হতে বৎসরও বাষ্পীয় কয়লার অপচয়ই হয়েছে। এ হিসাব থেকেই উচ্চশ্রেণীর কয়লার সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুমিত হইবে।

খনন কর্মের নিরাপত্তার জন্যও সংরক্ষণ প্রণালীর কার্যকারিতা রয়েছে। কোন খনি থেকে কয়লা কেটে নিয়ে গেলে সেই শূন্য গহ্বরের ওপরের ছাদ ধসে পড়ার আশঙ্কা থাকে; তখন শুধু গহ্বরের দেয়াল স্থানে স্থানে কার্যরত শ্রমিকেরই মৃত্যু হতে পারে তা নয়, এভাবে ধসে যাওয়া কয়লার আকরও নষ্ট হয়ে যায়; সুতরাং বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতি হয় খনিকের, শ্রমিকের তথা দেশের। সংরক্ষণের প্রধান উপায় উত্তোলিত কয়লার নির্বিচার অপচয় বন্ধ করা এবং শূন্যগহ্বর বালু দিয়ে ভরে দেওয়া। যেহেতু গহ্বর ভর্তি করলে যেসেরই উপকার বেশী খনি মালিকের চেয়ে। তাই মহীন্দ্র কমিটি প্রস্তাব করেছেন যে, এই গহ্বর ভর্তির কাজে মালিকের মোট খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ রাষ্ট্র বহন করবে। গত বৎসর সরকার গহ্বর ভর্তির জন্য তিনশত কোটি টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই কাজের দেখাশুনা করার ভার দিয়ে একটী বোর্ড নিযুক্ত করেছেন।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু উচ্চশ্রেণীর কয়লার দিকেই নয়, নিম্নশ্রেণীর কয়লার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আজকাল নিম্নশ্রেণীর কয়লা প্রধানতঃ দুটী কাজে ব্যবহৃত হয়—এক গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে, অপর ইট তৈরীর উদ্দেশে। বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, নিম্নশ্রেণীর কয়লা থেকে বিভিন্নপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ও কৃত্রিম জ্বালানী তেল বের করা যায়। বৃটেনে জানেছি, কয়লা থেকে প্রায় ৮ প্রকার রাসায়নিক উপদ্রব (byproduct) বের করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতে আজও এদিকে দৃষ্টি পড়ে নি বল্লেও অত্যুক্তি করা হবে না। তবে আশার কথা এই যে, কয়লার ধোলাই ও মিশ্রণের এবং কয়লা থেকে নানাবিধ উপদ্রব নিষ্কাশনের প্রণালী উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙ্গালোরে সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্ধন গবেষণা সংস্থা (Fuel Research Institute) কাজ করছে।

জাতীয়করণ

১৯৩৭ সালে কোল মাইনিং কমিটি কয়লা শিল্প জাতীয়করণের বিষয় আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু কমিটির রায় জাতীয়করণের বিরুদ্ধেই দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের মহীন্দ্র কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, জাতীয়করণ বাঞ্ছনীয় হলেও বর্তমানে ব্যবহারিক অসুবিধা থাকায় অন্তত দশ বৎসর এ বিষয়ে হাত দেওয়া কর্তব্য নয়। কমিটি আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, যে পর্যন্ত খনি বিষয়ক অধিকার সরকারী নিয়ন্ত্রণে না আসে, সে পর্যন্ত জাতীয়করণ সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং জাতীয়করণের পূর্বে সরকারের এ দিকেই দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। গত বৎসর বিহার সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য এক আইন পাশ করেন। সেই আইনের এক ধারা বলে প্রদেশস্থিত খনিসমূহেরও মালিকানা প্রাদেশিক সরকার নিজ হাতে নেবার সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু ভূস্বামিকারীদের ক্ষতিপূরণ-সম্পর্কিত ধারাগুলির সঙ্গে এক মত হতে না পারায় গভর্ণর জেনারেল আইনটী অনুমোদন করেন নি। সুতরাং সে আইন কার্যকরী হতে পারে নি এবং উহা বর্তমানে আবার বিহার আইন-সভার আবশ্যক পরিবর্তনের জন্য ফিরে এসেছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার নিজে এক আইন প্রণয়ন

করেছেন। যার ফলে সমস্ত দেশের খনন কার্য নিয়ন্ত্রণ অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এখন কয়লা খনিতে খনন-কার্যের সুব্যবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী।

পরিবহন

মহীন্দ্র কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে রেল বোর্ড ১৯৪৬ সালে জানিয়েছিলেন যে, তারা বাংলা ও বিহার কয়লাক্ষেত্রের জন্য দৈনিক গড়ে ৩৭০০ মাল গাড়ীর ব্যবস্থা করে প্রতি বৎসর ২ কোটি ৮০ লাখ টন কয়লার পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তবে তাঁরা এও জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের আগে এ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, '৪৮ সালে এই দুই ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ২৮০৪ মালগাড়ীর বেশী ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন নি; '৪৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৭৭৬ এবং '৪৬ সালে ২৮৭২। উত্তোলিত কয়লার পরিবহনের অসুবিধা কয়লা শিল্পের অগ্রগতিতে বরাবরই প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে মহীন্দ্র কমিটি কয়েকটি স্থানে রেল লাইন বাড়াতে এবং কয়েক জায়গায় নতুন লাইন খুলতে সুপারিশ করেছিলেন। সেই মতে গত বৎসর রেল বোর্ড বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিমিত্ত ৩০০ মাইল ব্যাপী এক নতুন লাইন খোলার সঙ্কল্প করেছেন; এবং কয়েকটি স্থানে লাইন বাড়াবার ও ইয়ার্ড, পুল ইত্যাদির সংস্কারও সিদ্ধান্ত করেছেন।

রেল লাইনের দারুণ্য না থাকায় প্রায় ৩০০টি কয়লাখনি নিজেদের উত্তোলিত কয়লার চলাচলের জন্য মোটরযানের উপর নির্ভর করে। '৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পেট্রোলের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় এই খনিগুলির খুবই অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু পরে আবার পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ায় সেই অসুবিধা দূর হয়েছে। তবু মোট পেট্রোল সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে উক্ত খনিগুলির পরিবহন সম্পর্কিত ক্ষোভ যথারীতই রয়েছে। সমুদ্রপথে কয়লা চলাচলের উদ্দেশ্যে নিয়ে ৩৪টি জাহাজ নিয়োগ করা হয়েছে। এতে কয়লার চলাচল-সঙ্কট কিছু পরিমাণ সমাধান হয়েছে বলা যেতে পারে।

শ্রমিক

১৯১৯ সালে মিঃ ট্রেইলে বীস মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতের অধিকাংশ কয়লা শ্রমিক প্রধানত কৃষিজীবী এবং খনন কার্যকে তারা সৌসুমি বৃত্তি হিসাবে গণ্য করে; তা ছাড়া, এরা দক্ষ শ্রমিক নয় বলে এদের মাথাপিছু উৎপাদন হারও কম। খনি-শ্রমিকের এই দুই বিশেষত্ব আজও বজায় আছে। আজও কয়লা শ্রমিকের নিয়ত অনুপস্থিতির প্রবণতা এবং উৎপাদন হারের স্বল্পতা দুই আকর্ষণ করে। কয়লা শিল্পে যাতে স্থায়ী শ্রমশক্তির অভাব না হয় সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলা থেকে শ্রমিক সরবরাহের এক ব্যবস্থা চালু করেছেন। যদিও গত যুদ্ধের সময় শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্যই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনও সরকার তা চালিয়ে আসছেন। কিন্তু এইভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মোটের তুলনায় নিতান্তই অল্প। কয়লাখনিতে কর্মচারী অধিকাংশ শ্রমিকই ঠিকাদার কন্ট্রাক্টার-গণ কর্তৃক নিযুক্ত।

কয়লা শ্রমিকদের কল্যাণের নিমিত্ত ভারত সরকার ১৯৪৪ সালে এক অর্ডিনান্স জারী করে

"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই মূর্ত্ত আনন্দের
প্রতীক হ'ল
ন্যাশনাল
ইণ্ডিয়ানের
একখানি বীমাপত্র

আজ থেকে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে
সেই মহাপ্রাণ
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কে, সি, আই, ই; কে, সি, ভি, ও
এই কোম্পানী আপনাদের সেবার
জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।
আজও আমরা আপনাদের সেবায়
নিযুক্ত

প্রসপেক্টাস কিম্বা এজেন্সীর জন্য আজই পত্র লিখুন:—

ম্যানেজার ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ ইনসিওরেন্স কোং, লিমিটেড
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, ৯ লালবাজার, কলিঃ:

শাখা অফিস, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আছে।

কয়লা-খনি শ্রমিক-মঙ্গল-কোষ স্থাপন করেন। এই অধিনিয়মের বলে খনি-মুখ হইতে চালানী কয়লার উপর টন প্রতি দুই আনা কর ধার্য করা হইয়াছে এবং এইভাবে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ টাকা আদায় হয়। ১৯৪৭ সালে এক আইন প্রণয়ন করে উক্ত অধিনিয়মের বিধিগুলির স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়। এই কার্য দেখাশুনা করার জন্য ধানবাদে এক কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রমিক মঙ্গলের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, খনির মালিকগণ ঐ সকল ব্যবস্থানীতি পালন করেন কি না—উক্ত কোষ কার্যালয় সে সব দেখে থাকেন। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কোষ কার্যালয় প্রচার কর্মচারী ও পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য কোষ-কার্যালয় হইতে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের যে অনুমিত হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাতে আয় ধরা হইয়াছে ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। কোষের তহবিল হইতে কয়লা শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতি, পানীয় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কোষ কার্যকর্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে, কয়লা শ্রমিকগণের বাসের জন্য ৫০ হাজার গৃহ নির্মিত হইবে; '৪৮ সালে প্রায় ২০০ গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্বে কয়লা-শ্রমিকদের মজুরীর হার খুবই অল্প ছিল। শ্রমিকদের অসুবিধা দূর করার নিমিত্ত সরকার এক বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে বোর্ড যে সকল হার দেন, সরকার তাহার মধ্যে অনেকগুলি মেনে নিয়েছেন এবং সেই হারে কয়লা-শ্রমিকদের মজুরী, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুবিধা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে একজন কয়লা-শ্রমিক যেখানে গড়ে দৈনিক আট আনা উপার্জন করত, বোর্ডের সিদ্ধান্তের ফলে আজ সেখানে সে প্রায় দুইটাকা পায়। তার উপর সে পেয়ে থাকে সুবিধা দরে খাদ্যবস্তু, জামাকাপড় প্রভৃতি। মজুরী এবং অন্যান্য দিকে সুবিধা হওয়ার ফলে ১৯৪৮ সালে শ্রমিক অসন্তোষ পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় কমে যায়। উক্ত বৎসর মোট ১৫৭টি ধর্মঘট ভারতের কয়লাক্ষেত্রে সংঘটিত হইয়াছিল।

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি ভারত সরকার এক ঘোষণা করেন যে, কয়লা-শ্রমিক প্রতি বৎসর ৪ সপ্তাহ বেতন বোনাস হিসাবে পাবে। '৪৮ সালের এপ্রিল মাসে এই বোনাসে প্রথম কিস্তি কয়লা-শ্রমিককে দেওয়া হইয়াছে। খনির অভ্যন্তরে কর্মকারী শ্রমিকের পক্ষে বৎসরে মোট ১৯০ দিন এবং খনির ওপর কর্মকারী শ্রমিকদের পক্ষে বৎসরে মোট ২৬৫ দিন কাজ করলেই বোনাসের ওপর দাবী জন্মাবে। অন্য এক আইনের বলে সরকার বোনাস পাবার যোগ্য শ্রমিককে প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা জমা দিতে অনুমতি দিয়েছেন। শ্রমিক উক্ত ফণ্ডে নিজ মূল বেতনের শতকরা প্রতি এক আনা হারে জমা দিতে পারে এবং মালিককেও শ্রমিকের জন্য সমপরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে। ১৯৪৯ সালে ১লা জানুয়ারী হতে এই ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কর্মত্যাগের সময় শ্রমিক নিজ হিসাবে জমা টাকা ফেরৎ পাবে।

কয়লাক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক বিবাদ মিটাইবার জন্য সরকার ধানবাদে ডিসিপ্লিনারী লেবার কমিশনারের এক পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত কর্মচারী মালিক ও শ্রমিকের ভিতর কোন বিবাদের সংবাদ পেলে নিজেই উহা মেটাতে চেষ্টা করেন, এবং বিফল হলে ধানবাদে যে স্থায়ী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রিবিউন্যাল রয়েছে তার কাছে বিষয়টি পাঠান। হাইকোর্ট জজের পদমর্যাদাসম্পন্ন এক কর্মচারীর ওপর এই ট্রিবিউন্যালের ভার ন্যস্ত আছে।

মজুরী-করণ

নিতান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রেই মানব-শ্রমের ব্যবহার করা উচিত এবং যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কোন কাজ সম্ভবপর হতে পারে, সেখানে মানব-শ্রমের বিরোধ মানবীয় শক্তির অপব্যয় ভিন্ন আর কি? যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায় সুতরাং খরচের হিসাবেও মানব-শ্রম অপেক্ষা যন্ত্র অধিকতর কার্যোপযোগী। ভারতে খনিজের উৎপাদন হার নিতান্ত অল্প; কুটেম কিংবা আমেরিকার উৎপাদন হারের সহিত ভারতের উৎপাদন হারের তুলনাই হতে পারে না। আমেরিকায় যেখানে জন-প্রতি কয়লার উৎপাদন হার প্রতিদিন ৫ টন এবং কুটেমে ৩ টন ভারতে সেখানে মাত্র ৭ টন। ভারতের এই উৎপাদন স্বল্পতার কারণ যন্ত্রের অব্যবহার। যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা-খনিতে কয়লা কাটার ব্যয় এবং কর্তিত কয়লা খনিমুখে বাহ্য-গাড়ীতে তুলিয়া করা যায়। খনির অভ্যন্তরে উত্তম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিলে খনন কার্যে উৎকর্ষ সাধনের যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার শিক্ষার্থীকে খনিতে যন্ত্রের ব্যবহার শিখাবার নিমিত্ত ডুর্টমেনে পাঠিয়েছেন। সিঙরৌলীতে সারের কারখানায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে, উহার সদ্ব্যবহার বিহারের কয়লাক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার অধিকতর হতে পারবে। কিন্তু খনিতে যন্ত্র বসাবার পূর্বে মালিকগণের উচিত যন্ত্র চালাবার জন্য বিদ্যুৎ শ্রমিক সংগ্রহ করা। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দেখা কর্তব্য যে, যন্ত্র সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনকে খনিমুখ হতে নগরাবার জন্য যথেষ্ট রাস্তা-গাড়ীর ব্যবস্থা সময়মত করা হয়।

মূল্য, দালালী, লাভ

শ্রমিকের মজুরীর হার সম্বন্ধে পূর্বেই "শ্রমিক" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতঃ খনি মালিকের উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। সুতরাং এই বৃদ্ধির কিছু পরিমাণ লাঘব করবার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকার কয়লার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাতে বাংলা ও বিহারের কয়লা-ক্ষেত্রে কয়লার উৎপাদন ব্যয় গড়ে প্রতি টন ১৪ টাকা ৪ আনা ধরা হইয়াছিল। আর বিক্রয় মূল্য ধরা হয়েছিল গড়ে ১৬ টাকা প্রতি টন; '৪৮ সালের এপ্রিল মাসে উড়িষ্যার কয়লা খনি হতে উত্তোলিত কয়লার দাম বাড়িয়ে প্রতি টন ১৬ টাকা ৬ আনা করা হইয়াছিল। গত বৎসর অক্টোবর মাসে সরকার দালালীর হার কমিয়ে কোক কয়লার জন্য প্রতি টন এক টাকা আট আনা এবং অন্য কয়লার জন্য প্রতি টন আট আনা করে দিয়েছিলেন। গত এপ্রিল মাসে সরকার মিশ্র-শ্রেণীর কয়লার মূল্য কমিয়ে দিয়েছেন যাতে বর্তমানে 'এ' গ্রেড কয়লার মূল্য আজকাল বাড়িয়েছে প্রতি টন প্রায় ১১ টাকা, এবং 'এ' গ্রেড প্রায় ১০ টাকা ৪ আনা এবং ২নং গ্রেড ৯ টাকা।

কয়লার শিল্পে প্রায় ২০০টি যৌথ কোম্পানী রয়েছে। ইহারাই অধিকাংশ শিল্পটিকে পরিচালিত করে। তাহাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও কিছু খনি পরিচালিত হয়। ইহাদের সকলেরই লাভের হারের ওপর গত বৎসর এক সরকারী নির্দেশ জারী হয়েছে। মূল-

ক্ষতি" রোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার গত ডিসেম্বর মাসে এক আদেশ দিয়েছেন যে, লাভের বার্ষিক হার মূলধনের উপর শতকরা ৬ অর্থাৎ পূর্ব দুই বৎসরে লাভের হারের গড় (যাহাই অধিক হবে)—তার বেশী হতে পারবে না।

রেল ইঞ্জিনে কয়লা

ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক রেলগাড়ীর কয়লার ব্যবহারে ব্যয়িত হয়ে থাকে। বাজারে কোন সময় কোন কারণে কয়লা না পাওয়া গেলে রেলগাড়ীর চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা এড়াবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড নিজেরা কয়েকটী কয়লা খনি ক্রয় করেছেন: এই সকল খনির সমগ্র উৎপাদন ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। রেলের এই খনিগুলি হাজারীবাগ জেলায় অবস্থিত। মোটের উপর ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে যে, রেলের মোট কয়লা প্রয়োজন ভারতের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রেলের কয়লা খনিগুলির সমগ্র উৎপাদন ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় এক-অষ্টমাংশ; সুতরাং রেলওয়েসমূহের চাহিদার উপর বাজারে কয়লার বিক্রয় মূল্য নির্ভর করবে—এতে [illegible] কিন্তু বিগত ১৯৪৪ সাল থেকে [illegible] সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে [illegible] কয়লার বাজারের উপর রেলের চাহিদা [illegible] প্রভাব আর নেই।

রেল নিজ প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ উচ্চ শ্রেণীর [illegible] নিয়ে থাকে; কিন্তু এই শ্রেণীর কয়লা [illegible] ভাবেই প্রচুর হওয়া [illegible]। সুতরাং রেল ইঞ্জিনে উহার ব্যবহার অত্যন্ত [illegible] কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, রেল ইঞ্জিনের [illegible] এর পরিবর্তে নিম্নশ্রেণীর কয়লা [illegible] গাড়ীর পরিবর্তন, কিম্বা অন্য প্রকার উৎকর্ষ [illegible] বিশেষ কোন হানি হইবে না। বিগত যুদ্ধের [illegible] বৎসরে তৃতীয় শ্রেণীর কয়লা রীতিমত [illegible] করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের [illegible] থেকে রেলওয়ে বোর্ড এই শ্রেণীর কয়লা [illegible] বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে এই শ্রেণীর কয়লা [illegible] প্রায় ৫০টী খনি ১৯৪৮ সালের [illegible] করে দিতে বাধ্য হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ড নিজ প্রয়োজনের শতকরা অন্ততঃ ৫ ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর কয়লা গ্রহণ করুন—উক্ত প্রকার খনিসমূহের ইহাই দাবী। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসরণ করলে এই দাবী সমর্থন করতে হয়। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ডাঃ মিত্রসেনের (ইনি সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন) অধীন রেলে কয়লা ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা চলছে; আশা করা যায়, অচিরেই রেল ইঞ্জিনে নিম্নশ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণালীর উদ্ভাবন হবে।

গবেষণা

কয়লার ব্যবহার প্রণালীতে কিভাবে ব্যয়সঙ্কোচ করা যায় এবং কিভাবে উচ্চশ্রেণীর কয়লা সংরক্ষিত হতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ে যে গবেষণা ভারতে চলছে তার বর্ণনা স্থানে স্থানে পূর্বেই এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। ধানবাদে এক ইন্ধন-গবেষণা সংস্থা (Fuel Research Institute) স্থাপন করে ভারত সরকার এর উপর এই গবেষণার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করেছেন। ভারতীয় স্বার্থে কয়লার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ, কয়লা থেকে কৃত্রিম তেল, রং আদি দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নিকাশন, ধোলাই ও নিষ্কাশন দ্বারা কয়লার ব্যবহারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সংস্থা ধানবাদে নিজেদের গবেষণাগারে এবং বোম্বাই, জামশেদপুর, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গবেষণাগারে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

উপসংহার

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শিল্প-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে, শীঘ্রই এক জাতীয় কয়লা কমিশন (National Coal Commission) নিয়োগ করে উহার উপর কয়লা সম্বন্ধীয় সমস্যার বিচার অর্পণ করা হবে। এখানে বলা প্রয়োজন, কয়লা শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন দিক বর্তমানে ৩৪ টী বিভিন্ন সরকারী হাতে ন্যস্ত থাকায় অনেক সময় এই শিল্প-বিষয়ক সরকারী ব্যবস্থায় যথোচিত সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে। সুতরাং ১৯৪৬ সালের সরকারী কমিটী এইরূপ জাতীয় কয়লা কমিশন নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর কয়লাশিল্প জাতীয়-করণের পর একটী জাতীয় কয়লা বোর্ডের হাতে শিল্পটী পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে। তাই ভারতেও উক্ত প্রস্তাবিত কমিশন নিয়োগের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। গত বৎসর এক আইন প্রণয়ন করে ভারত সরকার খনিজ উত্তোলন প্রণালীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব

আমরা সমাধান করবো,—
অবশ্য আপনার সমস্যা যদি হয়—

কা গ জ

ভোলানাথ দত্ত (পেপার মার্চেন্টস্) লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালী ইত্যাদি
আমদানীকারক ও বিক্রেতা

৬৩এ, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১
ফোঃ [illegible] ৫১৭৮ [illegible] তার—"পেপারসিল্ক"

নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায়, এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে ভারতীয় কয়লা শিল্প ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

বর্তমানে কয়লা শিল্পে মালিকদের তিনটি সংঘ রয়েছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা পরস্পর বিবদমান। জাতীয় উন্নতির খাতিরে এদের বিলিত হয়ে গিয়ে একটি সংঘ সংগঠিত হওয়া কর্তব্য। সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট মালিক এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, ইহা আনন্দের কথা।

সুযোগ্য ম্যানেজার ভিন্ন কয়লা শিল্পের যুক্তিযুক্ত পরিচালন অসম্ভব। শিল্পটি যাতে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ ম্যানেজার পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ধানবাদে একটি মাইনিং স্কুল স্থাপন করেছেন। পূর্বে প্রতি-বৎসর এই স্কুলে ২৪ জন নূতন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হত, কিন্তু ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৮ করা হয়েছে এবং ক্রমে এই সংখ্যাকে ৯০ করা হবে।

ভারতীয় কয়লা শিল্পের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে এতক্ষণ প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি, এ থেকে শিল্পটির বর্তমান স্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হবে। এর মনোযোগের সঙ্গে এই স্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, স্থায়ী ও বিদ্যুৎ প্রবণশক্তি এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে উৎখনন কার্য - এই দুইটি বর্তমানে শিল্পটির প্রধান অন্তরায়। পরিবহনের অব্যবস্থাকে তত প্রাধান্য দিই না, কারণ এই অন্তরায় সাময়িক এবং সরকার এদিকে যেরূপ উদ্যোগী হয়েছেন তাতে আশা করা অসঙ্গত হবে না যে, অচিরেই এই সমস্যার সমাধান হবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন, কারণ বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি হচ্ছে না। ভারতের "ভূমি-ক্ষেত্রে যেরূপ ভূমির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র" অংশে বিভাজন একটি বিষম সমস্যা, কয়লাক্ষেত্রেও সেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত অনেক "খনি হয়েছে, অর্থনীতিসম্মত উপায়ে খনের উৎখনন হচ্ছে। আকারগত এই অসুবিধা দূর করতে একমাত্র উপায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র" খনিগুলি করেকটি করে খনিকে পরস্পরের সঙ্গে বিলিত করে দেওয়া। যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখননের আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যবহারিক সুযোগ তারা পেতে পারে।

কয়লা শিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান, সর্বতোভাবে এর উন্নতির উপর জাতির সমগ্র শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ নির্ভর করে। সুতরাং এই দিকে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের সমবেত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

উদ্বাস্তু সমস্যা

অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের স্বাধীনতা লাভের ছয়মাস পূর্ব হইতেই উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দিনের পর দিন এই সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্বাস্তু আগমন করিয়াছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৯ লক্ষাধিক লোক কলিকাতা এবং ইহার উপকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অনেকেই তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের আশ্রয়ে রহিয়াছে, সম্পন্নশালীরা জমি ক্রয় করিয়া বাড়ী তৈরী করিয়া নিজেদের আশ্রয়স্থল পাকা করিয়া লইয়াছেন। বেশীর ভাগ সেনানী ও ভিনরঙ্গ তাড়া প্রদান করিয়া যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাহাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কলে মিশ্র বাড়ীওয়ালাদের অতিরিক্ত লাভের সীমাহীন লোভ বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী ও দরিদ্র ভাড়াটিয়ার চরম বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দবিভাগের পূর্বে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে ভারতের নেতৃবৃন্দ যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হইলে উদ্বাস্তু সমস্যা এমন প্রবল আকার ধারণ করিত না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু-দের সম্বন্ধে যে কিছু করেন নাই, তাহা নহে, তাঁহারা ২৪ পরগণার হাবড়া অঞ্চলে, জলপাইগুড়ী, নদীয়া এবং বর্ধমানে কিছু পরিমাণ উদ্বাস্তুর পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাবড়া বাইপাস নামক স্থানে উদ্বাস্তুদের বসতি নির্মাণের জন্য ৩০৲ টাকা কাঠা দরে জমি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবসায়ী পুনর্বসতি বোর্ডের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রগুলি বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁরা জুন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন। উদ্বাস্তু-ছাত্রদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৫২টি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫০টি বিদ্যালয়ে দুইবার পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বেঞ্চ, পুস্তক ক্রয়, প্রভৃতি সাহায্য বাবদ এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইডেন গার্ডেনে উদ্বাস্তু-ছাত্রদের থাকিবার জন্য হোষ্টেল করিয়া দিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহনির্মাণের ব্যবস্থাকল্পে গভর্নমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য ৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বাবদ ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৭ লক্ষ উদ্বাস্তুকে সরকারী ক্যাম্পে থাকা ও বিনামূল্যে রেশন প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু আগষ্ট মাসের পরে সেই রেশন বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২৫ হাজার উদ্বাস্তুকে সরকারী খরচে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ৮ হাজার ৫০০ উদ্বাস্তুকে কার্যের বিনিময়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সাহায্যপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু মোট সংখ্যার অনুপাতে নগণ্য। পূর্ববঙ্গের

উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে অবিচার হইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্বাস্তু আসামে গিয়াছে। কিন্তু আসামে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা তো হয়ই নাই অধিকন্তু 'খদান খেদা' আন্দোলন আরম্ভ করিয়া উদ্বাস্তুদের বিতাড়নের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সরকারের নব পরিকল্পনায় ৬ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৪৯ সালের মে মাস পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে উদ্বাস্তুদিগকে ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে। দাবড়া থাইগাছিতে তিন হাজার একর জমিতে একটি ক্ষুদ্র নগর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে, এই স্থানে মোট ১২ সহস্র গৃহ নির্মিত হইবে। প্রথমে সেখানে তের হাজার একর জমী লওয়া হইবে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে ৩ সহস্র উদ্বাস্তুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ৪ হাজার ২০০টি গৃহ নির্মিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও তিন হাজার গৃহ নির্মিত হইবে। উদ্বাস্তুদের ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, কারখানা পুনরারম্ভের জন্য অর্থ সাহায্য, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি নানা প্রকার পেশা আরম্ভের জন্য ও অন্যান্য জীবিকা ও শিক্ষের জন্য ঋণ-দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার জন্য ভারত সরকার ৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪৯সালের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদিগকে ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনের তুলনায় এই সব বিধিব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পরিবার সংখ্যা ন্যূনাধিক ৪০ লক্ষ। উহার মধ্যে মাত্র ১৪ হাজার গৃহে ৬ সহস্র পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা হইতেছে। বাকী ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার পরিবার অনাশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার। ইহাদের পরিবার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭০০ পরিবার মুসলমানদের পরিত্যক্ত গৃহে বসবাস করিতেছে, ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪০০ পরিবার ক্রীত অথবা ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতেছে। বাকী সকলে আশ্রয়-শিবির ও ধর্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার জমিতে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ৪০ হাজার উদ্বাস্তু শিল্পাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উপার্জনক্ষম প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ৩২ হাজার লোকের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। পুনর্বসতি সম্বন্ধেও পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছে। দিল্লী নগরীতে

৪ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমন করিয়াছে। তাহাদের জন্য ইতিমধ্যে ২ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে, এবং আরও ১ লক্ষ গৃহ নির্মাণ কার্য চলিতেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ একর জমীতে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল পরিবারকে আগামী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

এখানকার উদ্বাস্তুদের স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য সরকার একক দক্ষতা বা সম্বলের ভিত্তিতে সরকারী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। উদ্বাস্তুদিগকে বাণিজ্যিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাদের চাকুরী সংগ্রহের জন্য নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সরকার যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এপর্যন্ত তাহারা ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছেন এবং চলতি বৎসরে আরও ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিবেন। ইহাও প্রকাশ যে, উদ্বাস্তুদিগকে পূর্ব-পাকিস্তানে ১৭ হাজার ও বিহারে ৪ হাজার দোকান ঘর বিলি করা হইয়াছে। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের মারফতে এপর্যন্ত ১ লক্ষ ১৮ হাজার উদ্বাস্তু চাকুরী পাইয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডও ১৫ হাজার উদ্বাস্তুর চাকুরীর ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বাস্তুরা কথঞ্চিৎ বিশেষ সুবিধা পাইলেও ইহাও মোটেই আশাপ্রদ নহে। অবশ্য ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬০০ উদ্বাস্তু পরিবারের ৩০ লক্ষ একর জমী লাভ অল্প সুবিধের কথা নহে। সরকার অবশ্য বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা হইতে পৃথক। কারণ, পূর্ব-পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা ভারতে আগমন করিয়াছে বটে কিন্তু ভারত হইতে মুসলমানরা পূর্ব-পাকিস্তানে গমন করে নাই। কাজেই মুসলমান পরিত্যক্ত গৃহ ও জমীতে হিন্দুদের বসতি স্থাপন করিবার সুবিধা হয় নাই। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের যেমন চলিয়া আসিতে হইয়াছে, ভারত হইতেও তেমনি জমী ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানরা চলিয়া গিয়াছে। এই কারণে সমীচীনতা অস্বীকার না করিয়াও ইহা বলা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গ হইতে যদি মুসলমানদিগকে পূর্ব-পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হইত তবে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২০ লক্ষ না হইয়া অন্ততঃ এক কোটি হইত এবং পশ্চিম বঙ্গের ৪০ লক্ষ মুসলমানের গৃহ ও জমীতে এক কোটি হিন্দুর বাসস্থানের ও গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হইত না।

উদ্বাস্তু-সমস্যা একটি জটিলতর সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গে ১৮ লক্ষাধিক একর জমী পতিত রহিয়াছে। ইহা আবাদ যোগ্য। উদ্বাস্তুদের ৫ লক্ষ পরিবারের ১ লক্ষকে শিল্প ও বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও শিক্ষানুযায়ী ঋণ প্রদান করিয়া ৪ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেককে ও একর জমী প্রদান করিলে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায় আগামী ফসল কাটা পর্যন্ত তাহাদিগকে ঋণ প্রদান করিলে, অনাবাদী জমী চাষ হইয়া খাদ্য সমস্যার সমাধানও অচিরে সম্ভব হইত এবং উদ্বাস্তুদের বসবাসের ও খাদ্য সমস্যারও সমাধান হইত। ইহা কল্পনা নয়, পূর্ব-পাকিস্তানে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬০০ পরিবার ৩০ লক্ষ একর জমী পাইয়াছে এবং আগামী ফসল কাটা পর্যন্ত সরকার তাহাদিগকে ঋণ প্রদান করিয়াছেন ৩৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ টাকা।

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে যে সব সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি আসিয়াছেন, কলিকাতা অথবা ভারতের অন্যান্য সহরাঞ্চলে তাহাদের বসতি পূর্বেই নির্মিত হইয়া রহিয়াছে অথবা তাহাদের বসতি নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কৃষক সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া কম পরিমাণে ভারতে আগমন করিয়াছে। উদ্বাস্তুদের ভিতর প্রায় সর্বাধিক সম্প্রদায়ের লোকই অধিকাংশ। সামান্য যাহা কিছু পুঁজি তাহারা সঙ্গে ও জমী প্রভৃতি বিক্রী করিয়া লাভ করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপযুক্ত সাহায্য পাইলে নিজেদের বসতবাটী ও কৃষিদ্বারা জীবনযাপনের ব্যবস্থা তাহারা করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তেমন কোন সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হয় নাই। বর্ধমান, বসলী প্রভৃতি স্থানে কোন কোন জমীদার উদ্বাস্তুদিগকে জমী প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জমীর অভাব কাটিয়া মাটি কেলিয়া ঠিক করিয়া দেওয়ার পরে তাহারা জমীর স্বত্ব লিখিয়া দিতে স্বীকার করায় সেই সব ক্ষেত্রেও অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহারা মনে করেন, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা তাঁহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালীর চেয়ে বিহারী, মাড়োয়ারী ও উড়িষ্যার সংখ্যা অধিক।

আচার্যদেবের জীবদ্দশায় পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। এই দুইটি জাতিকে যোগ করিলে অবাঙ্গালীর সংখ্যা কত দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুরা একবার আঁকিয়া দেখিলে ভাল হয়। বাঙ্গালীকে কালো বলি সহ্য করিতে না পারে তবে বাংলার বাহিরে দাক্ষিণাই তাহাদের যোগ্য প্রাপ্য। ইহা প্রাদেশিকতার কথা নহে। দেহের একটি প্রধান অঙ্গকে দুর্বল রাখা অন্য অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি বা সৌন্দর্যের লক্ষণ নহে। পশ্চিম বাংলার অন্ন সঙ্কট জটিলতর নহে, যে সামান্য ৪ লক্ষ টনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, অতি সহজেই তাহার পূরণ হইতে পারে। আবাদ-যোগ্য পতিত ১৮ লক্ষ একর জমীর মধ্যে মাত্র ১২ লক্ষ একর জমী যদি তাহারা ৪ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বণ্টন করিয়া দেন তবে ১৬ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি এবং কৃষি ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের অভাব পূরণ হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের সম্পদ বাড়িতে পারে। চারি লক্ষ পরিবারকে কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিলেও প্রায় একলক্ষ পরিবার অবশিষ্ট থাকিবে। এই এক লক্ষ পরিবারের জন্যে সম্ভ্রান্তশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা খুঁজিলে, হয়তো দশ সহস্রের অধিক হইবে না। তিন লক্ষ পরিবারকে কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে এবং বিভিন্ন অন্যান্য পেশায় বাকী এক লক্ষ পরিবারকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা যায়। সে জন্য অবশ্য শিল্পোন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশে যন্ত্রশিল্প খুবই দুর্বল। অন্যান্য শিল্পের বাংলাদেশে পঞ্চাশৎপর, সেই শিল্প ও অন্যান্য

শিল্প গড়িয়া তোলার এ প্রদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সমাধানের প্রচেষ্টার বাঙ্গলার ধনির সঙ্গে শিল্পের উন্নয়নও আজ প্রয়োজনীয়, কিন্তু বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাতে শিল্পের উন্নয়ন সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। বেকারের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে নূতন লোকের কর্ম-সংস্থাপন সুদূরপরাহত। অথচ ইহাদের কর্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতে যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহাকে নির্ব্বাপিত করা একটা বিরাট সমস্যা রূপে দেখা দিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের এমন অনেক অধিবাসী আছেন, যাহারা দীর্ঘকাল চাকুরী অথবা নানাবিধ পেশা উপলক্ষে কলিকাতা অথবা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে বাস করিতেছেন, বঙ্গভঙ্গের পরে তাঁহারাও উদ্বাস্তুদের মতই পৈতৃক বাস্তুভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ উদ্বাস্তুদের খাতায় তাদের নাম নাই। তাদের সম্বন্ধেও সরকারের বিবেচনা করা দরকার। সেজন্য উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদিগকে বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্য বন্দোবস্তের সুবন্দোবস্ত করে জমী বিলি করা প্রয়োজন। উদ্বাস্তুদের বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্য সরকারী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সহজে পরিশোধ্য কিস্তীতে পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বাসিন্দাদিগকেও বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুরা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়। বাংলার রাজনৈতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ রহিয়াছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্ম-ত্যাগের ঐতিহ্য ইহাদের রহিয়াছে। এই সব কারণেই আত্মসচেতন পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের "ভূ-স্বর্গ" আখ্যাদানে শ্রেষ্ঠের সিদ্ধান্ত সার্থকতা-মণ্ডিত হয় নাই। আফ্রিকার নিগ্রোরা আমেরিকায় জমল কাটিয়া সাফ করিয়া প্রকৃত বনভূমিকে সমৃদ্ধিশালী নগরে ও বন্দরে পরিণত করিয়াছে, আবাদের অযোগ্য পতিত জমীকে সোনা ফলাইয়াছে, খনি হইতে কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য উত্তোলন করিয়া আমেরিকাকে জগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু সেই নিগ্রোরা আজও রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, আজও লিঞ্চিং প্রথা তাহাদের উপর হইতে উঠিয়া যায় নাই। বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী সেই ইতিহাস জ্ঞাত আছে বলিয়াই আন্দামানকে স্বর্গে পরিণত করিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলিয়া দিতে চাহে নাই। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গমাতার বিশাল বক্ষে যদি তার এই সন্তানের ঠাঁই না হয়, তবে তারা খুবই পরিতাপের কথা।

গত দশ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় প্রায় চারিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৪৯-৫০ সালে উহা ৪,৬০৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতুই টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর

"শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা

গেঞ্জী সর্ব্বত্র সমাদৃত

ফ্যাক্টরী :—৩২।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা

ফোন : বি-বি ৬০৫৬

কাগজের ব্যবসায়ে

গোপীনাথ পাল এণ্ড কোং

ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৮৯০

বেঙ্গল পেপার মিলের ডিলার

ও

ইষ্টার্ণ এষ্টেটসের সোল ডিষ্ট্রীবিউটার্স

সকল প্রকার বিলাতী কাগজ ও বোর্ড আমদানীকারক

১০৯, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বড়বাজার ২৭৫৬ গ্রাম : রং কাগজ

আর্থিক সংকট ও কৃষি

অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রম-প্রসারমান আর্থিক সংকট যে তার অক্টোপাশের বাহুবন্ধনে ভারতের জীবনের সর্বক্ষেত্রকে নিষ্ঠুরভাবে, অমোঘভাবে পেষণ করে ধরেছে, বিভিন্ন শিল্প তথা কৃষির ক্ষেত্রে গরীব ও মধ্যবিত্তের দল তাদের জীবিকার ক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হ'তে দেখছে, অন্ততঃ আপাততঃ তাদের জীবন থেকে আশার আলোকরেখা ক্রমশঃই দিগন্তে যাচ্ছে, পরিতাপের বিষয় সুগৃহীত গবেষণামূলক তথ্যাবলী দ্বারাও এ সত্য আজ সহজেই বোঝা যায়। দেশের খুব বেশির ভাগ লোকেরই জীবন আজ এই ক্রমবর্ধমান নিদারুণ আর্থিক সংকটের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা এর সত্যতার চেহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। দামাভাবে সংসারের মোট আয়টি কমে যাচ্ছে, অথচ সংসার খরচ কমাতে কমাতে ইতিমধ্যেই যেখানে এসে পৌঁছেছে, শিরক বেঁচে থাকতে হ'লে তার চাইতে আর কমানো চলে না,—ওদিকে আবার জীবনধারণের গড়পড়তা মোট খরচ এর পরও বেড়েই চলেছে (কেন্দ্র তথা প্রদেশের সরকারী মুখপাত্রদের কিছু দিন অন্তর অন্তর বিপুল বিবৃতি এবং প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও), ভারতের প্রায় সত্তরকরা নিরেনব্বুই জন মানুষের চোখে তাদের বাস্তব জীবনযাত্রা বর্তমানে এই আলোহীন ছায়াহীন, আশাহীন অতি দুর্বহ-রূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকে ইতিমধ্যে দু'একবার কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের মত বড় শহরে বৈজ্ঞানিক সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে দু'একটী অঞ্চলে যুক্তিসঙ্গতভাবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা হয়েছিল, তার ফলেও অবস্থার ভয়াবহতা সুনির্দিষ্টভাবেই বোঝা গেছল। চাকুরীতে থেকেই সংসারের প্রতি সাধারণ কর্তব্য করে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর ওপর বেকার-সমস্যাও সাঘাতী রূপ ধরেই ক্রমশঃ অতি ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করছে। এ সম্বন্ধেও প্রমাণের জন্য অঙ্কের বাজারের দরকার নেই, দেশের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকেরই যুবক-যুবতীদের দিনের পর দিন নিজেদের করুণ অভিজ্ঞতাই এর পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতিকালে এই ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যার ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্করকে মেনে নিতে প্রায়ই ইতস্ততঃ করেন। তবু এটা লক্ষণীয় যে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেস-ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া (সংবাদ) প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের পুনর্বসতি ও চাকুরী সংস্থান বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বেকার-সমস্যা বেড়েই চলেছে। ঐ তারিখে তাঁর দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, গত জুলাই মাসে তার আগের মাসের (অর্থাৎ জুন) তুলনায় ৫,৬১৩ জন বেশি ব্যক্তি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু জুলাই মাসে যাদের চাকুরী জুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা জুন মাসের তুলনায় বেশি তো নয়ই, বরং অনেক কম,—১,৯২০ জন কম। চাকুরী সংস্থানের ক্ষেত্রগুলো ক্রমশঃ ঘুরে আসছে, সংকুচিত হচ্ছে, তাই এ রকম হচ্ছে বলে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলোর সামনে যে উপযুক্ত কর্মপ্রার্থী যুবকযুবতীর দল রোজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে গিয়ে 'কিউ' করে দাঁড়ায়, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথারীতি হতাশ মুখে বাড়ী ফিরে আসে, তারা তো জানেই, অবশ্য সর্বাত্মক শোচনীয়তার চিত্র উক্ত সংক্ষিপ্ত সরকারী নোটে অত্যন্তমাত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সর্বগ্রাসী সাধারণ আর্থিক সংকটের আবহাওয়ার মধ্যে ছাত্র ও সংস্কৃতিকে কি বাঁচানো সম্ভবপর এবং কতখানি বাঁচানো সম্ভবপর? সকল দেশের সমাজেই শিক্ষা ও ছাত্র জীবনের প্রত্যক্ষ ধারক ও বাহকদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক প্রভৃতি। জাতির জীবনের শিক্ষা, আর্ট ও কৃষ্টির পুরাণো ঐতিহ্যের মহিমান্বিত ধারাকে এঁরাই বহমান রাখেন, নব সৃজনশীলতার মধ্যে তাকে সমৃদ্ধতর, গভীরতর ও অধিকতর ফলবান্ করেন। জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য, উচ্চতর আদর্শ ও উচ্চতর সংগ্রাম সম্বন্ধে এবং দেশকে এগিয়ে দেবার সামাজিক ও দেশপ্রেমিক দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের বাস্তবের জাগ্রত, শিক্ষিত ও সক্রিয় করে রাখবার জন্যই একই সঙ্গে এঁদের জীবিকা তথা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার জীবনের 'বিষান'। কিন্তু যদি এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে, এই পরিচালক বৃত্তির পথে তাঁদের উপযুক্ত ও অল্প জীবিকা অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা হ'লে? তা হ'লে কি তাঁদের বৃত্তির এই 'বিষানের' দিকটা উপযুক্তরূপে সম্মানজনকরূপে পূর্ণ করা আর সম্ভবপর? সমাজ ও জাতির কি সে ক্ষেত্রে এ কথা মনে করবার আশা করবার কোন নৈতিক অধিকার আছে যে তা সম্ভবপর? মনে রাখতে হ'বে যে দেশের অন্যান্য দেশে, তেমনি বাংলাদেশেও সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি এঁরা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই লোক। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশে তথা কর্মক্ষেত্রে ভারতের সকল প্রদেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে আর 'মধ্য-বিত্ত' নয়, অন্যান্যদিক থেকে বিত্তহীন, সমাজের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিপুল অর্থ নৈতিক বিপ্লবের চাপে, স্রোতের টানে তারা নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা। মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর এই সাধারণ দুর্ভোগের অংশ সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে স্বাভাবিক ভাবেই নিতে হ'লেও এ কথা মনে করবার কারণ আছে যে, এখন কি বর্তমান পারিপার্শ্বিকতাতেও তাঁদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা অবস্তাবী হওয়া উচিত নয়, অবস্তাবী হতে দেওয়া উচিত নয়। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানাম, জনশিক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জাতির মানস জীবনকে রক্ষা ও প্রসারিত করবার একান্ত কাজই যাদের কাজ, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা জাতির নিজেরই দুরন্ত স্বার্থ। তাঁদের অন্ন বস্ত্র জীবিকার ব্যবস্থা করে নিজ নিজ পথে তাঁদের জাতি-গঠনের কাজ, নিজ নিজ কর্মক্ষমতানুযায়ী দেশের তরুণ সমাজ তথা সাধারণ মানব-সত্যতাকে ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী উচ্চতর স্তরে অগ্রসর করিয়ে দেওয়ার দুরূহ জরুরী কাজে যথোচিত সাহায্য করতে সমগ্র জাতিরই সুস্পষ্ট স্বার্থ

বলছে। এ কথা স্মরণ করেও এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা যাতে অনিবার্যরূপে শোচনীয় না হয়ে পড়ে, তা দেখবার জন্য রাষ্ট্র ও নীতির একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। 'স্বাধীন' ভারতেও উপযুক্ত কর্মফলে এই বাহ্যিক-সচেতনতা মোটেই আশানুরূপ পরিস্ফুট নয়, দুঃখের হলেও উক্তরূপ সত্য। ফলে জীবনের বিভিন্ন অংশে ও ক্ষেত্রে যে বিষম সঙ্কট নানাভাবে ঘনীভূত হচ্ছে, সাধারণ আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে এক সাথে মিলে তা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে বড় বিপদজনক সূচক।

শিক্ষকদের অবস্থা বলুন না। এই বাজারেও সব মিলিয়ে মাসিক বেতন মাত্র ১৪৫৲ টাকা পান, এরকম গ্রাইবেরী শিক্ষকের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গের বহু গ্রামে আজও বহু মিলবে। তা-ও এই মাসিক হারের বেতনটা প্রায়ই তাঁরা নিয়মিত পান না। ৩।৪ মাসের বেতন এক সঙ্গে জমে গেছে, তারপর ওপরওয়ালাদের কাছে অনেক ধরাধরি করে তা আদায় করা সম্ভব হয়েছে, এ রকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। অথচ, মনে রাখতে হবে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষার প্রথম বনিয়াদ এঁরাই গড়ে থাকেন। [illegible] খরচ এই অনুন্নত হারে থেকে যাওয়া সত্ত্বেও হাড়ভাঙানী খাটুনির বিনিময়েও [illegible] শিক্ষকেরও সব মিলিয়ে মাসে ৬০।৭০ টাকার বেশি মিলে যাওয়া শক্ত, এরকম হাই স্কুলও [illegible] পশ্চিম বাংলায় অনেক মিলবে। ফলে মেহাৎ বেঁচে থাকবার তাগিদেই দিনরাত টিউশনী করেন তাঁরা। (অনেক সময়ই যে মোসলত মাসিক বেতনের বিনিময়ে)। টিউশনীর খোঁজে সারা ইস্কুল প্রাঙ্গণ তন্নতন্ন ও সক্রিয় রাখেন তাঁরা,—মেহাৎ এইজন্যই কাজেই স্কুলের [illegible] চাকুরীটি চালিয়ে যান তাঁরা।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তথা [illegible] শাসনাদি বিভাগের অন্যান্য বিভিন্ন [illegible] থেকে যারা বিমুক্ত হন, তাঁদের যারা শিক্ষাদানের ভার থাকেন, দেশের উচ্চতর শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর সেই অধ্যাপকদের বেতন কিন্তু উক্ত সব সরকারী চাকুরীজীবীদের তুলনায় অন্যান্য লজ্জাকররূপ নীচু। দেশের স্বাধীনতার তথা যাবতীয় দেশহিতকর আয়োজন থেকে দেশের তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাধর যুবকদের সরিয়ে এনে নিজেদের হাতে রাখবার উদ্দেশ্য থেকেই বৃটিশ শাসক শিক্ষা বিভাগের তুলনায় ঐ সব সরকারী চাকুরীকে অনেক বেশী লোভনীয় করেছিলেন। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটাই যে মেহাৎ একটা ছুরভিসন্ধি থেকে প্রসূত, তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। তাই, পুরাতনো সংস্কারবশে নয়, মেহাৎ কাজের সত্যকার গুরুত্ব ও মূল্য বিবেচনার মাধ্যমেও থেকেই বিভিন্ন বৃত্তি ও চাকুরীর বেতনাদি পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের সরকার আজও কোন বিপ্লবাত্মক বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। এক কলেজের বেতন থেকে সংসার চালানো এবং পদোচিত মর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব হয় না বলে অধিকাংশ অধ্যাপকই তাই আজকাল একই সঙ্গে দু'টো কলেজে চাকুরী করে থাকেন, বা অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতার বা অন্য কোন চাকুরীও গ্রহণ করে থাকেন। তার ওপর টিউশনী করা, নোট লেখা প্রভৃতিও করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপে বহুবিধ পথে জীবিকা-অর্জনের শ্রম ক্লান্ত অধ্যাপকের কাছ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধ্যাপনার উচ্চতম আদর্শ বজায় রাখতে পারা আশা করা চলে না, তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও হয় না। জীবিকার জন্য একটিমাত্র কলেজে অধ্যাপনা করবেন, এবং বাকী সব সময়টা পড়াশুনা, গবেষণা ও লেখার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের অগ্রগতির কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবেন, অধ্যাপকের বৃত্তির এই আদর্শ অধিকাংশে অধ্যাপকের জীবনেই আজ আর সত্য ও সার্থক নয়। এ জন্য তাঁদের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে ছোটা সমাজেরই প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। তারপর শুধু বেতনের স্বল্পতা নয়, পশ্চিম বাংলার বহু স্কুল-কলেজেই (অর্থাৎ বেসরকারী) চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেতনের গ্রেড, চাকুরীর অন্যান্য সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির দিক্ দিয়ে অবস্থা আজো বিশেষ হতাশাজনক। এটাও লক্ষণীয় যে, ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হাতে আসবার পর যদিও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কোথাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু আজো করা হয় নি, শুধু দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা, ইষ্ট-পি প্রভৃতি প্রদেশেও প্রারম্ভিক বেতন, বেতনের গ্রেড প্রভৃতি ব্যাপারে যেটুকু যা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে (সব ব্যাপারে প্রগতিশীল বলে আমাদের গর্ব সত্ত্বেও) তা-ও আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হ'ল না। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতনাদির অনেক তারতম্য করাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধি-

ভারতীয় কাঁচের দ্রব্যের জন্য

বলসুখ গ্লাস ওয়ার্কস

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঁচের দ্রব্য প্রস্তুতকারক

প্রোপ্রাইটারস :—

এস, আর, দাস এণ্ড কোং

কারখানা :
৪বি, হাওড়া রোড, হাওড়া

অফিস :
৭, সোরালো লেন, কলিকাতা ১

মূলক 'পলিসি'রই একটা অংশ ছিল। 'স্বাধীন' ভারতেও তা কিছু কম করা হয় নি।

সংবাদপত্র জনশিক্ষার প্রধানও বাহন এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও নাগরিক বোধের ব্যাপারে শিক্ষাদানের পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র, এই বহু-উচ্চারিত সত্যটির আর পুনরুল্লেখ দরকার করে না। কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক কাজটি সাধারণ-পত্রের লেখার মারফৎ যাঁরা করে থাকেন, সেই সাংবাদিকদের বাংলাদেশে বর্তমানে অবস্থা শোচনীয়। অর্থাৎ আমি দু'চার জন ভাগ্যবান্ মোটা বেতনভুক্ সাংবাদিকের কথা বলছি না,—তাঁদের অধিকাংশের বাস্তব অবস্থাটাই বোঝাতে চাচ্ছি। গত তিন বছরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার 'জাগরণ', 'উষা', 'ভারত', 'কৃষক', 'নবযুগ', 'প্রত্যহ', 'অর দিন', 'ইয়ার্থ এক্সপ্রেস', —এই আটখানি ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেগুলো বর্তমানে চলছে, তাদের মধ্যে অন্ততঃ খান চারেকের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২।১ খানাতে তো ইতিমধ্যেই প্রায় অচলাবস্থা এসে গেছে। যেখানে কর্মচারীরা দু'মাস আড়াই মাসের বেতন পাওনা র'য়ে তবে কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে এক মাসের বেতন পান, তা ছাড়া সেগুলোর প্রত্যেকটির বাজারের দেনা বহু হাজার টাকা,—যে কোন সময় কাগজ বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। উক্ত যে সব দৈনিক বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলোর কর্মচারীদের মোট শতকরা পঁচিশ জনও অন্য কাগজে ইতিমধ্যে কাজ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। কারণ তার পর এর মধ্যে নূতন কাগজ ৭।৮ খানার বেশী হয় নি; আর সেগুলোতেও নূতন প্রয়োজনের চাইতেও কম লোক নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে, আর তাই বেকার সাংবাদিকদের বেশির ভাগই বেকার হয়ে রয়েছেন। উক্ত যে সব খবরের কাগজের প্রায় বাড়িঘর ওঠবার উপক্রম হয়েছে, সেগুলোর কর্মচারীরাও সম্ভবতঃ শিগগিরই বেকার হবেন, এবং এখনো বেকার না হলেও যে হারে এবং যে ভাবে তাঁরা মাইনে পাচ্ছেন, তাতে এখনি তাঁদের অর্ধ-বেকার বলা চলে। চুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কলকাতার পুরানো বহু সংবাদপত্রগুলিতেও উপরের দিকের বিভাগে নীচের দিকের কর্মচারীরা যে বেতনাদি পান, এই ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে তা-ও বহু ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। উক্ত যে কাগজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যেগুলো সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে, এগুলোর এই দারুণ বিপর্যয়ের পেছনে আছে বহু কারণ, এবং সর্বত্র অবশ্য এক কারণ নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে সাধারণ মন্দার ফলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ অনেক হ্রাস হওয়া (মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর আধুনিক সংবাদপত্রকে অন্যান্য যেনি করেই নির্ভর করতে হয়), মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সংবাদপত্রের বিশেষ পলিসির জন্য সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা হারানো ও বিক্রী কমে যাওয়া, ডিরেক্টারদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল, নূতন কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে একটা দীর্ঘ সময় ধরে মাসের পর মাস হাজার হাজার টাকা লোকসানের জন্য প্রস্তুত থেকে উপযুক্ত মূলধন ও মনোবল নিয়ে কাগজ শুরু না করা,—এ সমস্ত কারণ আছে। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার পর আর একটা খুব বড় কারণ উপস্থিত হয়েছে। যাংলা দেশের সব রকমের কাগজ পূর্ববঙ্গেই (বিশেষ করে সর্বরকমের সংবাদের পৃষ্ঠপোষক পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে) অনেক বেশী বিক্রী হ'ত পশ্চিম বঙ্গের চাইতে। রাজনৈতিক দাবা-খেলায় যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বর্তমানে ঘুলোৎপাটিত লতার মত, তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পূর্ববঙ্গে রয়ে গেছেন বা যাঁরা ভারত ইউনিয়নে চলে এসেছেন, দু' দলেরই খুব বেশির ভাগ মানুষেরই আর্থিক তথা মানসিক—দুই অবস্থাই একান্ত করুণ। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরও অধিকাংশে নানা রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম বাংলার (তথা, সাধারণভাবে ভারত ইউনিয়নের) কোন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজী নন। তাই বাংলার সংবাদপত্রের বহু বাজার পূর্বঙ্গ প্রায় ফসে গেছে, আর এ ক্ষতির পূরণ পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র-পাঠক ও ক্রেতাদের মধ্য দিয়ে যতে এখনো অনেক দেরী। এই সব নানা কারণে সংবাদপত্রগুলো মার খেয়েছে ও খাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শত শত সাংবাদিকের বেকার, বা অর্ধ-বেকার অবস্থা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চার পাঁচ বছরে এই ক্রমশঃ ঘিয়ে-ভরা, পিঠে-ভরা আর্থিক সঙ্কটের কথা ভেবে চাঙ্গুরীতে থাকাকালীনও সংবাদ পরিবেষণ ও সংবাদ সম্পাদনার ব্যাপারে বেশতও দোষ রেখে জাতির প্রতি নিরপেক্ষ কর্তব্য করবার মনোভাবে চুল থেকে কাজ করতে পারছেন বর্তমানে খুব কম সাংবাদিকই। এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির বাজারে তাঁদের অধিকাংশই যে বেতন পান তাতে সংসার চলে না। ফলে, যা এক থেকেই উদ্ভূত আর্থিক অনিশ্চয়তা-বোধ থেকে, (এবং অন্যান্য কারণে) তাঁদের অনেকেরই নৈতিক অধোগতি আজ সুস্পষ্ট; মতের স্বাধীনতা বিকাশের তো ছাড়াও কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সামান্যতম দীনতা, সুবিধাবাদ, এ সব দোষে তাঁদের অধিকাংশই আজ দুষ্ট। সাংবাদিকের কাজ গোড়ার দিকে এদেশে একই সঙ্গে পেশা এবং একটা বৃহৎ আদর্শবাদ দাবনের উপায় ছিল। এখন যে এটা ক্রমশঃ নিছক একটি চাকুরীবাজের পর্যবসিত হয়েছে, সংবাদপত্রের সাহায্যে যে কোন ভাবে যোক্ত জীবিকার্জন করা ছাড়া সাংবাদিকদের প্রায়ই আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এ-ও সত্যের একটি সঙ্কট সৃষ্টি করে, এবং খুঁজতে খুঁজতে তলায় গেলে দেখা যায়, অর্থ নৈতিক সঙ্কটই প্রধানতঃ এই অবস্থার জন্মদাতা।

জাতিকে বড় করবার জন্য সাহিত্যিক, চিত্রকর, গায়ক এবং অন্যান্য সব শিল্পীর যে সমাজ-জীবনে একটি অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে, এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত সত্য এবং এ নিয়ে এখানে বিশদ বিশ্লেষণ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যেমনি সংবাদ-পত্রের ক্ষেত্রে তেমনি আর্টের ক্ষেত্রে, মূলতঃ সমাজই সাধারণতঃ এর সব চাইতে বড় সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। তাঁরাই পয়সা দিয়ে বই কেনেন, খবরের কাগজ কেনেন, বিভিন্ন শ্রেণীর আর্টের সৃষ্টি ও প্রসারকল্পে পয়সা খরচ করে তাদের আনুকূল্য করেন। এবং যেমন সংবাদপত্রের বেলায় তেমনি এক্ষেত্রেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই ছিলেন বেশী উদারী। কিন্তু পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ এখন বেঁচে থাকবার মোহে প্রাথমিক খরচগুলো মেটাতেই হিমশিম

বেরেশ্বুক্তেন্দ্রের বিশেষতঃ পুস্তকের চিত্রসূচের অবশ্যকীয়-মূল্যবৃদ্ধির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিনে যাঁরা বই পড়েন, পড়ী বলে করে যাঁরা আনন্দের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমবদারি করেন, তাঁরা নিজেরাই আজ দুর্গত। তাই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীর জীবিকাও বিপন্ন। সব সময়ের কর্মীদের জন্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতর বিকাশ এবং শ্রেষ্ঠ আর্ট সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। দেশের লোকের সাধারণ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসাধারণের মধ্যে রসবোধসম্পন্ন নরনারীর অপ্রাচুর্য এবং অন্যান্য কারণে এদেশে শুধু সাহিত্যিক বা অন্যবিধ আর্টের আশ্রয়ে পূর্ণ জীবিকার্জন চিরকালই অধিকাংশ সাহিত্যিক বা শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু কতগুলো কারণ-সমবায়ের জন্য, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন হওয়া সুরু হয়েছিল: এমন কি কিছুটা খ্যাতিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক বা গায়ক প্রভৃতিও শুধু এরই সাহায্যে তত্ত্ব ও সচ্ছলভাবে সংসার চালাতে পারবার অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সাধারণ মধ্য শ্রেণীরা অতি-মাত্রায় ক্ষয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে সংকুচিত, বিষ-জর্জরিত করে তুলেছে। নূতন বইয়ের তেমন কাটতি হচ্ছে না দেখে প্রকাশক উপযুক্ত টাকাটি দিয়ে লেখকের বই নিতে আর তেমন রাজী হ'ন। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধশালী সাময়িক পত্রের মালিক ও সম্পাদকেরা দেখেন যে, মাঝারি লেখকের ভালো লেখা ছাড়াও মাঝে মাঝে পাঠবিলাসী লেখার কাগজ টেনে দিলেও মাসিকপত্র, সাপ্তাহিকপত্র বেশ চলে যায় (এ সত্যটি অবশ্য বাংলা দেশের পাঠকসাধারণ-সাধারণের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়)। তাই উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে ভালো লেখকের ভালো লেখা নিতে তাঁরা আর তত উৎসুক হ'ন। এই সমস্ত কারণে সাহিত্যিক ও শিল্পীকে অন্যভাবে সংসার প্রতিপালনের (তাঁরাও যে রক্তমাংসের সামাজিক মানুষ, এবং তাঁদেরও যে সংসার আছে, কাজেই একথাটি ইচ্ছে করেই যথেষ্টরূপ মনে না রাখা সমাজের একজন সাহিত্যহীনতার বিলাস ছাড়া কিছু নয়) জন্য অন্য চাকুরী বা কাজ করতে হচ্ছে। তাতে করে অনুজনসুলভ সন্ধ্যা কাজে যত সময় নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়াও সে সব কাজে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরকম যে, তাতে যদি খেলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রোজগারে পরোক্ষে পারবার নিশ্চয়তা থাকলেও সে সব চাকুরীর আবহাওয়া এমন যে, তাতে তাঁদের সৃজনপ্রতিভার ধার ক্রমশঃ ক্ষয়ে আসে। এই ব্যাপার সমাজ ও জাতির জীবন, স্বাস্থ্য ও প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটা ব্যাপার।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবনকে অবলম্বন করেই জাতির বৃহত্তর জীবনের অগ্রগতি সম্ভবপর হয়। সারা ভারতের মধ্যে বিশেষ করে এই দিক দিয়ে তার ঐতিহ্যগৌরবের কীর্তিকলা নিয়ে বাঙ্গালীর একটি বিশেষ গর্ব ছিল, এবং সেই গর্বের সত্য যাথার্থ্যও ছিল। বাঙ্গালীর জীবনে আজ নানা দিক দিয়েই ঘন কালো ছায়া নেমে আসছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের সকল প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা অফিস ও এজেন্সী আছে।

—মূলধন—

অধিকৃত	১,২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	১,১৮,৯১,৮০০৲
আদায়ীকৃত	৭৮,৪৭,৪০২৲ ,,
মজুদ তহবিল	৪২,০০,০০০৲ ,,

ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, ইউ, এস, এ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, পেনাং ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানেও এজেন্সী রহিয়াছে।

এস, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

বি, কে, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

কিন্তু যে বিস্তৃত গভীর উৎস থেকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি আহরণ করে বাঙালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্বন্ধে বাস্তব হওয়ার সাধনায় রত থাকতে পেরেছে, সেই শিক্ষা ও দীক্ষার জীবনকে যদি বাঁচানো যায় তবে হয় তো শেষ পর্যন্ত আর সব ঠিক হয়ে যাবে। মনুষ্য চারিপাশের এই যত বিভিন্ন সমস্যা সংঘাত ও আবর্তের চাপে বাঙালীর সর্বনাশ অনিবার্য, একথা কিন্তু অতিরঞ্জন নয়। বাংলার (অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার) শিক্ষা-সংস্কৃতি কিভাবে বিপন্ন হতে বসেছে, তারই কয়েকটি দিকের আংশিক, সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র ওপরে করা হয়েছে। দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, জনসাধারণের উপার্জন-ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার সাধারণ মানের উন্নয়নের সঙ্গে এ সমস্যার সমাধান অনেকাংশে জড়িত তা ঠিক। কিন্তু যেহেতু সে সময় আসা পর্যন্ত এজন্য অপেক্ষা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, তাই দেশের সরকারী ও বে-সরকারী কর্তৃপক্ষ তথা জনসাধারণের বিবেকীয় অংশীয় সমস্যে একান্ত সচেতন হয়ে এই পারিপার্শ্বিকতাতেও অবস্থার উন্নতির জন্য যা যা সম্ভাই করা সম্ভব, তার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করা দেশের অধিকতর মঙ্গলই একান্ত দরকার।

কুটীর শিল্পে গুড়

শ্রীবরলাল ভট্টাচার্য, এম্-আর-ই-এস্

আমরা গুড় বলিতে কেবলমাত্র খেজুর, তাল ও আখ হইতে প্রস্তুত বলিয়াই জানি। আখ, তাল ও খেজুর গাছগুলি দেখিলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই সকল গাছের রস জাল দিয়াই গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আরও বহুবিধ গাছ রহিয়াছে যাহার ব্যবহার আমাদের জানা নাই। অবশ্য নারিকেল ও সাবু গাছ হইতে প্রাপ্ত রস জাল দিয়াও গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহা আমাদের পশ্চিম বঙ্গে জানা না থাকিলেও মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন অঞ্চলে চলিত রহিয়াছে। নারিকেল ও সাবু গাছ ভারতবর্ষে গুড় প্রস্তুতের কাজে কিরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	গাছ প্রতি উৎপন্ন গুড় (পাউণ্ড)		বৎসরে উৎপন্ন গুড় (টন)	
	নারিকেল	সাবু	নারিকেল	সাবু
মাদ্রাজ	৭৪	১৪০	২,৭০০	৯০০
ত্রিবাঙ্কুর	১০০	২৪০	৪০	২০
কোচিন	১০০	৮৪০	৩০০	১,৪০০

পশ্চিম বাংলায় সাবু গাছ প্রায় নাই বলিলেই চলে, কিন্তু নারিকেল গাছ বহু রহিয়াছে যাহা আমরা গুড় প্রস্তুতকরণে ব্যবহার করি না। অনেকের ধারণা যে, নারিকেল গাছ গুড় প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হইলে ফল নষ্ট হইয়া যাইবে বা কম পাওয়া যাইবে। ইহাতে কিছু সত্য থাকিলেও বিশেষজ্ঞদের মতে নারিকেল গাছ প্রাপ্ত বয়সে কিছুদিন রস নিঃসরণের জন্য ব্যবহৃত হইলে ফলন বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উপরে উল্লেখিত গাছগুলি ব্যতীত আরও গাছ রহিয়াছে, যাহা হইতে আমরা রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে পারি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে গাছের রসে শর্করাংশ আছে বা যাইতে পারিবে, সেই রস জাল দিলেই গুড় প্রস্তুত হইবে। অবশ্য যে রসে শর্করাংশ বেশী থাকিবে তাহাই গুড় বা চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে অধিক উপযোগী হয়। ভারতবর্ষে যে সকল গাছ জন্মাইয়া থাকে তাহার কতগুলি গুড় বা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, নিম্নে তাহার কতক হিসাব দেওয়া হইল :—

গাছের নাম	কত বৎসর পর রস জন্মে	কত বৎসর রস পাওয়া যায়	রসে শতকরা শর্করাংশ
খেজুর	৫-১০	৩০	১০
তাল	১৫-২০	৫০	১২-১৫
নারিকেল	৭-১২	৪০	১৫-২০
সাবু	১০-১২	২৫	১৫-২০
নিপা	৪-৫	৫৫	১৫
ক্যাবুল	৫-১০	১৫-২০	১৫-৫
মুচি	৫-১২	২৫-৪৫	

উপরে উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, নিপা, ক্যাবুল ও মুচি—এই তিন প্রকার গাছ গুড় প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। এই সকল গাছ ভারতবর্ষে প্রচুর পাওয়া যায় অথচ ইহাদের ব্যবহার আমাদের জানা নাই। ক্যাবুল গাছ সম্বন্ধে Dr. Roxburgh বলিয়াছিলেন, "I cannot would recommending to everyone who possesses lands particularly such as are low and near the coast of India, to extend the cultivation thereof as much as possible. The palm wine itself and the sugar it yields...are objects of very great importance." মুচি ও নিপা গাছ পশ্চিম বাঙ্গলায় জন্মাইয়া থাকে। অবশ্য মুচি গাছ সম্বন্ধে আমরা অপরিচিত থাকিলেও নিপা গাছের ব্যবহার আমাদের কতক জানা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলে এই নিপা গাছ প্রচুর জন্মায়। আমরা এই গাছের পাতায় মোড়া দিয়া থাকি এবং সুন্দরবন অঞ্চল হইতে সুন্দরী কাঠ চালাইবার জন্য এই নিপা গাছের দড়ির ব্যবহার হয়। ইহা ছাড়া আমরা নিপা গাছের অন্যরূপ প্রয়োজনীয়তার কথা জানিতে পারি না।

এই নিপা গাছের বাঙ্গলা নাম গুলগা বা গাবুয়া। ইহার ফলের নাম গোল ফল এবং পাতার নাম গোল পাতা। ইংরাজীতে ইহাকে water coconut বা নিপা বলে। এই গাছের মোচা (flowering spadix) হইতে রস নিঃসরণ করিয়া বিলিপাইপ যোগে এক প্রকার ভাঁড়ি প্রস্তুত হয় যাহা টুবা (tuba) নামে প্রচলিত। ইহার রস জাল দিয়া উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। পূর্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জেলায় এই প্রকার গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, গুড় প্রস্তুতের জন্য আমাদের সাধারণ গাছের পরিবর্তে

মাত্রেই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আনিয়া সমর শুষ্ক করিব। আবশ্যকের প্রয়োজন বা আবশ্যকীয়তা বর্তমান সভ্যতার যুগে একরূপ অচল। অবশ্য সভ্যতার যুগে চিনি প্রচলিত থাকিলেও গুড় চিনি হইতে খাদ্য হিসাবে যে শ্রেষ্ঠ তাহা বিজ্ঞানসম্মত। নিম্নে বিবিধ গুড় ও চিনির পরীক্ষিত বিবরণ দেওয়া হইল।

দ্রব্যের নাম	১০০ গ্রাম দ্রব্যে কত মিলিগ্রাম লৌহ	১০০ গ্রাম দ্রব্যে কত মিলিগ্রাম তাম্র
কারখানার প্রস্তুত		
সাদা চিনি	০·৯৭৯	
বিহ্‌রী	৭·৪০	
ভাল বিহ্‌রী	১১·৩৬	
লাল চিনি	৯·২৭	
(আখের রস হইতে প্রস্তুত)		
আখি গুড়	১১·০১	০·৭১৭

উল্লিখিত পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে, লাল বিহ্‌রী ও আখি গুড়ে লৌহ পরিমাণ অত্যধিক রহিয়াছে এবং তাম্র পরিমাণ আখি গুড়ে লাল চিনির প্রায় সমান।

শুধু যে চিনি হইতে খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্ট তাহা ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা করিয়াও প্রমাণিত হইয়াছে। কতগুলি ইঁদুরকে গুড় ও চিনি খাওয়াইয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

কিরূপ খাদ্য দেওয়া হয়	খাওয়াইবার পূর্বে ইঁদুরের গড় ওজন (গ্রাম হিঃ)	সাত মাস খাওয়াইবার পরে ইঁদুরের গড় ওজন (গ্রাম হিঃ)
দৈনিক মত দুধ প্রয়োজন		
লাল বা দেশী চিনি	৩৬	১২৫
গুড়	৩৮	১৪৪
লাল চিনি হইতে প্রাপ্ত খাদ্য	৩৮	১৫০

পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুড় খাওয়াইয়া ইঁদুর সাত মাসে ১০৬ গ্রাম ওজনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লাল চিনিতে বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র ৮৯ গ্রাম। এইরূপে সাদা চিনিতে আরও ওজন কমিয়া থাকিবে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুড় খাদ্য হিসাবে উন্নত না হইলে ইঁদুরের ওজন ক্রমশঃ একই সময়ের মধ্যে এত বৃদ্ধি হইতে পারিত না। এই সকল যাবতীয় গুড় ও দেশী চিনিতে সাদা চিনি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাণ রহিয়াছে। উপরন্তু খাদ্যপ্রাণ বি, ও বি-২ পাওয়া যায়।

অতএব আমরা সভ্য-ভব্য হিসাবে যে সকল খাদ্য বিষ বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অনেক খাদ্য আমরা পুষ্টিকর হইলেও হেলায় গ্রহণ করি না বা সংস্কারবশ হইয়া তর্কে এড়াইতে চাই, ইহাই বর্তমান সভ্যতার নমুনা। যাহা ভাল তাহা ভাল বলিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত।

জীবন-বীমার গোড়ার কথা

শ্রীকান্তিশচন্দ্র রায়, এম-এ

মানুষ উপার্জন করে, উপার্জিত অর্থের [illegible]। তবু তাহাই নহে, সঞ্চিত অর্থ [illegible] খাটাইয়া বৃদ্ধি করে।

অনিবার্য [illegible] চিন্তা, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য-হানির দুর্ঘটনা [illegible] বা আকস্মিক মৃত্যুতে [illegible] পুত্রকন্যার [illegible] সম্ভাবনা প্রভৃতি [illegible] না থাকিত, [illegible] কোন আবশ্যকই ছিল না,—বর্তমানে [illegible] অর্জন ও ব্যয় লইয়া মানুষের [illegible] থাকিলেই চলিত; জীবনে দুর্দিন আসিবে [illegible] স্বাস্থ্য-সামর্থ্য চিরদিন অটুট থাকিবে, মানুষের [illegible] হইতে [illegible] অকাল বা আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা নাই,—এই [illegible] দেহ দিয়া বলিতে [illegible] এইজন্যই [illegible] প্রতিপালনের [illegible] প্রয়োজন মিটাইবার [illegible] সঞ্চয়।

কিন্তু [illegible] সঞ্চয় ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। বর্তমানের [illegible] সহস্র তাগিদ মিটাইয়া ভবিষ্যতের [illegible] প্রয়োজন সঞ্চয় করিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক; সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রতিক্ষণ যেখানে মুখব্যাদান করিয়া আছে, সেখানে সুদূর সম্ভাব্য দীর্ঘায়ু জীবনের নিশ্চয়তা কোথায়? তারপর শুধু ইচ্ছা করিলেই সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় প্রণিধিই ও ব্যবস্থা-মূলক হওয়া চাই, এবং দুর্দিনের প্রয়োজনে সঞ্চিত টাকা দাবীমূলে বিনা আয়াসে হাতে আসা চাই। নতুবা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। দেখা গিয়াছে যে, দুর্দিনের প্রয়োজনে অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে জীবন-বীমার ন্যায় এমন উপায় বিজ্ঞানসম্মত পন্থা আর নাই। পৃথিবীর বিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ সকলেই ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের ব্যাপারে জীবন-বীমাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু জীবন-বীমার এই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে বা বুঝাইতে আমাদের দেশের লোকদের অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। সাধারণ মানুষের স্বভাবই এই, অপরিহার্য হইলেও চিরাভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া নূতন পথে যাত্রা করিতে সে ইতস্ততঃ করে। অনেক ঠেকিয়া, দুর্ঘটনার চরম সীমায় উপনীত হইয়া তাহার শিক্ষা হয় এবং নূতন পথের ভাল দিকটা তাহার নজরে পড়ে।

মহাজনী কারবার অর্থাৎ জমিদারী, মিলিটারি বন্ডকে সুদে টাকা খাটানো, কোম্পানী কাগজে লগ্নি, ব্যাঙ্কে আমানত, জমিদারী, তালুকদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দর বন্দরে বাড়ীঘর করিয়া ভাড়া খাটানো প্রভৃতি বহু পথ অর্থের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সুপরিচিত। যখন বর্তমানের ন্যায় পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা দেয় নাই, জীবন-যাত্রা নির্বাহে বর্তমানের মত বিবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, তখন উপরিউক্ত যে কোন পথ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইত। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক পথেই অনিশ্চয়তার নানা বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণের পক্ষে ভবিষ্যতের সংস্থান ক্রমশঃ দুঃসাধ্য ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে। বাহুর আয় সূর্যের ন্যায় নির্বাধায় যাত্রা করিতে পারিতেছে না।

ব্যক্তিগত মহাজনী কারবারে আজকাল একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। উহা দ্বারা নিজের বা প্রতিপাল্যজনের ভবিষ্যৎ সন্ধানের আশা করা বৃথা। গ্রামের মহাজনদের অবস্থা আজ আর কাহারো অবিদিত নাই। মহাজনদের সকলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের সকল জীবনের সঞ্চিত পালনে সমর্থ হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজে লাভ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেও রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্রম-বিবর্তনে তাহা দ্বারা আয়ের দ্বিরতা থাকে না, অনেক স্থলে মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। ইহা সকলকে স্বাচ্ছন্দ্যজনক ও সুনিশ্চিত করে না, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় দায়িত্ব ইহা দ্বারা গৃহীত হয় না। আর প্রচুর মূলধন যাহাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া ভবিষ্যতের সন্ধানের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। যত উপার্জনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রতিদিনের প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইয়া অচিরাৎ অধিক সঞ্চয় করিতে পারেন না।

ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতও প্রায় উপরিউক্ত কারণেই সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। মধ্যবিত্তেরা সময়ে সময়ে যে সামান্য কিছু অবশ্য ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন তাহা তুলিবার সুযোগ থাকার কারণে অকারণে তাঁহারা তাহা উড়াইয়া বসেন। সত্যকার একজনও ভবিষ্যতের সন্ধানের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া যাইতে পারেন কিনা, তদ্বিষয়ে যোরতর সন্দেহ আছে।

জমিদার তালুকদারের কথা আর বলিবার আবশ্যক করে না, তাঁহাদের কিরূপ আজ আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্যবসায় ক্ষেত্রেও বাজার দরের হ্রাসবৃদ্ধি মানুষকে অনেক সময় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। প্রতিযোগীদের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলে সমূলে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। আর কোনও ভিন্ন ব্যবসায় অগ্রসর-ভবিষ্যতে দাঁড় করাইবার মতো প্রচুর অর্থবল বা ব্যবসায়-বুদ্ধি সকলের থাকেও না, মূল ব্যবসায়ের আকস্মিক বা অকাল মৃত্যুতে তাঁহার অজ্ঞতা প্রতিপাল্যজনের অনেক সময়ই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়।

সহর অঞ্চলে বাড়ীঘর করিয়া ভাড়া খাটাইলে দাঁড়ায় টাকায় নিজের এবং পরিবারবর্গের নিশ্চিন্ত সন্ধান হইবে,—ইহার উপায় খুব নির্দ্দেশ করা চলে না। ভাড়ার হারেরও কোনও স্থিরতা নাই, সঙ্গত সময়ে ভাড়াটে না হইলে টাকা আদায় হয় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে বিবাদ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি বাড়ী খালিয়া পড়িলে বা মেরামতের প্রয়োজন হইলে নাবালক গরীব ছেলেদের পক্ষে পুনঃ তাহার প্রতিষ্ঠা করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। আর একসঙ্গে বহু টাকা সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজন মত সহর অঞ্চলে কয়জনেই বা বাড়ীঘর করিতে পারে?

বস্তুতঃ আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সংস্থানের অনুকূলে সঞ্চয় ও টাকা খাটানোর ব্যাপারে এতকালে অনুসৃত কোন পথই আজ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, সকল পথেই বিবিধ সঙ্কট আসিয়া দেখা দিয়াছে। যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা প্রবঞ্চিত হইতে পারি।

কিন্তু জীবন-বীমার পথে যে ঐরূপ প্রবঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই, দুর্দ্দিনের সন্ধানের পক্ষে জীবন-বীমাই যে প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা আজ সর্ব্বজনি সম্মত। জীবন-বীমা জীবনের অনিশ্চিত বিভিন্ন অবস্থায় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মানুষকে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা দান করে। বেকার অবস্থায় তাহাকে কণ দিয়া বা চড়া সুদে তাহাকে উপযুক্ত বাজার মূল্য দিয়া সাহায্য করে, বার্দ্ধক্যে পরের গলগ্রহ হইতে দেয় না। আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মৃতব্যক্তির সম্পত্তি (Estate) অটুট রাখে। অনিশ্চিত জীবনের দুর্ভাবনা যদি মানুষের না থাকে, নিজের এবং প্রিয়পরিজনের ভবিষ্যৎ-এর একটা সংস্থান যদি সে করিতে পারে, তাহা হইলে দশের এবং দেশের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বাধা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার তাহার সময় জন্মে, আরও অর্থে বিপুল শক্তি আসে; জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া জগতেরও অনেক কিছু উন্নতি সে করিয়া যাইতে পারে।

ASIA CHEMICAL INDUSTRIES
32, Narasinha Dutt Road, Howrah
Dealers in :
Nitric Acid, Muriatic Acid, Hydrochloric Acid, Motor Car Battery and other Chemicals etc.

আমরা সকলেই জানি, 'জীবন-বীমা, একটা অবিনশ্বর চুক্তি।' প্রত্যেক বীমা কোম্পানীই বীমাকারীদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধাযুক্ত বেচ্ছাগ্রহণীয় বীমার চুক্তিপত্র উপস্থাপিত করেন। চুক্তিপত্র অনুযায়ী বীমা-কারী প্রতি বৎসর বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক কিস্তিতে নির্দ্দিষ্ট করিতে থাকেন এবং কোম্পানীও তাঁহার তরফ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট মোটা টাকা দিতে বাধ্য থাকেন।

জীবন-বীমা কোম্পানীতে যে টাকা আমাদের সঞ্চিত হইতে থাকে তাহার নিরাপত্তার জন্য আমাদিগকে কোনও চিন্তা করিতে হয় না। আমাদের দায়িত্ব, আমাদের চিন্তাভাবনা বীমা কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশের অজস্র বিপুল অর্থ লইয়া তাহার কারবার। শত সহস্র জীবনের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত। এইজন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত বিশেষ অভিজ্ঞ বীমাবিদ দ্বারা যথাস্থানে বীমা তহবিলের টাকা খাটাইতে প্রত্যেক কোম্পানী ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাধ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিল্প-ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি সাধারণতঃ প্রভূত বিত্তশালী লোকদের জন্যই। এককালে যাহাদের প্রচুর সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে তাহারাই ঐ সকল ব্যাপারে টাকা খাটাইয়া লাভবান হইতে পারে। কিন্তু জীবন-বীমা ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়াছে। যাহার যেমন আয় এবং প্রয়োজন, যতকালের জন্য যেমন তিনি সঞ্চয় করিতে চান, জীবন-বীমা তাঁহাকে সেইরূপ সুযোগই দিয়া থাকে। প্রত্যেক বীমা-কোম্পানীই সর্ব্বসাধারণের শক্তি, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন প্রকারের বেচ্ছাগ্রহণীয় বীমার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বীমাকারীরা নিজ নিজ শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও সর্ত্তে সঞ্চয় করিতে পারেন।

কেহ এককালীন প্রিমিয়াম দিয়া বীমিত সংস্থান করিয়া রাখেন, কেহ বা বহু বার হইতে ন্যূনাধিক প্রিমিয়াম দিয়া বহুবর্ষে অনায়াসে বীমিত সংস্থান করেন। আবার কেহ অধিক প্রিমিয়াম দিয়া মাত্র কয়েক বৎসরেই অধিকতর সংস্থানের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পান, কেহ বা

আজীবন অর্থ অল্প সঞ্চয় করিয়া স্ত্রীপুত্রের জন্য একটা মোটা টাকা রাখিয়া যান। আবার যাঁহারা সম্পূর্ণ বেমাবকাল করিয়া সঞ্চয় করিতে পারেন না বা চান না, তাঁহারা বীমার ফল-ত্যাগ-পত্রের মূল্য বা মত প্রিমিয়ামের অনুপাতে আংশিক বীমাপত্র (Paid-up Policy) গ্রহণ করিতে পারেন। আজীবন বীমা, মেয়াদী বীমা, শিক্ষা বিষয়ক বীমা, যুক্তজীবনের বীমা—প্রয়োজনীয় প্রায় সকল রকম ব্যবস্থাই জীবন-বীমায় আছে। সঞ্চয়িতার শক্তি ও প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া এরূপ বিভিন্নমুখী ছাদে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা অন্য কোন কিছুতেই নাই।

অল্প মূলধনে অচিরাৎ বিপুল সম্পত্তি সৃষ্টি করিতে জীবন-বীমার মতো প্রশস্ত উপায় আর নাই। মাত্র এক কিস্তির প্রিমিয়াম দিয়াই যদি বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তাঁহার ওয়ারিশ বীমাকৃত প্রায় সমস্ত টাকাই পাইবেন। নিজে বহু বর্ষ বাঁচিয়া থাকিয়াও স্ত্রী-পুত্রের জন্য যে পরিমাণ সংস্থান সম্ভব হইত না, মাত্র কয়েক কিস্তিতে কয়েক হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিয়া জীবন-বীমার "সোনার আইন পরিশোধ" তাহা সম্ভব হয়। এই যে একটা শক্তি—'to die to win' ইহা সাধারণ-ভাবরহিত মানুষের পক্ষে কম কথা নয়।

অধিকাংশ লোকের পক্ষে জীবন-বীমার সঞ্চয়ই একমাত্র সঞ্চয় হইয়া দাঁড়ায়; জীবনে পৃথক সঞ্চয় করিবার তাহাদের আর সুযোগ ঘটে না। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, জীবন-বীমা একটী অবিনশ্বর চুক্তি; ইহা কোন সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার নয়; বীমা-কোম্পানী যাহা বিক্রয় করেন, তাহা একটী অপরিবর্তনীয় অঙ্গীকার। উহার পরিবর্তে কোম্পানী যাহা গ্রহণ করেন, তাহা মূল্য নহে, তাহা বীমাকারীর পক্ষে প্রতি বৎসরে অথবা তাহার আংশিক কিস্তিতে সঞ্চয় করিবার অঙ্গীকার। এই উভয় অঙ্গীকার সমানভাবে রক্ষা করিলে যথাসময়ে বীমার নির্দিষ্ট টাকা পাইতে বিলম্বমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া বীমাপত্র বাতিল করিয়া দিয়া কর্তার্জিত অর্থের অথবা বিনাশ কেহই ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয়তঃ জীবন-বীমার সঞ্চয়ের মূলে আছে মঙ্গলের দাবী। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই এই দাবীকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারে না। মানুষ এই পৃথিবীতে একা আসে, কিন্তু এখানে আসিয়া সে বহুর সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে। স্ত্রীপুত্র পরিবার, বন্ধু দেশ ও বিশ্ব সকলকে লইয়া এতটুকু আমি এক বিরাট আমিত্বে পরিণত হয়। এই বৃহত্তর আমিই মানুষ; এই বৃহত্তর আমির দাবীই মানুষের কাছে মঙ্গলের দাবী। জীবন-বীমা এই দাবী পূরণের প্রতিই লক্ষ্য। বীমার প্রথম প্রিমিয়াম জমা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে অভূতপূর্ব আনন্দ জন্মে এই ভাবিয়া যে, আমরা আমাদের নিজের এবং প্রিয় পরিজনের জন্য ভবিষ্যতের একটা সংস্থান করিলাম, জীবনের আর্থিক দায়িত্ব কতকটা অন্য হইতে জীবন-বীমার হাতে তুলিয়া দিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা অঙ্গীকার মতো প্রিমিয়াম দিতে বিরত হই, সেই মুহূর্তে আমাদের কেবলই মনে হইতে থাকে, আমরা কি করিতেছি? আমাদের এই ত্রুটিতে আমাদের প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ সংস্থান

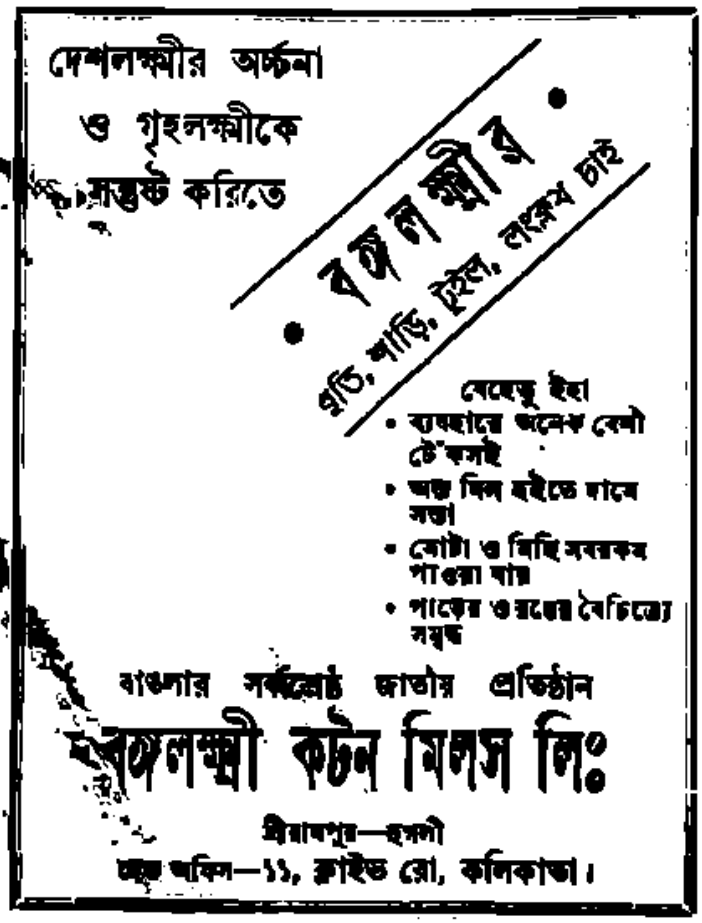

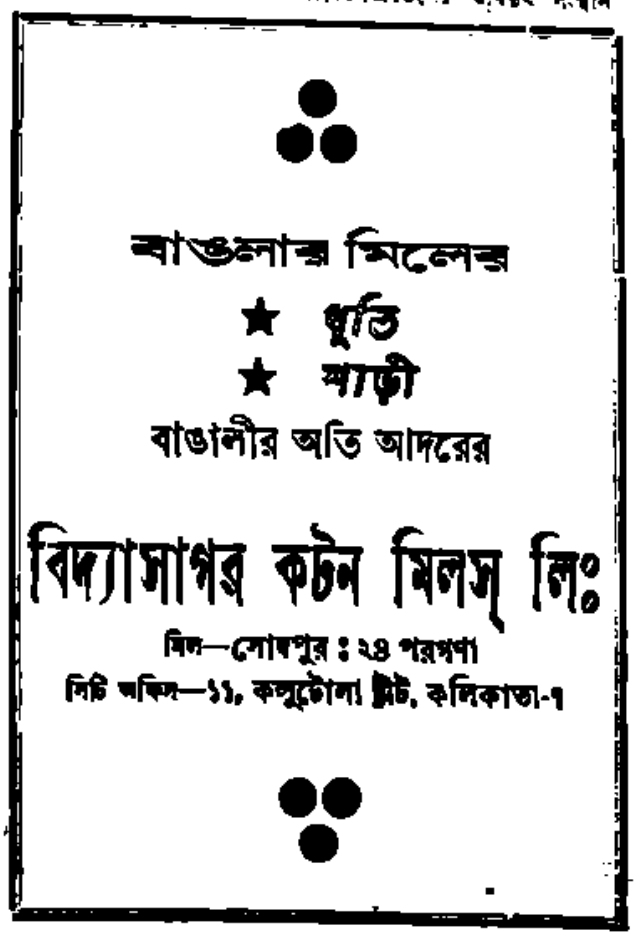

নষ্ট করিতেছি, নিজের ও তাহাদের জীবনে হয়তো দুঃখদুর্গতিই ডাকিয়া আনিতেছি। মূলতঃ এইরূপ আনন্দ ও আশঙ্কা মানুষের সঞ্চয়ের মূলে তখন তীব্র প্রেরণা দেয় এবং তাহার সঞ্চয় বাধ্যতামূলক হইয়া উঠে।

বেতনকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম চালাইতে নিতান্তই অসমর্থ হইলে, বীমাকারী যত টাকা প্রিমিয়াম বাবদ এযাবৎ দিয়াছেন, তদনুপাতে আর প্রিমিয়াম না দেওয়ার সর্তে, বীমা অঙ্কের একটা আংশিক বীমা (Paid-up Policy) পাইতে পারেন। জীবন-বীমার দ্বারা উক্তরূপ মর্মিত ভবিষ্যতের সংস্থান, এই বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া প্রয়োজনে বীমাকারী কিছুটা টাকা কর্জ পাইতে পারেন। বীমা-পত্রের মধ্যেই এই চুক্তি থাকে যে, বীমাকারী তাহার সমস্ত প্রত্যর্পণ মূল্যের প্রায় সমপরিমাণ টাকা যে কোন সময়ে বীমাপত্র চলতি অবস্থা-কালে কর্জ পাইবেন। সুদের হারও চুক্তি-পত্রেই নির্দিষ্ট থাকে। ইচ্ছা করিলে কেহ বেতনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বীমার সমস্ত প্রত্যর্পণ মূল্যও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার পরিণাম অত্যন্ত স্বল্প বিধায় প্রায়ই পক্ষে কেহ তাহা করেন না।

বস্তুতঃ ভবিষ্যতের সন্ধান-পক্ষে জীবন-বীমার ন্যায় এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য পরিস্থিতি

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ

ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম ঘোষণা করিয়াছেন, "কোনরূপ দৈব বিপর্যয় না ঘটিলে ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ভারত নিশ্চয়ই খাদ্যশস্যে স্বয়ংপূর্ণ হইবে। মন্ত্রিবরের গণনা নির্ভর করিতেছে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের উপর। অনুমান মত ঐ সময়ের মধ্যে ভারত প্রায় ১০২ লক্ষ একর পতিত জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিয়া ৩০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পাইবে। পূর্ব বৎসরের ন্যায় যদি অন্যান্য আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন হার একরূপ থাকে তবে ভারত নিজ চাহিদা মত ৪০০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঐ সময়ের মধ্যে উৎপন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু কেবল বর্তমান অভাব পূরণই আমাদের সমস্যা নহে। ভারতের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িবে। কাজেই কেবল পতিত জমি চাষাবাদের আমলে আনিয়া ভারতের খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইবে না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে হয় মাথাপিছু ব্যবহার্য খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে, না হয় ভারতের জমিতে একর প্রতি বেশী ফসল উৎপাদন করিতে হইবে।

মাথা-পিছু খাদ্য কমান যায় কিনা দেখা যাক। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান থাকিতে হইলে যে পরিমাণ খাদ্য দৈনন্দিন খাওয়া আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা যদি অধিক খাদ্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসী খায়, তবেই ঐ অতিরিক্ত খাদ্য কমান যাইতে পারে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকিতে পরিণত-বয়স্ক এক ব্যক্তির যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহা গবেষণার দ্বারা বিভিন্ন দেশে স্থির হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে একজন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ ৩০০০ ক্যালরী তাপ-উৎপাদনক্ষম খাদ্যের প্রয়োজন। সুতরাং দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক পরিণত বয়স্ক ভারতবাসী দৈনন্দিন যে খাদ্য খায় তাহাতে কতটা তাপ উৎপাদিত হইতে পারে।

বিশেষ গবেষণার দ্বারা বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবাসী যে খাদ্য খায় তাহার তাপসঞ্চারের ক্ষমতা মাত্র ২০২৩ ক্যালরী। সেই অনুপাতে একজন ব্যক্তিসাধারণ ৩৪৩০ ক্যালরী তাপ-সঞ্চারক্ষম খাদ্য খায় এবং একজন উরোপের দৈনিক খাদ্য হইতে ৩০৭০ ক্যালরী তাপ সঞ্চারিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া ভারতবাসী যে খাদ্য খায় তাহা অত্যন্ত পুষ্টিকর নয়। সুতরাং ভারতবাসীর দৈনিক খাদ্য কম করিলে চলিবে না। উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় রহিয়াছে।

দেখা যাক্ অপরটী ভারতে প্রযোজ্য হয় কিনা। এই বিষয়ে ভারতীয় একর-পিছু উৎপন্ন হার অন্যান্য দেশের অনুরূপ উৎপন্ন হারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এইরূপ তুলনা অতীতে বহুবার হইয়াছে। সকলেই একমত যে, একর পিছু উৎপাদন হার ভারতে অত্যন্ত কম। ইহা এত কম যে, সন্তোষজনক দেশগুলির সহিত তুলনা চলে না।

বিভিন্ন দেশে একর-পিছু শস্যাদির উৎপাদন হার (পাউণ্ড)

শস্যাদি	যুক্তরাষ্ট্র	ইতালী	জাপান
ধান	২১৮৫	৪৪৬৮	৩৪৪৪
গম	৮১২	১৩৮৩	১৭১৩
ইক্ষু	৪৭৩৩	—	—
তুলা	২৬১	১৭০	১৯৬
তামাক	৮৮২	১১৩৯	১৬৬৪

ভারতে বিভিন্ন শস্যের একর-পিছু উৎপাদন হার (পাউণ্ড)

শস্যাদি	১৯৪৭-৪৪ (গড়)	১৯৪৪-৪৬
ধান	৭৭৪	৭১৭
গম	৬৭৩	৪৮০
জোয়ার	৪৪৬	৩৫৭
ইক্ষু	৩৯৮	৩১০৯
কার্পাস	৮৭	৮১
পাট	৮৭২	১০৮৭
তামাক	৮৩৫	৬৭২

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে উৎপাদন হার কম, সুতরাং অন্যান্য দেশগুলিতে যে উপায়ে একর পিছু শস্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হার বাড়াইতে হইবে। ভারতের দুইটী বিভিন্ন বৎসরের গড় তালিকা হইতেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় ক্ষেতগুলি ক্রমশঃ অনুর্বর হইতেছে অথবা বীজ-শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, নতুবা উৎপাদন হার ক্রমশঃ কমিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

ভারতীয় ক্ষেতগুলি অনুর্বর হইবার কারণ বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ফসল উৎপাদনের ফলে উপরকার মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হইতেছে। ফলে মৃত্তিকার সারাংশ বহিয়া গিয়া অসার অংশ থাকিয়া যাইতেছে। ভারতীয় জমিতে সৃষ্টি-প্রভাবে যাহা বর্তমান, রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্য-প্রাণ সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি প্রতি বৎসর উপরকার সরল উর্বর ভূমিটি স্থানান্তরিত হয় তবে জমির ক্ষেত কিরূপে সরসভাবে থাকিতে পারে? আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে এই সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হইয়াছে। আমাদের দেশে ভৌমতাত্ত্বিকগণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এসম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তৎকালীন সরকারকে ইহার ভবিষ্যৎ যে ভয়ঙ্কর সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরাধীন দেশের বৈজ্ঞানিকের কথা শুনিবার গরজ কেহ দেখান নাই। স্বাধীন ভারত এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সাবধান হইবে এবং যাহাতে কৃষিকার্যের দ্বারা ভূমির ক্ষোভন ক্ষতি না হয় সেই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

জমির প্রতি ফসলের সময় হইবে তখন সময় তারা জানিবে জমি তার নিজের। [illegible] উপাদান সরবরাহ করা। সুতরাং সে [illegible] পরিবর্তের বিনিময়ে কতকটা [illegible] তাতে জমির উর্বরতা [illegible]। জমি সরকার নিজের [illegible] লইবেন। অর্থাৎ জমি হইবে জাতির। তবে এইরূপ [illegible] সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

ভারতে জমির [illegible] সার পাওয়া কঠিন নহে। পশাদির [illegible] গোবর সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। গোবর [illegible] গোবরে-গোবরগুলি আলানি হিসাবে [illegible]। আলানি হিসাবে ব্যবহার না [illegible] গোবর যাহাতে সারহিসাবে ব্যবহৃত [illegible] বিষয়ে জনসাধারণ ও সরকারের [illegible] আবশ্যক। ইহা ছাড়া ভারত প্রচুর [illegible] তৈলবীজ রপ্তানি করে। তৈলবীজ [illegible] তৈল নিষ্কাশিত হইবার পর পড়িয়া থাকে [illegible] এই খইল সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ইহাতে নাইট্রোজেন পদার্থ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

ভারতে চিনি ও গুড় প্রস্তুতের পর যে অপরিষ্কার অংশ পড়িয়া থাকে এবং ইক্ষুর যে ছিবড়া থাকে তাহা সার হিসাবে জমিতে দেওয়া যাইতে পারে। আখের এই সমস্ত অংশ উদ্ভিদের খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ এই কথা উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন ডাঃ নীলরতন ধর। ভারত এক সময় প্রচুর হারে রপ্তানি করিত। হাত বাহিতে পড়িয়া পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ বাহিতে বিনিময় যায়। বাহিতে যখন বিশে, তখন উহাতে কমপক্ষে জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ-জমিতে মিশ্রিত হওয়ায় জমির উর্বরতা বাড়িয়া যায়। ভারত সরকারকে হাত রপ্তানি হইতে আপাততঃ বিরত থাকিতে হইবে।

গাছের পাতা পশাদি উদ্ভিদের খেই খাদ্য। পূর্বে চাষের জমিতে পাতা পচাইতে দেওয়া হইত, ইহাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইত। এখনে জমিতে লাঙ্গল দিবার পর পাতা পাতা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর কয়েকবার লাঙ্গল দিলে, জমিটী চাষের উপযুক্ত হইবে, এবং শস্যাদির উৎপাদন পরিমাণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

শস্যাদির মধ্যে কতকগুলি আছে যাহারা জমির সারাংশ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে। ইহাতে জমির উদ্ভিদের খাদ্যপ্রাণের অংশ কমিয়া যায়। ফলে জমিটী অনুর্বর হইয়া যায়। ঐ সমস্ত জমিতে ঐ সকল শস্যাদি কর্তনের পর লেগুমিনাস জাতীয় অর্থাৎ মটর শুঁটী জাতীয় শস্যাদি চাষ করা আবশ্যক। ঐ শুঁটী জাতীয় শস্যগুলির শিকড়ে যৌগিক নাইট্রোজেন আছে। ঐ যৌগিক নাইট্রোজেন মাটিতে থাকিয়া যায়। ইহা দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগকে বলা হয় রাসায়নিক সার ব্যবহারের যুগ। ঐ সারও জমিতে ব্যবহার করিতে হইবে। এ্যামোনিয়াম সালফেট ইক্ষু, সিঙ্কোনা ও চা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৫

হেডঃ অফিস—৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভাবে ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

কলিকাতার শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৫৭বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড, ২১০।১এ, রাসবিহারী এভেনিউ।

—অন্যান্য শাখাসমূহ—

পশ্চিম বাংলা	পূর্ব বাংলা	আসাম	বোম্বে
বোলপুর	চট্টগ্রাম	গৌহাটী	লালদে ষ্ট্রীট (ফোর্ট বোম্বে)
বাঁকুড়া	ঢাকা	কোকরাঝাড়	কলবাদেবী (বোম্বে)
বর্দ্ধমান	ময়মনসিংহ	শিলচর	মাদ্রাজ
কৃষ্ণনগর	নারায়ণগঞ্জ	তিনসুকিয়া	৪০, মুথুর মালা রথ্ রোড, টেরী ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ
মেদিনীপুর	সিলেট	বিহার	
পূর্ব্ব বাংলা	পাবনা	পাটনা	
বরিশাল	সুরাবাজার (ত্রিপুরা)	পাটনা সিটি	
ভৈরববাজার	রাজশাহী	হাজারীবাগ	যুক্তপ্রদেশ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আসাম	জামসেদপুর	বেনারস
কুমিল্লা	বুন্দী	মজঃফরপুর	এলাহাবাদ
চাঁদপুর	ত্রিপুরা		

বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :—

লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা:—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, ক্যানাডা—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা) হংকং এশিয়া—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি এবং ও এ) বার্মা—ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন, বার-এট-ল

১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারত প্রায় ৯১ হাজার টন এ্যামন-সালফেট আমদানি করে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ঘানায়নিক সার আমদানির পরিমাণ এক লক্ষ টনের কিছু অধিক হয়। স্বাধীন ভারত সরকার বিশেষজ্ঞের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট জমিতে সার দিবার জন্য প্রয়োজন। ইহার জন্য সরকার বিহারে রামগড় অঞ্চলে সিন্ধ্রীতে একটি বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ কারখানায় প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টন সার প্রস্তুত হইবে।

শস্যাদির উৎপাদন হার বাড়াইতে হইলে একদিকে জমির প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক, অপর দিকে বীজ প্রয়োগ ও কৃষিকার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে আধুনিক প্রথা অবলম্বন করা প্রয়োজন। উন্নতশ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট গণতন্ত্র, ক্যানাডা, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে বিশেষ গবেষণা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশেও কিছু কিছু গবেষণা হইয়াছে। এক্ষণে এই সমস্ত গবেষণা আশু ব্যাপকভাবে সুরু করিতে হইবে। যন্ত্র-বিজ্ঞান-মন্দিরে ডাঃ জাকব কোনী পারের আলো প্রতিফলিত করিয়া গাছের বীজকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে উৎপাদন পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িবে আশা করা হয়।

কৃষিকার্য্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালন করিতে হইলে কৃষি যন্ত্রাদি ভারতীয় জমির উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাদের প্রয়োজনীয় হইতেছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সমস্ত পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য উৎপাদন পরিমাণ বাড়ান। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিলে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর খাদ্য-শস্য পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে শ্রম মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। বরং শ্রম অপর্য্যাপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। কেহ কেহ কৃষিকর্ম্ম হইতে বেকার পাইবে। তাহাদের অন্য কাজে নিয়োগ করিতে হইবে।

ভারত খাদ্য-শস্যের সহিত অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন করে। ভারতের প্রয়োজন কৃষিকার্য্যের সহিত শিল্পবাণিজ্যের সমধিক উন্নতি। এই বিষয়ে ভারতকে জাপান ও যুক্ত সাম্রাজ্যের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। তবেই কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ সাময়িক দিয়া যাইবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতিতে ভারতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা যে পর্য্যায়ে কিরূপ কম নিম্নোক্ত সংখ্যাবিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

কর্ম্ম-নিয়োগের হার
(শতকরা)

দেশ	কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় ব্যাপারে	শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য	পরিবহণ ও বিবিধ	অন্যান্য
ভারত	৬৬	১০	৭	১৭
জাপান	৫০	২০	৩০	
যুক্তসাম্রাজ্য	৬	৪৪	৪৯	

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্যের সাথে প্রয়োজন সন্নিকটস্থ স্থানে কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পবাণিজ্য ভাবখানা, স্থাপনা। ইহাতে সরবরাহ খরচ কম হইবে এবং সময় নষ্ট হইবে না। বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ করা হইলে, কৃষির শিল্পগুলি জাপানী প্রথায় গড়িয়া উঠিবে। কৃষা কৃষিজ সম্পদ্। সুতা প্রস্তুত কৃষি-অঞ্চল হইতে পারে। ইহার জন্য বড় বড় কারখানা না করিয়া, ছোট ছোট বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত তাঁত-খানায় সুতা প্রস্তুত করা আবশ্যক। সুতা কাটা কারখানায় কমল সম্প্রদায় অবসরমত কার্য্য করিতে পারে, ইহার ফলে শিল্প তৈয়ার করিতে খরচ কম পড়িবে। কমল বৃথা ও গৌণ উপজীবিকা পাইয়া আয় বাড়াইবার সুযোগ পাইবে। এইভাবে তৈয়ারী সুতা পরে বয়ন কারখানায় পাঠান যাইবে।

এইভাবে চিনির কারখানা ও অন্যান্য তৈল সম্পর্কীয় কারখানাগুলিও ক্ষেতের সন্নিকটে স্থাপিত হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। ঘানায় তৈল, নারিকেল তৈল ও ভেজিটেবল্ ঘি প্রভৃতির কারখানাগুলিও ক্ষেতের সন্নিধানে হওয়া আবশ্যক।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের কৃষি বিষয়ক উন্নতি বিধান সম্ভব হইবে বিশেষ পরিকল্পনায়—যাহা হয় মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। পতিত জমিকে পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষির ব্যবস্থাকরণ। ইহার জন্য প্রয়োজন পতিত জমির উদ্ধারের উপাদি নির্দ্ধারণে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। পতিত জমির অবস্থান নিরাকরণের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক উপায়ে জরীপ। ইহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে শিক্ষিত দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপর। পতিত জমির উদ্ধার কার্য্য চালাইতে হইলে Land Utilisation Map প্রস্তুতকরণ আবশ্যক, পতিত জমি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন ট্রাক্টর, ইঞ্জিন ও বিশেষজ্ঞ।

ভূমির উর্ব্বরতা বিশেষভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজন মত তাহাতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়াও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। জলসেচ দ্বারা একাধিক ফসল বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। জমির উপরিভাগে কোনরূপ যৌগিক পদার্থ যাহাতে জমিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। উচ্চস্তরের বীজ ও সার প্রয়োগ করিয়া এবং জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া মোট উৎপাদন হার নিশ্চয়ই বাড়ানো যাইবে।

কৃষি উন্নতির জন্য জাতীয় সরকারকে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্ট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম ভারত সরকারের কৃষি বিষয়ক খরচের সহিত অন্যান্য দেশের এতদ্সম্পর্কীয় খরচের তুলনা করেন। তিনি দেখান—

কৃষি সম্পর্কিত সরকারী ব্যয়
(বাষিক)

যুক্তরাষ্ট্র —— ৮০৲ যুক্ত সাম্রাজ্য —৫৲
ক্যানাডা —— ২১৲ ভারত —— ৵০ আনা

কৃষি সম্পর্কে ভারত সরকারের ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। এদেশে কৃষি উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে বাষিক সরকারী ব্যয় বাড়াইতে হইবে। ভারত সরকারের কৃষি সম্পর্কীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধির দিক দিয়া তাহার যে উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

চণ্ডীচরণ দত্ত
গিনি সোনার গহনা নির্ম্মাতা
১২৪বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

শিল্পমেলা

শ্রীসুবোধকুমার মোহান্তী, এম-এ

ব্রিটেনের বার্ষিক শিল্পমেলার নাম বিশ্ব-বিদিত। এবারকার মেলা গত মে মাসের দুই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া ছয় সপ্তাহেই শেষ হইয়া গিয়াছে। স্থায়িত্বে মাত্র বারদিন হইলেও ব্যাপকত্বে ও গুরুত্বে ইহা দীর্ঘস্থায়ী ধরে। এ শিল্পমেলার ইতিহাস বর্ণবিচিত্র ব্রিটেনের অন্যান্য শিল্পপ্রদর্শনীরই গৌরবময় কাহিনী। আজিকার শিল্পপ্রসার ও উন্নয়নের যুগে ইহার সবিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রিটেনের শিল্পমেলা প্রথম আরম্ভ হয় গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। বিদেশে প্রস্তুত মাল তখন প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতেছিল। এই সব জিনিস যাহাতে ব্রিটেনেই উৎপন্ন হইতে পারে সেজন্য নিজের দেশের শিল্পপ্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই ছিল তখনকার মেলার লক্ষ্য।

সরকারীই উদ্যোগেই এ মেলার সূত্রপাত, গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগই (Commercial Relations and Export Department of the Board of Trade) [illegible] সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন [illegible] বাণিজ্য সভাই মেলার স্থান নির্বাচন, [illegible] বিশেষভাবে প্রচারকার্য প্রভৃতি [illegible] অংশ গ্রহণ করেন; কারণ এ মেলা [illegible] প্রদর্শনী মাত্র নহে, [illegible] ব্যাপার, ওজনে এবং মেলের [illegible] ও সম্ভাবনার সমবেত আন্তরিক [illegible] ইহা বর্তমানে ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ শিল্পের [illegible] বহন করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার প্রভাব অপরিসীম।

গত ১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত [illegible] একটী স্থানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইত। [illegible] ইহা অধিকতর প্রসারিত হইয়া উহার [illegible] স্থান হইতে মেলায় [illegible] শিল্প ও ইঞ্জি-[illegible] শাখা বার্মিংহাম সহরের "অলডউইক" প্রাসাদে [illegible] হইত হয়। তারপর ১৯৬১ সাল হইতে [illegible] দুইটী পৃথক পৃথক স্থানে এবং বার্মিংহাম [illegible] একটী প্রাসাদে—এই মোট তিনটী বিভিন্ন [illegible] শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৬৪ সালের মেলা স্থগিত হইতে উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেলে শিল্পমেলা অনেক বৎসরের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। এই সর্বাত্মক সংগ্রামের পরিস্থিতিতে মেলা বন্ধ না রাখিয়া উপায়ান্তর ছিল না। যুদ্ধশেষে ব্রুটেনকে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; কিন্তু জাতীয় সঙ্কটে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের সমবেত চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। তাই যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হিসাবে—এই শিল্পমেলার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাহারা তৎপর হইয়াছেন।

যুদ্ধ বৎসরকাল যুদ্ধ চলিবার পর সন ১৯৪৭ সালেই প্রথম যুদ্ধ-পরবর্তী শিল্পমেলা আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ব্রুটেন তখনও টাল সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। কাজেই মেলাবের মেলা বিদেশ বাজারে যোগসূত্র পুনঃ-সংস্থাপনে ব্রুটেনকে সতত পরিবেশে সাহায্য করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার শিল্প-গৌরব উদ্ধারে ইহা খুব বেশী কার্যকরী হয় নাই। দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে দেশের প্রত্যেকটী শিল্পেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল রণসম্ভার সৃষ্টি এবং সমর চাহিদার জোগান দেওয়া। দেশ ও বিদেশের অন্যান্য ক্রেতার প্রয়োজন, রুচি ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় ও শক্তি শিল্পের তখন মোটেই ছিল না। কিন্তু আজ ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী শিল্পের গতি নিয়ন্ত্রণের দিন আসিয়াছে এবং সেদিন প্রায় সমাগত যেদিন "ক্রেতার বাজার" (buyers' market) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ক্রেতার বাজার স্থাপন প্রয়াসে ১৯৪৮ সনের শিল্পমেলা এবং এবারকার মেলা উভয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবারের শিল্পমেলা গত কয়েকবারের ন্যায় একই সময় লণ্ডন ও বার্মিংহাম এই দুই সহরে আরম্ভ হইয়াছিল। বৃহৎ শিল্পসম্ভার এবং ইঞ্জি-নিয়ারিং শাখা বার্মিংহামের "অলডউইক" প্রাসাদে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। 'আর্টওয়ার্ক', গৃহনির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং সাজসরঞ্জাম বহির্বিশ্ব কল-কারখানা ও বৃহৎ যন্ত্রাদি লণ্ডনে টানিয়া না আনিয়া বার্মিংহামের শিল্পাঞ্চলে উহার প্রদর্শন বহুদিক হইতে সুবিধাজনক। তাই বৃহৎ শিল্পের শাখা বার্মিংহামেই প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে এবং মেলায় যোগদানকারী এই বিশেষ শিল্পের ক্রেতাগণ লণ্ডনে না গিয়া সরাসরি বার্মিংহামেই উপনীত হইয়াছিলেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় সহরের মেলা অনুষ্ঠিত হয় দুইটী পৃথক পৃথক স্থানে—'আর্লসকোর্ট' ও 'অলিম্পিয়া' নামক দুইটী প্রেষ্ঠ প্রমোদ ও প্রদর্শনী প্রাসাদে। এ সব প্রাসাদ যে অবশ্যদর্শনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। 'এয়ার কণ্ডিশন'যুক্ত ও আলোক-মালায় সজ্জিত বহু হল ঘর, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, উদ্যান, রেষ্টুরেণ্ট, চায়ের, বিশ্রামাগার, প্রমোদ কক্ষ, খেলাধুলার জন্য 'টাভিয়ার্স', সহরময় ফুল পাঠাবার প্রভৃতি আধুনিক কালের, চিত্ত-বিনোদন ও সভ্যতা বিকাশের সুবিধ ব্যবস্থা অতি সুষ্ঠুভাবে এই সব স্থানে করা হইয়াছিল। 'আর্ল-কোর্ট' ও 'অলিম্পিয়াতে' সাধারণতঃ বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা প্রদর্শিত হয় না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থার দ্বারা কিন্তু হাল ফ্যাসানের সুন্দর এবং বিদেশ বাজারে যাহার প্রচুর চাহিদা আছে তাহা সবই এখানে স্থান পাইয়াছিল। [illegible]

যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি, মুদ্রণ ও প্রকাশের দ্রব্যাদি, খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, ফটোগ্রাফি ও অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, ঘেরিড সেট, বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের যন্ত্রাদি, কুষিশিল্প, ও কারুশিল্প, প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি, অফিস সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, বাসনপত্র, চামড়ার কাজ, গৃহসজ্জার আসবাবপত্র, ওষুধ-দ্রব্যাদি, হালকা সাবানের জিনিষপত্র, ঘড়ি ও জুয়েলারী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রাসায়নিকের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংক্রান্ত পত্রিকা এবং তাহাদের কর্মব্যবস্থা ইত্যাদি অসংখ্য পণ্যসম্ভার এবং শিল্পীর অঙ্কপতির পরিচয় মণ্ডলের 'আর্টকোর্ট' ও 'অলিম্পিয়ার' প্রাসাদে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রচার পুস্তিকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সাহায্যে ছয় মাস পূর্ব হইতেই শিল্পমেলা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেশ বিদেশে জ্ঞাপন করা হইতে থাকে এবং এ সম্পর্কে ভার গ্রহণ করেন বোর্ড অফ ট্রেড স্বয়ং। কারণ এই মেলার বর্তমানের মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং ব্রিটিশ পণ্যের বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। এবার শিল্পমেলা সম্পর্কে ১,২০,০০০ প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপন ৩৩টি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়া বিভিন্ন দেশে বিতরিত হইয়াছিল। এক লক্ষের উপর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ডাকযোগে এ সম্পর্কে জ্ঞাপনপত্র পাইয়াছিলেন এবং খবরের কাগজের মারফৎ যথেষ্ট প্রচার কার্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলিয়াছিল। তারপর, ব্রিটেনের বৈদেশিক দূতগণও এই কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রেতাগণ যাহাতে ব্রিটিশ শিল্প ও পণ্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেন এবং যে মাল তাঁহাদের প্রয়োজন সে বিষয় বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারেন, সে জন্য ব্রিটিশ শিল্পের গ্রন্থপঞ্জি (ক্যাটালগ) বাহির হয়—একটী জানুয়ারী মাসে ও অপরটি মে মাসে। জিনিষের নাম ও শ্রেণী অনুযায়ী গ্রাহকগণ বিতরণ, সূচিপত্র সাহায্যে যে কোন শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য সহজে বাহির করা যায়। ব্যবসায়ী ও শিল্প অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট এই গ্রন্থপঞ্জীর যথেষ্ট সমাদর। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হইবার অল্পকাল পরেই ইহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। শিল্পমেলায় বাহির হইতে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই একটী করিয়া গ্রন্থপঞ্জী প্রদান করা হইয়া থাকে।

এই মেলায় যোগদানকারী ক্রেতা ও তাহার পরিবারবর্গের জন্য বিনা খরচে ছাড়পত্র আদায় করিবার ব্যবস্থা বোর্ড অফ ট্রেড করিয়া দেন। ইংলণ্ডে পৌঁছাইয়া গেলে লণ্ডন ও বার্মিংহামের বেল ষ্টেশনে শিল্পমেলার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত সংবাদ কেন্দ্র হইতে সর্ববিধ সাহায্য আগন্তুক-গণকে প্রদান করা হয়। মেলায় একবার পৌঁছাইয়া গেলে ছয়সপ্তাহিগণকে বিদেশী ক্রেতার 'ব্যাজ' প্রদান করা হয় এবং তাহাদের জন্য সমাদরের ত্রুটী হয় না। বিদেশী ক্রেতা-গণের ক্লাব, অফিসের আসবাব ও বন্দোবস্ত, মোটরগাড়ী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা, ব্রিটিশ ও বিদেশীয় বহু প্রকার সংবাদপত্র এবং শিল্প-পত্রিকা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই তাঁহারা লাভ করেন। তারপর, সংবাদ কেন্দ্র হইতে খবর লইয়া তাঁহারা বিশ্রামাগার, খেলাধূলা, প্রমোদ-কক্ষ বা নৈশক্লবে ইচ্ছানুযায়ী গমন করিতে পারেন।

আগন্তুক ক্রেতাগণের সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান বিষয়ে বৃটিশদের সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা শিল্পমেলার অতিথি; আর ইহাপেক্ষাও বড় কথা এই যে, তাঁহারা উৎপাদনকারীদের পৃষ্ঠ-পোষক, বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্য বিস্তারের অবলম্বন এবং এই শিল্পমেলায় আকর্ষিত হন। তাঁহাদের জন্যই দেশবিদেশে বিবিধ ভাষায় প্রচার, বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা। উপহারাগণের বয়লরভাল পূর্ব হইতে প্রস্তুতির বহর এবং ব্যবসায়িগণের অজস্র অর্থব্যয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। বিদেশী ক্রেতাগণের আগমন না হইলে এ শিল্পমেলার সৌরব এবং মূল্য বহুলাংশে কমিয়া যায়। তাই বার্মিংহামের বণিকসভা, লণ্ডনের বাণিজ্য সভা, শিল্প উন্নয়ন পরিষদ, প্রচার কমিটী, শিল্প ব্যবসায়ী প্রভৃতি সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ বিক্রয়বাণিজ্য বৃদ্ধি ও প্রচারের সর্ববিধ আধুনিক উপায় অবলম্বনে বিদেশ হইতে ক্রেতাগণকে লণ্ডন ও বার্মিংহামে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে বহু ক্রেতা আসিয়া যোগদান করেন—এই শিল্পমেলায় প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করিতে দেখা উচিতত্ব ঔচিত্য ও বহুপাতি সংগ্রহের আশায়, আর কেহ বা সবতত্ব শিল্প ব্যবস্থার সন্ধানে।

ক্রেতাগণের সুবিধার্থে মেলার প্রদর্শিত পণ্যরাজি পরিকল্পনা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত রাখা হয়। শিল্পগোষ্ঠী ও শ্রেণী অনুসারে পণ্যসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শিল্পের গ্রন্থ-পঞ্জী ও নক্সা দেখিয়া যে কোন আগন্তুক তাহার প্রয়োজনীয় পণ্যশ্রেণীর নিকট উপনীত হইতে পারেন।

মেলা আরম্ভ হইলে উহার তিতর সংবাদ ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের একটী বিশেষ শাখা স্থাপিত হয়। এই শাখার প্রধান কাজ মাল ক্রয় ও ষ্টকহোম হইতে রপ্তানির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে ক্রেতাগণকে পরামর্শ দেওয়া। রপ্তানি বাণিজ্যের নিয়মকানুন, আবশ্যকীয় বিধি-নিষেধ, মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা, ক্রীত মালের মূল্য প্রদান ইত্যাদি ক্রয় ও বাণিজ্যের যাবতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে ক্রেতাগণকে বুঝাইবার জন্য সংবাদ ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের উপর অর্পিত থাকে।

গত মে মাসের দুই তারিখ হইতে তের তারিখ পর্যন্ত এবারকার মেলা চলিয়াছিল। বার বার দিনেই এ রকম একটী বিরাট শিল্প-মেলা শেষ হইয়া গেল বটে কিন্তু ইহার পশ্চাতে দিন ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রায় এক বৎসরের কঠিন প্রয়াস। পাঁচ লক্ষ ক্রেতা ও শিল্প অনুরাগী এবারের শিল্পমেলা পরিদর্শন করিয়াছেন। এবার বিদেশ হইতে যাঁহারা এই শিল্পমেলায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। মোট ১৮,৭৪০ জন আগন্তুক বিদেশ হইতে উপনীত হন; তন্মধ্যে ভারত ও পাকিস্থান হইতে গিয়াছিলেন ১,৩০০ জন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে পরিমাণ লোক আমেরিকা হইতে আসিতেন এবার আসিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ বেশী।

ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতেও এত অধিক সংখ্যক শিল্প অনুসন্ধিৎসু ইতিপূর্বে তথায় যান নাই। সুইডেন, ডেন্মার্ক, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেক দেশ হইতে প্রায় এক হাজার করিয়া ক্রেতা ও অনুরাগী গিয়াছিলেন। গত বৎসর লণ্ডনে আহূত মেলাতেই যোগদান করিয়াছিলেন ১৫৮টী

বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি যন্ত্র প্রতিনিধি। এবার যোগদানকারী দেশের সংখ্যা আরও অধিক।

এই শিল্পমেলার যখন আমাদের দেশের হরের মেলা, বারুণী স্নানের মেলা প্রভৃতির মত যেমনই নয়। অথবা আজকালকার শিল্প প্রদর্শনী জাতীয়ও নয়। ইহা ঠিক যার দিন স্থায়ী পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিরাট বাজার বসে। বর্ষ, রাজধানী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশে প্রাচীন কালে যে সব মেলার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এখনও অনেকগুলি প্রচলিত রহিয়াছে। এই সব মেলায় চলিয়াছে হৈ চৈ এবং আমোদ-প্রমোদের স্থানই মুখ্য। ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান গৌণ এবং উহা অনেক ক্ষেত্রেই অংশ মাত্র। তারপর, আজকাল যে সব শিল্প প্রদর্শনী আমরা দেখিতে পাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলির মূলা শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক। কোন কোন শিল্প প্রদর্শনীতে যথেষ্ট ক্রয়-বিক্রয় হইলেও এগুলির অর্থনৈতিক মূল্য এখনও অত্যন্ত গৌণ। অথচ আন্তর্জাতিক এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় হিসাবে বর্তমান শিল্পমেলার মূল্য কমিয়া যায় না। মেলার একমাত্র উদ্দেশ্য বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্য বিক্রয় এবং তদ্দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কৃষি সাধন আমাদের দেশের [illegible] মেলা এবং প্রদর্শনীর সঙ্গে শিল্প মেলার [illegible] একটি বড় প্রভেদ এই যে, শিল্প মেলায় ক্রয়-বিক্রয় যোগাই হয় না, আর নিজের দেশের অর্থনীতিবিদের জন্য এ মেলা আকর্ষণ হয় না এবং সেজন্য তাহাদের কোন স্থান নাই।

এবার তিন হাজার শিল্প ২,৫০,০০০ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া তাঁহাদের পণ্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩০ বেলায় বিক্রেতা হিসাবে আসন সংগ্রহের জন্য শত শত দরখাস্ত নামিল হয়। বর্ষ শুরু হোয়ার ছুটি স্থায়ী মেলা বিস্তৃত হইতে স্থানাভাব বশতঃ সব আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে বহু আবেদনকারীকে [illegible] হইতে হইয়াছে। লণ্ডনের মেলায় বিক্রেতাদের মধ্যে আসন বিতরণ ও নির্বাচনের ভার [illegible] বোর্ড অব ট্রেডের উপর, আর বার্মিংহামের মেলার এ ভার গ্রহণ করেন বার্মিংহাম পৌরসভা।

মেলায় পণ্য প্রদর্শক ও বিক্রেতা হিসাবে আসন লাভ সব দেশের পক্ষেই উন্মুক্ত নহে। প্রথমতঃ গ্রেট-ব্রিটেন এবং আইসল্যাণ্ড কমনওয়েলথ ও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের পণ্যরাজিই প্রদর্শিত হইতে পারে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবেই ভারতের পণ্য শিল্পমেলায় স্থান পাইয়াছিল। এরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এই মেলার প্রভাব অপরিসীম হইলেও ইহাকে 'আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা' বলা চলে না; ইহা একটি বিশিষ্ট দেশের জাতীয় শিল্পমেলা মাত্র।

যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিতে হইলেও বিক্রেতারা অনেক সময় ভাল ফললাভ করেন না। ক্রেতারা শিল্পমেলায় প্রবেশ করিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন, বহু প্রকার জিনিসের নমুনা একস্থানে অল্পসময়ে অনায়াসে পাইতে পারেন, অনেক নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া যায়, শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু বিক্রেতারা এত তাড়াতাড়ি ফললাভ করিতে পারেন না। পণ্য [illegible] 'অর্ডার' কয়েকক্ষেত্রে মেলাতেই

বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল

কয়েকটি বাছাই সব্জী বীজ সম্প্রতি আমদানী হইয়াছে

প্রতি আউন্সের মূল্য

বাঁধাকপি গ্লোব প্রোমী ৸৹, বাঁধাকপি একটু আলি এক্সপ্রেস ৸৹, বাঁধাকপি মার্কেটম্যানের ড্যাম্বেড ৸৹, ফুলকপি আলি ও লেট স্নোবল ৸৵, ফুলকপি গ্লোব মেটার ৸৵, ব্রিকোলি ৸৹, ওলকপি ১৷৹, বীট লাল গ্লোব ১৷৹ (প্রতি পাউণ্ড ১৮৵), পালংশাক ১৵ (প্রতি পাউণ্ড ১৫৵), লেটুস ১৷৵০, মূলা বোম্বাই লম্বা লাল ৷৹ (প্রতি পাউণ্ড ৯৵), মূলা লাল গ্লোব ১৵, টমেটো সালকেডমন ২৷৹, পেঁয়াজ বোম্বাই ৯০ (প্রতি পাউণ্ড ১০৵), গাজর আমেরিকান ১৷৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১৩৷৹), স্নেক গৌর ৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১৷৹), সিমেরী ১৷৹, বেঙ্গল আমেরিকান ৸৵, বীন আমেরিকান ৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১৷৹), পপ্য (শীতের) ৸৵, মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ (একশত রকম একশত প্যাকেটে) প্রতি প্যাকেট ৷৹ ।

সুবিখ্যাত চারা ও কলম

আমাদের নির্বাচিত প্রতি কলমের মূল্য—কলম—আম ১৷৵, লিচু ১৷৵, পেয়ারা ১০৵, কমলা লেবু ১০৵, জলপাই ১০৵, পেয়ারা ৮৵, জামরুল ৮৵, আমিলেস ১৷৵, গোলাপজাম ৫৵, জাঁহাল ৪৵, তবরেজ ২৷৹, জলপাই ৮৵, আলিম ৮৵, আনড়া বিলাতী ৫৵, লবেড়া ১০৵, কুল ১০৵, লকেট ১০৵, বাতাবীলেবু ১০৵ । ফুলের—সুপারি ৪৵, চাঁপা ৸৵, আপরোসিয়া ২৷৵, জবা ১০৵, বকুল ১০৵, পারিজাত ৮৵, ক্রোটন ৮৵, ডাউগার ৮৵, লতানে ফুলগাছ ১০৵, সুগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১০৵ ।

কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী

শ্রীঅমরনাথ রায়, এম, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক

১। বাংলার সব্জী	৩৵	৫। সরল পোল্ট্রী পালন	৩৵
২। চাষীর কলম	৩৵	৬। সরল সারের ব্যবহার	১৷৹
৩। আদর্শ কলকর	৩৵	৭। মাছের চাষ	১৷৹
৪। পুষ্পোদ্যান	৩৵	৮। পশুখাদ্যের চাষ	১৷৹

ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

গ্লোব নার্শরী

নিউ মার্কেট, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, পিয়ার্স লেন, কলিকাতা

হাওড়া ষ্টেশনের নিকট

বিক্রেতাদের হাত আসে, আবার অনেক সময় বেলা শেষ হইয়া যাইবার কয়েক ঘণ্টা পর বিদেশ হইতে 'অর্ডার' আসিতে থাকে। তাই বিক্রেতাদের পক্ষে বেলার যোগদান নিজেদের এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন বাহির করাই অনুরূপ, কম আসল হইলেও তখন তখনই পাওয়া যায় না।

ব্রিটেনের পণ্য উৎপাদক ও তৈয়ারকারী ব্যবসায়িগণকে সারা পৃথিবীব্যাপী বাজারের খবর রাখিতে হয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ের চাহিদা, রুচি ও প্রকৃতির খবর তাঁহারা রাখেন এবং তাঁহাদের তরফ হইতে এবং জাতীয় সরকারের তরফ হইতেও অভিজ্ঞ লোক বেশ বিদেশে প্রেরিত হন—বিদেশের হাটের খবর লইতে এবং বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে। বিভিন্ন দেশের বাজার সম্পর্কে তাঁহারা যে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই শিল্পবেলায় পণ্যের যোগান দেওয়া হয়।

বিদেশ বাজারের শক্তি ও চাহিদার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়াই পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। রুচি, সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য ও উপযোগিতার দৃষ্টিতে পণ্য পৃথিবীর হাটে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। তাহার কারণ এই যে, মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে ভাঙন ধরিয়াছে—তাহা দূরীভূত করিয়া যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্য অনুরূপ বৃদ্ধি করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ অগ্রসর হইয়াছে; দেশের প্রয়োজন মিটাইবার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে অনেক কম। নিত্যব্যবহার্য্য এবং প্রয়োজনীয় বহু জিনিষের অভাব ব্রিটেনে এখনও রহিয়া গিয়াছে—অপর দিকে বিদেশের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং যোগান দেওয়ার কাজ অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। উৎপন্ন মোটর গাড়ীর ৭০% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) বিদেশে পাঠান হইতেছে। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে যে উৎপাদন হইত তাহার উপর ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা ব্রিটেনের লক্ষ্য। ফলিয়ন্ত্রিত এবং আনুষঙ্গিক চেষ্টার ফলে উৎপাদন ইতিমধ্যে ২০% (শতকরা বৃদ্ধি ভাগ) বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগতি মাঝে মাঝে বন্ধ হইলেও ব্যাহত হয় নাই। বর্তমানে পণ্য-মূল্য রপ্তানি বাণিজ্য বিস্তারে প্রতিবন্ধক হওয়ার মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিতে চেষ্টা চলিয়াছে।

তাঁচা মালের যোগান ব্যবস্থার উন্নতি, ইস্পাত উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য, নূতন নূতন কারখানা স্থাপন প্রভৃতি হইতে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ব্রিটেনের শিল্পীয় অগ্রগতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মোটর গাড়ী, বস্ত্র শিল্প ও পশম, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কতকগুলি শিল্পে তাহাদের রপ্তানি বাণিজ্যের গতি বিশেষ আশাপ্রদ। ব্রিটেনের শিল্পবেলা দৃষ্টিশ শিল্পের বর্তমান অগ্রগতির পথ সুগম করিয়াছে। আবার শিল্পের এই অগ্রগতি ব্রিটেনের শিল্প বেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গত ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বিত ভারত প্রদর্শনীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত এরূপ বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে সম্ভবতঃ আর হয় নাই। কেবলমাত্র আমাদের শিল্পীয় উন্নতি ও ইহার সম্ভাবনা প্রদর্শনীই ইহার লক্ষ্য ছিল না—ইহার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের ক্রমোন্নতি ও আদর্শের সুস্পষ্ট ছবি সর্বসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা।

প্রদর্শনীর পরিচালকবর্গিগণের অক্লান্ত চেষ্টার এবং ভারত সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্যসমূহ, রেল বিভাগ, শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল ও বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে। অসংখ্য পণ্যরাজি ও বহু আকর্ষণীয় পণ্যবিপণি ভারতব্যাপী শিল্প চেষ্টা ও ইহার উৎকর্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে; ইহা জাতীয় শিক্ষামূলক, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বহু দিকের বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রদর্শনের ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষি, শিল্প, কুটীর শিল্প, পূর্ত কার্য্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যানবাহন, যানোপযোগী পরিবহন, ডাক ও তার, বেতার, টেলিফোন, রকেট, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষবাহিনী ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, পরিচ্ছদ কলা, বিজ্ঞান, জাতীয় সাংগ্রাম ও বিপ্লব, শিশুমঙ্গল, মহিলা মহল, খেলাধূলা, সংবাদ ও সাময়িক, বক্তৃতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় জীবনের বহু বিভিন্ন দিকে দেশের কর্মপ্রচেষ্টা ও উন্নতির এক পরিপূর্ণ চিত্র সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল।

ইডেন গার্ডেনে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোট ৮০০ (আট শত) আসন বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রদর্শনীতে মূল নির্মাণ, বিদ্যুৎ সজ্জা প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। পঞ্চাশ দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনী চলিয়াছিল। দৈনিক লক্ষ লক্ষ লোক ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

ব্রিটেনের শিল্পবেলা এবং আমাদের দেশের মেলা ও প্রদর্শনীর মধ্যে যে গুরুত্ব পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাই ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পবেলার সাদৃশ্য থাকিলেও ইহার বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য শিল্পবেলার অনুরূপ নয়। আমাদের প্রদর্শনীটি হইয়াছে বিশ্ব জনুযায়ী, ব্রিটেনের শিল্পবেলা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত এবং অধিক ব্যাপকতা ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত ব্রিটিশ শিল্পের বাৎসরিক মহাসম্মেলন।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রপ্তানি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষাও আমাদের জরুরী প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বদিক উপায়ে জাতীয় ধন ভাণ্ডারের পরিপূর্ণতা সাধন। আমাদের দেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন দিকে গঠনমূলক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুত রহিয়াছে সে বিষয়ে অবশ্য দেশবাসীর সুস্পষ্ট ধারণা নাই। তাই ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ভাব এবং অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত প্রদর্শনীর প্রয়োজন আমাদের বর্তমানেই আছে। তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার পথে আমরা আশা করি দেশের জাতির বিভিন্ন দিকের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা অধিকতর সচেতন হইব এবং জাতীয় প্রয়োজনে ইহাকে লইয়া পরিচালিত ব্রিটেনের শিল্প মত ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্মেলন আমাদের দেশেও গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

কমিউনিজম্

বলি আর সোস্যালিজম্ বলি, কিংবা ফ্যাসিজমই বলি, জন-
সাধারণের নিকট ইহাদের কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই, যে-
পর্য্যন্ত তারা দু'বেলা পুষ্টিকর খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র কিংবা
বাসোপযোগী স্থান পাচ্ছে না। জীবন বীমা এই
সব ইজ্‌মে'র কোন ধারই ধারে না, পরন্তু ইহা
জনসাধারণের ঐ সব নিত্যপ্রয়োজনীয়
জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া যাতে
মানুষের জীবন সুখ ও শান্তিপূর্ণ
রাখিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে
নিয়োজিত আছে।

আ র্য্য স্থা ন

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস্

১৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

ফোন—পার্ক ৩৫১

মোট জীবন বীমা অঙ্কবিল	২৭·৪৪ লক্ষ টাকার উপর
মোট পরিশোধিত দাবীর পরিমাণ	১১·১৪ ,, ,, ,,
মোট বীমার পরিমাণ	২ কোটি টাকার উপর

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

প্রখ্যাত গিনিঘর্জের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: বি.বি, ১৭৬১

ব্রাঞ্চ - হিন্দুস্থান মার্ট · বালিগঞ্জ